ঝড়

ইলিয়া এরেনবুর্গ

ইলিয়া এরেনবুর্গ

ঝড়

(তৃতীয় ভাগ)

স্তালিন পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস

Storm এর অনুবাদ

অনুবাদ : অশোক গুহ

ভারতী লাইব্রেরী

১৪৫, কর্ণওয়ালীস্ ষ্ট্রীট,
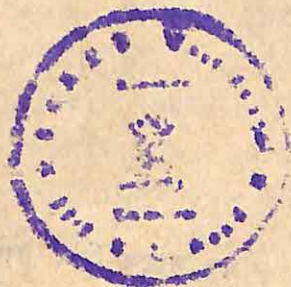
কলিকাতা—৬

প্রকাশক :
শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র সাহা
১৪৫, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা – ৬

মুদ্রাকর :
শ্রীপরেশ চন্দ্র মণ্ডল
বাণী বিচিত্রা প্রেস
৩১।১ ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬

দাম : সাড়ে তিন টাকা

ঝড়

চতুর্থ খণ্ড

এক

এমনও কখনো কখনো হয়। মানুষ জীবনযাত্রার খুটিনাটিতেই বাঁধা প'ড়ে আছে, হঠাৎ তারা একটু মাথা তুললে, দৃষ্টির প্রসার বাড়লো : বৃহত্তর জীবনকে দেখতে পেল। ওলগার তাই-ই হলো। তার নিজের আসবাব-পত্র আর সেমিওন ইভানোভিচের পোষাকের আলমারীর ভাবনা দেখে নিনা জর্জিয়েভ্না তো মনে ব্যথাই পেয়েছিলেন। হাঁ, ব্যথাই দিয়েছিল সে। ওলগা এখনো তেমনি আছে, তেমনি গৃহিণী। যে কাঠের বাড়িতে মস্কৌ থেকে তাদের কাগজ উঠে এসেছে, তারই ছোট্ট কাম্‌রায় নিজের কিসে আরাম হবে তাই ভেবেই সে সারা। কিন্তু এটুকু সে জানে, বুঝতে পারে, যে যুদ্ধ চলছে। এই একই লক্ষ্য সুমুখে রেখে, একই উদ্দেশ্যে চলছে দেশ, সেখানেও সে অংশ নিতে চায় বইকি। তার একটা গুণ আছে। তার মা তো তার কাছ থেকে অনেক কিছুই আশা করেছিলেন, তিনিও তা স্বীকার করেন—নিজের কাজে ওল্‌গা ওয়াকিবহাল। বিবেক-বুদ্ধি তার জাগ্রত। যুদ্ধের আগেও সে তার সহকর্মীদের তার এই কর্মতৎপরতায় অবাক করে দিয়েছিল। সেই প্রথম আপিসে আসত, যেতও সবার শেষে। কিন্তু এখন ব্যবস্থা নতুন আর কঠোর, এখানে বিবেক-বুদ্ধিটাই সব নয়। ওলগা শান্ত, ঠাণ্ডা, ঢিলেঢালা ভাব তার নেই, এখন সে সত্যিকার উৎসাহ নিয়ে কাজ করছে। সারাদিন ছাপাখানায় ব্যস্ত থেকে যখন সে রেশন আনতে দোকানে যেতে ভুলে যায়, সে বুঝতে পারে শুধু এই বিরাট বিশ্বেই পরিবর্তন আসে নি, তার ভিতরেও এসেছে, সে বদলে গেছে।

সেনিয়া, এমন কাজে ব্যস্ত ছিলাম, রেশন কার্ডের কথা ভুলেই গেছি। কিন্তু কাগজ তো সময় মতো বেরিয়েছে......হাসতে হাসতে সে আবার বললে........কি করা যায়, উপায় তো নেই......যুদ্ধ চলছে যে......

অত তাড়া কেন? বড় বড় খবরের কাগজও তো আজকাল দেরী করে বেরুচ্ছে।.........

সেমিওন ইভানোভিচের মনে হয় ওলগা কৃপা করে তাকাচ্ছে তার দিকে। তিনি রেগে ওঠেন, এই একরত্তি মেয়েটা নিজেকে খুব একটা কিছু ভাবে। কি অশান্ত, অস্থির মেয়ে.......কিন্তু তিনি তো তাকে শান্ত স্বভাব দেখেই বিয়ে করেছিলেন। পারিবারিক জীবনে তো তারই প্রয়োজন। কিন্তু মেয়েটি নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে স্রোতে। যাক্, ভয় কি, যুদ্ধ যখন চুকেবুকে যাবে, সব কিছুই ফিরে আসবে পুরণো ছকে.......

রাষ্ট্রগুলির জীবনধারার মোড় ঘুরে গেছে যুদ্ধে, নিনা জর্জিয়েভ্না যাদের ভার নিয়েছেন, সেই ছেলেমেয়েদেরও জীবন বদলে গেছে। কিন্তু সেমিওন ইভানোভিচের চরিত্রে সে পরিবর্তন আনতে পারেনি, সে অক্ষম হয়েছে। এখনো তিনি ভাবেন ঠিক সময়মতো একটা কথা বলা আর অন্য সময় চুপ করে থাকাই হচ্ছে সবচেয়ে দরকারী। এখনো তিনি জ্যাম দিয়ে চা খেতে ভালবাসেন, বড়শী নিয়ে বসে থাকতে চান ছায়াঘন গাছের নীচে। কিন্তু সব কিছুই এখন জটিল, আরাম একেবারে নেই বললেই চলে, সবই অস্থায়ী, ভঙ্গুর। খবরের কাগজের জন্য যে ছাপাখানাটি আছে, সেটাতে কাজ চলা দুষ্কর। জীবনযাত্রা দুর্বহ। ঘরখানাও তো ছোট। ওলগা তাতেই ভেল্‌কি দেখাচ্ছে। এক গেলাস চা পানও এখন সমস্যা। রাতদিন তিনি কাজ করছেন—সারা জুলাই মাসের ভিতরে মাত্র দুবার নগর-সোবিয়েৎ-এর কর্তার গ্রাম্য ভবনে গেছেন মাছ ধরতে। কিন্তু এতো আর কি। এ কষ্ট তো কিছুই নয়। তিনি মুষড়ে পড়েছেন আর এক কারণে। সিদোরভকে ফোনে ডেকে জিজ্ঞেস করতে পারছেননা যে 'কমিউন' কারখানা চাহিদার তাল সামলাতে

পারছেনা সে কথা কি করে কাগজে লিখবেন। একেবারেই লিখবেন কিনা তাও তাঁর জানা নাই। সিদরভ এখন সীমান্তে, তাঁর জায়গায় এখন কোরোলিয়ভ। কোরোলিয়ভ বলেছেন, আমাকে এইসব বাজে ব্যাপার নিয়ে ফোনে ডাকবেন না। কি করে উৎপাদন বাড়াতে হয় আপনাকে তা জিজ্ঞেস করিনি......আপনি কর্তব্যবুদ্ধিসম্পন্ন সম্পাদক, আপনার যা উচিত মনে হয় লিখে দেবেন।.......তার অধীনে যারা কাজ করে বা কোনো অতিথি এলে তাদের সঙ্গে আলাপে লাবাজভ জোর দিয়ে জাহির করতে ভালবাসেন যে তিনি একজন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সম্পাদক। প্রায়ই ওলগাকেও সে কথা মনে করিয়ে দেন। 'দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন' কথাটা বেশ ভয়াল ফিসফিসানিতেই তিনি শুনিয়ে দেন। কোরোলিয়ভের সঙ্গে কথাবার্তার পর সেমিওন ইভানোভিচ কেমন চুপসে গেছেন, তার খুদে চোখদুটি যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে, তার ফোলা মুখখানা যেন মুখোসের মতো দেখাচ্ছে। তিনি হঠাৎ বুঝতে পারলেন, সব কিছুর দায়িত্ব তাকে নিতে হবে, জবাবদিহীর ভারও তার উপর। তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, দেখ, এর চেয়ে সীমান্ত ভাল ছিল। সে অনেক সোজা ব্যাপার।' ওলগা হাসলো বিদ্রূপের হাসি। তার মনে হোল, স্ত্রীও অবাধ্য হয়ে উঠেছে, ফস্‌কে যাচ্ছে তার হাতের মুঠো থেকে। তার অধীনে যারা কাজ করে তারাও তাকে দেখে হাসে। এমন কি বুড়ো জামকভ এক সভায় সাহস করে বলেই বসলো, 'এখন, আন্তর্জাতিক এই পরিস্থিতিতে সবারই তৎপরতা দেখানো দরকার।' (জামকভ সব কিছুকেই 'আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি' বলে।)

লাবাজভ বুঝতে পারেন না কি হচ্ছে। আগে পেতিয়া দ্রজদভ ঠাট্টা করে বলত, 'আমাদের সম্পাদক মশাইয়ের কোনো জিনিস টের পেতে দেরী লাগে—হেমন্তে যদি তিনি পা ভেজালেন তো হাঁচবেন তিনি মে মাসে।' গত হেমন্তে লাবাজভ খবরের কাগজের অফিস সরানো, আর নতুন জায়গায় তাকে বসানো নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তাই কোনো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়

পাননি। কিন্তু জার্মানদের যখন মস্কো থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো, তিনি সবাইকে ডেকে বললেন, 'আর যে-ই যা ভাবুক, আমি এটা আগেই জানতাম।' কিন্তু এখন তিনি 'এই ভোরোনেজ অঞ্চলে' কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন.... আরে সে যে একেবারে দেশের অন্তঃস্থলে, মাঝখানে! থিয়েটারে ওরা বলে না যে তিন বছর ধরে ঘোড়া দাবড়িয়েও সেখান থেকে সীমান্তে পৌছনো যায় না। যে চিন্তা তার মনে এলো, নিজেরই কাছে তা এলোমেলো ঠেকলো। তিনি বিড়বিড় করে আপন মনে বলতে লাগলেন, জার্মানরা এখানে আসবে সেটা এমন কিছু অসম্ভব তো নয়। হাঁ, খুবই সহজ—ভোরোনেজ থেকে সীমান্ত যতখানি, এ জায়গাটা তো তার চেয়ে অর্ধেক দূর। কি করব আমরা এখন! শুধু বার বার সরে গেলেই তো চলে না। কোরোলিয়ভ যদি তখন বলতেন, 'এমনি ধারা ভাবনার জন্যে তোমাকে বরখাস্ত করা হোলো', লাভাজভ হয়তো প্রকৃতিস্থ হতেন। কিন্তু সেমিওন ইভানোভিচ কি ভাবছেন তা নিয়ে ভাববার তাঁর সময় কোথায়। তাঁর হাতে তখন বিস্তর কাজ।

ওলগা লক্ষ্য করলে তার স্বামী 'তিরিক্ষি' হয়ে উঠেছেন। সে তো স্বামীর এই অবস্থাকে তাই-ই বলে। সে একাই দুজনের কাজ করে যেতে বাধ্য হোলো। কখনো কাজে সে ফাঁকি দেয় নি, কিন্তু এখন সে আনন্দ পাচ্ছে কাজে, এই বিষণ্ণ নিরানন্দ জীবনের সঙ্গে সে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। এটা যে যুদ্ধের সময়। ভাসিয়া নিরুদ্দেশ, সেরিওঝা বিপদের মুখে। নিত্যকার সে বিপদ। মারও দুঃসময় যাচ্ছে। আর স্বামী তো শুধু অভদ্রই নয়, তিনি যেন তার অস্তিত্বই হারিয়ে ফেলেছেন ওলগার কাছে। কবে সে যে মস্কো ফিরবে তা কে বলবে। সেখানে গিয়েই বা কি দেখবে কে জানে। হয়তো কেউ তাদের ফ্ল্যাট্ দখল করে বসে আছে। সত্যিই, সব কিছুতেই ভদ্রা লেগেছে।......শুধু কাজের সময়ই শান্তি পাই। আমারও তাহলে দরকার আছে......নিয়মিত মাসে দুবার সে মাকে চিঠি

লেখে। নিনা জর্জিয়েভ্না কখনো বা ছোট্ট চিঠি লেখেন জবাবে, কখনো বা নিজেকে হারিয়ে ফেলেন চিঠির ভিতরে। সেরিওঝার সঙ্গে যেমন চিঠিতে আলাপ চলতো তেমনি মেয়ের সঙ্গেও চালান। কখনো কখনো ওলগাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে লেখেন, লোকে গেরিলা যোদ্ধাদের কথা বলাবলি করছে। বুঝি বা নিজেকেই সান্ত্বনা দেন। লেখেন, 'ভাসিয়া আছে ওদের দলে, আমার মন তো তাই বলে।'

নিনা জর্জিয়েভ্না এই সেদিন লিখেছেন, 'ওল্গা, তোমার উপর আমার বিশ্বাস আছে। জানি তুমি মুষড়ে পড়বে না। সব সময়েই তুমি ছিলে দৃঢ়। কাগজের খবর তো ভয়ানক। কিন্তু আগের থেকেও আমার বিশ্বাস আরো বেশি, আমরা জিতব, আর শুনেছ, আমি খুব নিজেকে সামলে নিয়েছি। চমৎকার চাঙা হয়ে উঠেছি। গত হেমন্তে আমি হতাশ হয়ে পড়েছিলাম, তখন শুনতাম সীমান্তের খারাপ খবর। তখন কি জানি— যত খারাপ হবে খবর, আগের থেকেও দ্বিগুণ কাজ করতে হবে আমাদের। আমরা শত্রুকে করব ঘৃণা। আমি প্রায়ই হাসপাতালে যাই। আহতদের বই পড়ে শোনাই, ওদের পোষাক রিপু করে দিই, ওদের সভায় দিই বক্তৃতা। আমি মৃত্যুর আগেই মরতে তো চাই না।'......ওলগা চিঠি পড়ছিল, তার মনে হোল ছেলেবেলার মতোই মার হাঁটুর ওপর সে মাথা রাখতে চায়। যাই হোক, মা-ই আমাকে বোঝেন। আমরা খুটিনাটি নিয়ে ঝগড়া করেছি, কিন্তু এখন সময় আলাদা......।

ওলগার ভারি একা লাগে। দিনের পর দিন সেমিওন ইভানোভিচ হয়তো কথা বলেন না, তারপর একদিন রেগে ওঠেন ঃ 'এক ফোঁটা মেয়ের গর্ব দেখ না।' তিনি চান ওলগা তার চাহিদাগুলির দিকে নজর দিক। 'তুমি আবার ঐ বোতামটা লাগাতে ভুলে গেছ। তোমার মাথায় কি পদার্থ আছে।...' কখনো বা মেজাজ ভাল থাকে। তার মনে হয় তারা মস্কৌতে আছেন। কিছুই হয়নি। তৃতীয় গেলাস চা খেয়ে তোয়ালে দিয়ে

মুখ মুছে এবার ওলগাকে জড়িয়ে ধরেন। সে তাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়: আমি এখন পড়ব……

একদিন সম্পাদকের দপ্তরে সীমান্তের একদল মানুষের একখানি আবেদন এসে পৌছলো। এ আবেদন পিছনের মানুষদের উদ্দেশ্যে লেখা। খবরের কাগজে তা ছাপাতে হবে। সেমিওন ইভানোভিচ টেলিফোন ধরে ইতস্তত করলেন, দোমনা তার ভাব। হুহুবার টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে আবার তখনি রেখে দিলেন। না, তিনি একাজ করতে পারেন না। খেঁকিয়ে উঠবেন কোরোলিয়ভ।

ওলগা বললে, এ আবেদন ছাপানো তোমার উচিত, কুড়েদের এতে ঘা মেরে জাগিয়ে তুলবে, অনুপ্রেরণা দেবে।

কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ, এতে কি লেখা আছে। আমার উপরেই যে ঘা এসে পড়বে।…'পরিস্থিতি বিশেষ ভয়ানক…আমাদের দেশের ভাগ্য এখন বিপর্যয়ের মুখে।' না, না, আবেদনের একথা তো গ্রাহ্য করা যায় না, এর ভিত্তি কি? রং একটু বেশি চড়ানো হয়েছে। এতে যে ভীতি ছড়িয়ে দেবে। 'বিশেষ' কথাটা এখানে দিয়েছে কেন, বল তো? ওরা এটা পেল কোথায়?

প্রাভদা পড়ে দেখ না। সেখানে তো আরো বেশি করেই লিখেছে। —না, না, সে এজাতের নয়। আমি সবগুলো সংখ্যাই ঘেঁটেছি, সেখানে 'ভয়ঙ্কর' বলা হয়েছে, কিন্তু 'বিশেষ' কথাটা নেই। আর 'বিপর্যয়ের মুখে' কথাটাও বাদ গেছে। ওরা সীমান্তে আছে, ওদের আর কি। এর জন্যে জবাবদিহী তো আমাকেই করতে হবে।

আগে লাবাজভ কোনো কথাটা কেটে দিতে পারলে আনন্দই পেতেন। প্রুফ মোটা মোটা আঁকাবাঁকা লাল রেখায় ভরে ওঠত। কিন্তু এবার তিনি অনেক ইতস্তত করে সরু অস্পষ্ট একটা রেখা 'আবেদন' কথাটার উপর টেনে দিলেন। ওলগা হতাশ হয়ে ঘাড় নাড়লো, তারপর চলে গেল ছাপাখানায়।

পরদিন ভোরে সেমিওন ইভানোভিচ জেগে উঠে অবাক হয়ে গেলেন। ওলগা যে বিছানায় ঘুমোয় সেখানে বিছানার চাদরের পর্দা দিয়ে আড়াল করে দেওয়া হয়েছে। সেমিওন ইভানোভিচ জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হোল? এটা থিয়েটার নাকি?' 'না, থিয়েটার নয়। মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছি আর কি! আমি খবরের কাগজের চাকরীটা ছাড়তে রাজি নই, কিন্তু এখন চলে গেলে—ছাড়াই তো হলো! আর এখন কাম্‌রা পাওয়াও সম্ভব নয়। আর কিছু তো নয়।'

আর কিছু তো নয়, মানে কি? ঐ ছেঁড়াখোঁড়া পর্দাটা খাটিয়েছ কেন?

বুঝতে পারছ না? আমি আর তোমার স্ত্রী নই। আমি বোকার মতো একটা কাজ করে বসেছিলাম। কিন্তু বোকামির জের টেনে যাবার থেকে দেরী করে শোধরানোও ভালো।...আর এ নিয়ে কথা বলতে চাই না। এখন স্নায়ুগুলিকে অন্যের জন্য সুস্থ রাখতে হবে।

সেমিওন ইভানোভিচ রাগে জ্বলে উঠলেন,

অন্যটি কে শুনতে পাই?...

ওলগার মুখে শান্ত হাসি, এখন ওসব ভাবছিও না। এখনো আর একজনকে জোটাতে পারি নি।

.......অনেক কাজ আছে। তাছাড়া, কি জাতের লোক এখানে আছে তা তো দেখছোই? তোমার মতোই সবাই......যখন যুদ্ধ শেষ হবে, হয়তো একজন মিলেও যেতে পারে.........

এখন থেকে আপনি আমাকে একজন সহ-সম্পাদক বলেই মনে করবেন.........।

ক'দিন পরে ওলগা তার মাকে তার জীবনের এই পরিবর্তনের কথা লিখলো।......

আমি সেমিওন ইভানোভিচের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধন একরকম ছিন্ন করেছি।

আজকাল যা অবস্থা তাতে মানুষকে ভাল করে চেনা যায়। ওর সঙ্গে আমার খাপ খায় না। ঐ একই ঠিকানায় চিঠি লিখো—আজকাল এক খানা, এমন কি আধখানা ঘরও মেলা দায়। তা না হলে ভাড়া বেশি। আমি নতুন পোষাক তৈরী করবার জন্য টাকা জমাচ্ছি, আমার পুরানোটা ছিঁড়ে গেছে। তাই থিয়েটারে যাওয়া এখন বন্ধ......

নিনা জর্জিয়েভনা চিঠি পেয়ে আপন মনে ভাবলেন, আমি আমার মেয়েকে খুঁজে পেলাম। হাঁ, খুঁজে পাওয়াই বটে! আমি আত্মার বদলে ওর মুখের কথাই আসল বলে ধরে নিয়েছিলাম। কি ভুলই করেছি! বুঝিনি যে ওর বয়েস কম, ওরা আমাদের থেকে আলাদা সুরেই কথা বলবে!.....ওলগার উপদেশেও তিনি ক্ষুব্ধ হলেন না। সে লিখেছে ঃ তুমি কিন্তু ভাল একটি দোকানের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে নেবে। চিনি আর চর্বি না পেলে বেশিদিন তুমি বাঁচবে না......, তিনি ভাবলেন, বোকা মেয়ে, ও নিজে কী অবস্থায় আছে, আবার আমার জন্যে ওর দুশ্চিন্তার অবধি নেই।

দুই

সার্জি হাসলো। এক বছর আগে তার খারাপই লেগেছিল। স্থাপার হয়ে আমাকে তো পিছনে পড়ে থাকতে হবে। আর সবাই করবে লড়াই, আর আমার কাজ হোলো সেতু গড়া।

......হাঁ, পিছনেই আছি, পড়ে আছি, কিন্তু এই তিন সপ্তাহ ধরে আমরা ট্যাঙ্ক, কামান আর সেনাদলের যাবার সুবিধে করে দিচ্ছি। আবার ওড়াচ্ছি, ধ্বংস করে চলেছি সেতু আর পথ। কাল ভোরোনভ বলছিল, 'এই সেতুটি উনিশশো আটত্রিশ সালে আমি গড়েছিলাম......।'......হাঁ,

আমরা গড়েছি আবার আমরাই উড়িয়ে দিচ্ছি। কিন্তু জার্মানরা এগিয়ে আসছে, ঠেলে এগিয়ে আসছে। আমাদের গড়া পথ দিয়ে তারা এগিয়ে আসতে চায়। দুবার আধ ঘণ্টা সময় পাবার জন্য ওদের সঙ্গে লড়াই চালিয়েছি। ওদের হাতে সেতু তো ছেড়ে দিতে পারি না! কিন্তু কতদিন ধরে এমনি ধারা চলবে? শান্ত শহর, আপেল গাছগুলি আর সাদা বাড়ির সার। বসন্তকালে কেউ তো স্বপ্নেও ভাবেনি যে এখানে এসে হানা দেবে যুদ্ধ... স্তেপ......তাকাতেও তো চাই না, কত দূরে ছড়িয়ে আছে স্তেপ... শীগির্‌ই আমরা পৌছব ডনের ধারে। ওদের কি আরো এগুতে দেওয়া হবে?—আরো?.........

যারা বিরাট দুঃখ সয়েছে, সয়েছে প্রিয়জনের ভয়ানক ব্যাধি আর হারানোর ব্যথা, তারাই জানে, সে ব্যাধি আর মৃত্যুর পুনরাবৃত্তি কতখানি দাগা দিয়ে যায়। সে বুঝি সব চেয়ে ভয়ানক। শীতের আনন্দ আর আশার পর আজ যা ঘটছে সে তো অসহ। গত গ্রীষ্মে ছিল বিশৃঙ্খলা, ছিল আশঙ্কা, ভীতি। মানুষ ভাববার সময় পায়নি, কিন্তু এখন তো সবাই জানে পশ্চাদাপসারণের অর্থ কি। 'জার্মান' এই শব্দটা শুনলেই কণ্ঠনালি যেন রুদ্ধ হয়ে আসে, মাথায় রক্ত চড়ে যায়। এই তো সেদিন মানুষ স্বপ্ন দেখেছে—মাটি শুকিয়ে যাবে, আমরা পশ্চিম দিকে চলব, কিন্তু সব কিছু পালটে গেল। জার্মান বাহিনী শস্যের ক্ষেত, বাগিচা, তরমুজের ক্ষেত ছেয়ে ফেলেছে ঢেউয়ের মতো, ছেয়ে ফেলেছে সমতল সীমাহীন স্তেপভূমি। যেন এক নদী দুকূল ভেঙ্গে চলেছে।

এক বুড়ী সার্জিকে বললে, খালি বকবক করতে পার, আর এখন পালাচ্ছ!' ...সে বুড়ীর কথায় জবাব দেয়নি। এখন স্ত্রীলোক, বুড়ো আর ছেলেমেয়েদের ফেলে আমাদের পালাতে হচ্ছে। লজ্জায় মরে যাচ্ছি—আমরা তাদের রক্ষা করতে অক্ষম। জার্মানদের হাতে আমরা তুলে দিয়ে যাচ্ছি আমাদের শস্য, আমাদের দেশ, আমাদের সুখশান্তি। কি ভয়ানক গরম,

গরম ধূলোর আস্তরণে ঢাকা পথঘাট, গলা শুকিয়ে আসছে। চোখ ব্যথা করছে। তাকাতে কেউ চায় না। সাধ নেই আর তাকাবার।

'আমরা রোস্তভ ছেড়ে এসেছি।' এ এক আদেশ। কঠোর সহজ কথা; আমাদের 'দাঁড়াতে হবে রুখে! কেন, আমরা তো সবকিছুই ছেড়ে চলেছি (মানুষ গোমরা মুখে বলছে, আমরা পালাচ্ছি।') আমাদের তো এখন আরো বিমানবহর আছে। ট্যাঙ্কপ্রতিরোধকারী কামানগুলিও ভাল। পশ্চাৎভাগ সুরক্ষিত—মানুষ কঠোর পরিশ্রম করছে..... কিন্তু এখনো আমরা যুদ্ধ করতে শিখিনি।

সার্জি একটু ঢিলেই বুঝি ছিল, একটু বা অসাবধানী। যুদ্ধের আগে সে নিজেকে গাল দিয়েছে, বড় আনমনা, চিঠিখানা কোথায় গুঁজে রাখলে ভুলেই গেলো। হয় এক ঘণ্টা আগেই এলাম, নয়তো দেরী করে.. ... কিন্তু এখন সে সময়নিষ্ঠ হয়েছে, নিখুঁত কাজ করবার দিকেই তার ঝোঁক। কাল কর্ণেল বললেন, এই পুলটা একটু দেরী করে ওড়াবে। ওরা এখানে বাধা পাবে। ট্যাঙ্ক পার হবে ছটায়, কিন্তু সাতটায় ট্যাঙ্ক পার করা হোলো ..আর এই একই কর্ণেল কিনা নালিশ করছিলেন, 'যখনি বিমানের প্রয়োজন জানাই, তখনি দেরী করে পাঠানো হয়।'..... পথঘাট খুবই খারাপ। খবরাখবরে অবস্থাও তাই। কর্ণেল তো সোজা বলেই বসলেন, আমাদের সাথীদের খবর রাখবার উপায় নেই। বিভাগীয় সেনাপতি সুভরভের ভাষায় কথা বলতে ভালবাসেন। তিনি তো চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কালই ওদের লাথি মেরে তাড়িয়ে দেব।' কিন্তু যখনি কাজের সময় আসে তিনি কি করবেন ঠিক করতে পারেন না, দীর্ঘসূত্রী হয়ে ওঠেন......মেজর গার্শিন বললেন, 'এই হবে আমাদের ঘাঁটি। এখানেই আমরা থাকব, যতক্ষন আরামে থাকা যায় তারই চেষ্টা করা উচিত।'......তিনি সিন্দুকের ওপরে স্ত্রীর একখানা প্রতিকৃতি রাখলেন, মানুষগুলো তিন ঘণ্টা ধরে খেটে বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা করলো—বলতে গেলে আরামের সব

ব্যবস্থাই হোলো। কিন্তু সন্ধ্যের দিকে আরো দূরে হটে যেতে হোলো। গরবাসভ কনসার্ট প্রোগ্রাম দেখছিল, কিন্তু এরই মধ্যে জার্মান ট্যাঙ্ক শহরে এসে গেছে। আর আমিও সরেশ! মিল্লোরেভের কাছে সেবার আমি গিনকোর উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত রইলাম। মাইন পাতা হোলো না। শুধু এরই জন্য আমার সামরিক আদালতে বিচার হওয়া উচিত।

গরম বাড়ছে। ধূলোর ঢেউ এখনো অচল, অটল। সার্জি ভোরোনভকে জিজ্ঞেস করলো, কি হে নিকোলাই, তোমার কি মনে হয় এমনিই চলবে নাকি?

কাল গোয়েন্দা দপ্তরে ওরা দুটো ফ্রিৎসকে (জার্মানদের ঐ নামেই রুশ অপভাষায় ডাকা হয়) জেরা করছিল। ওরা যে মাসে ফ্রান্স ছেড়ে এসেছে। ওরা বললে, সেখান থেকে সবাইকে সরিয়ে আনা হয়েছে। কেউ নেই। হিটলার নাকি এমন জোর আঘাত হানতে চায় যাতে শীতের আগেই সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। প্রাণের ভয়ে অস্থির, তবু তাদের ঔদ্ধত্য কত। তারা বললে, তারা যাবে ভারতবর্ষে। একেবারে পাগল আর কি!

ভারতবর্ষ—একেবারে খাঁটি পাগলামি বইকি। ওরা অত বেশি বিয়ার টানে বলেই অমন আজগুবী স্বপ্ন দেখে।...

কিন্তু মিত্রশক্তির ব্যাপারখানা কি? এখন তো ওদের ঘা মারবার সময়। জার্মানরা তো সেখান থেকে সবকিছু সরিয়ে এনেছে। শেষ ট্যাঙ্কটাও চলে আসছে...... কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধক্ষেত্র কোথায়। তার তো পাত্তা নেই।

তাদের অত তাড়া নেই। তড়িঘড়ি কাজ করতে ভালও বাসে না। পারীতে আমার একজন ইংরেজের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে ইঞ্জিনিয়ার। খাসা লোক। ট্রেড মিশন থেকে দুজনে বেরিয়েছি সেদিন। সে বললে, তাড়া আছে। ওর বাস তখনি এসে গেল। একটু ছুটে গেলেই বাসে উঠতে পারত; কিন্তু তা নয়, ও একটুও জোরে পা চালালো না।...আরে এতো ঠাট্টা

করছি। ফরাসীরা বলে—হাসতে পারাটা ভালো।···না হে, এ স্বভাব নয়। ওরা জার্মানদের দেখতে পারে না। কিন্তু আমাদেরও যে দেখতে পারে তাও মনে হয় না।···

সাজি, তুমি তো ফ্রান্সকে জান। ওরা কি সত্যই যুদ্ধ করেছে, না, শুধু গল্পই শুনেছি?

সব কিছুরই সেখানে গিশোল আছে। আমি পারীতে এক কবিকে দেখেছিলাম। একেবারে সুসংস্কৃত মানুষ যাকে বলে তাই। যদি মানের দিকে নজর না দাও, ওর কবিতা সুন্দর বলেই মনে হবে। অবাকও লাগবে। কিন্তু সাদা-সিধে ভাষায় অনুবাদ কর দেখবে ও একটি ফ্রিৎস—তাছাড়া কিছু নয়। ভাব-গাম্ভীর্য আর থাকবে না। ওরা হাওয়া ভরা থলে, ঢিলেঢালা ওদের চলন, ভারি পেটুক; আর আছে ওদের মহান পার্টি—সে দুদিকে পা রেখে চলেছে। মানুষও আছে। কিন্তু তারা কি করবে? তুমি বলছ, খুব কমই জার্মান এখন সেখানে আছে। হাঁ, নামলে বাধা দেবারও ওদের শক্তি নেই, কিন্তু একদল নিরস্ত্র মানুষকে অধীনে রাখবার পক্ষে ওরাই যথেষ্ট।

ভোরোনিভ এখন সাজির ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। নীল তার চোখ, বিরাট তার চেহারা, কিন্তু লাজুক শিশুর হাসিটি লেগে আছে তার মুখে। এই বত্রিশ বছর বয়েসেই চুলে তার পাক ধরেছে, কিন্তু স্বভাবটি ভারি নরম। আর্চেঞ্জেলের এক মিস্ত্রীর সে ছেলে। ছেলেবেলা তার কেটেছে এক মস্ত নদীর ধারে সুদূর এক গ্রামে। এখনো সে অরণ্যের প্রতি ভালবাসা বজায় রেখেছে। পাতার সর্‌সর্ শব্দ তার ভাললাগে, ভাল লাগে পাইনের গন্ধ—প্রকৃতির অনাড়ম্বর রহস্যময় জীবনধারা। স্কুলে সে দক্ষতা দেখিয়েছিল। শিক্ষকরা বলতেন, তুমি বড় হবে। ভোরোনভ সত্যিই একজন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার হোলো। লেনিনগ্রাদে একটি ছাত্রীর সঙ্গে তার পরিচয় হোলো। নাম তার নীনা। হাস্যময়ী, প্রিয়তমা নিনা। নিনার হাত দুখানা বড় ছোট, ভরোনভের হাত

ধরতে ভয় পেত। নিনা হেসে বলত, 'তুমি তো সাদা ভালুক! তোমাকে আমার মিশকা (ভালুকের আদরের নাম) বলে ডাকাই উচিত। তাই বুঝি ওরা ওদের ছেলের নাম রেখেছিল মিশকা। ছেলেকে তারা খুবই ভালবাসত। যখন কাজকর্মে বাইরে যেত, ভোরোনভ ফোনে স্ত্রীকে ডেকে জিজ্ঞেস করত: 'মিশকা কেমন আছ?'…তার সেই ছেলে আর স্ত্রী রয়ে গেছে লেনিনগ্রাদে। বহুদিন সে চিঠির প্রতীক্ষায় কাটিয়েছে, যখন স্ত্রীর চিঠি এল, সে কাউকে কিছু বলেনি। দুসপ্তাহ পরে হঠাৎ সে সার্জির দিকে তাকিয়ে মুখে হাসি টেনে এনে বললে, আমার মিশকা মারা গেছে। অবরোধের ফল …আমার কি মনে হয় জানো, দাঁত দিয়ে ওদের টুটি কামড়ে ছিঁড়ে দিই। যাকগে, এস অন্য আলাপ করা যাক। যা ভাবা যায়, তা কি আর বলা যায়! ……

সার্জি প্রায়ই মা আর ভালিয়ার কাছ থেকে চিঠি পায়। সে ব্যগ্র হয়ে পড়ে, কিন্তু জবাব দেয় সংক্ষেপে, আর মাঝে মাঝে। যুদ্ধের আগে তার জীবন কি ভাবে কেটেছে, তার সঙ্গে এ জীবনের সম্বন্ধ সে আবিষ্কার করতে পারে না, চায়ও না। কি অদ্ভুত! মা এখনো সেই যুদ্ধের আগেকার কথাই লেখেন; হয়তো স্বপ্নই দেখেন জেগে জেগে, আর উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে ঘন ঘন টানেন সিগারেট। অসুখে না পড়লেই হয়! ভালিয়ার কোনো নালিশ নেই। কিন্তু সার্জি বুঝতে পারে, সে এখন একেবারে একা। সে লেখে, সে থিয়েটারে 'তিনবোন' দেখে এসেছে। মা লিখেছেন ওলগা বিবাহ-বিচ্ছেদ করেছে। ভালোই। লোকটা ভাল নয়, বিরক্তি জাগায়।… "মানুষ বিবাহ-বিচ্ছেদ করে……আবার বিয়েও করে……সবই যেন কত সুদূরের ব্যাপার। যেন অন্য গ্রহে ঘটছে ঘটনা। শুধু স্তেপের সঙ্গে খাপ খায় একটা জিনিষ—খাপ খায় এই গরম ধূলো আর পোড়া গন্ধের সঙ্গে, ভাঙা সেতু আর তার হৃদয়-বেদনার সঙ্গে—সে নিনা জর্জিয়েভ্‌নার অবশ্যম্ভাবী পুনশ্চ—'ভাসিয়ার কোনো খোঁজ নেই।' যুদ্ধ! সার্জি এখন তো তারই

রুবলে। সে যেন স্তেপের ঘাস, তাতে জ্বলে উঠেছে দাউ দাউ করে আগুন।

একজন অফিসার বলছিল, ভোরেনেজ-এ লড়াই চলছে, একেবারে শহরের ভিতরে। রোস্তভ থেকে আমরা দক্ষিণ দিকে সরে এসেছি। সাল্‌সেক, কোভেলনিকোভো……ফাটল যেন দিন দিন বাড়ছে। জার্মান ট্যাঙ্ক হানা দিয়েছে আমাদের পিছনে। কোথাও তুমুল লড়াই চালাচ্ছি, কোথাও বা হটে আসছি। বাড়িঘর পুড়ছে, মেয়েরা কাঁদছে, পোড়া কাঠের কটু গন্ধে মাথা ঘুরছে।

এমন তাণ্ডব বুঝি পৃথিবী আর আগে কখনো দেখেনি। হ্বারটেমবুর্গের কেরাণীর দল পোলোভস্তি স্তেপের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে, চিৎকার উঠছে। কে আসেনি? স্ফীত মুখ সার্জেন্ট, ইউক্রাইনে ওরা গেঁড়ে বসেছিল, সেনাপতির দল, শূন্যদৃষ্টি তাদের চোখে—ওরা জানে একমাত্র সাঁড়াশি অভিযান, আর আবেষ্টনীর কথা। হাইডেলবুর্গের ছাত্রেরা এসেছে, গায়ে তাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন। নির্বোধ মোষপালকের দল এসেছে পমেরানিয়া থেকে, এসেছে ঝঞ্ঝাবাহিনীর সৈনিকদল। অসন্তুষ্ট মধ্যবিত্তের দলও এসেছে! ব্যাংকে তাদের গচ্ছিত টাকা, বাড়িতে ফোটে জিরোনিয়াম ফুল, ওরা কোলচিসের বহু বিখ্যাত ধনভাণ্ডার লুটেপুটে নেবে।

ইতালিয়ানরাও আছে। কেউ বা কণ্ঠ সঙ্গীতে পারদর্শী, কেউ বা মাতাল, একেবারে হতচ্ছাড়া ওরা; তাসের জুয়াড়ী, জনপ্রিয় গায়কও বা কেউ। সবার হাতেই মেশিন গান। যারা হৃদয় জয় করতে জানে মানুষের, তারা দিগ্‌বিজয়ী সিজারের বেশে ডিম চুরি আর পকেট মারতে ব্যস্ত। রুমানিয়ার ভূমিদাসের দলও আছে। ওরা তো কিছুরই মালিক নয়, ভাগ্যের ওরা সৎ ছেলে, আছে বুখারেষ্টের সেনা বিভাগের উচ্চ কর্মচারীরা। ওরা দাবী জানাচ্ছে, ওদের পূর্বপুরুষ ছিল ভোল্‌গার পারে। পৃথিবীতে ওরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। ওরা পারিসীয় বিলাসিতার হালহদ্দ জানে আবার বার্লিনে আছে ওদের প্রভাবশালী বন্ধুর দল।

নাগিরাবরাও এসেছে। ওরা রক্ত পাগল, দেশে ফেরবার জন্যও অস্থির। কে তাদের উপর করেছে অত্যাচার, অবিচার তাই তারা গুলী ছুঁড়ছে।...... সবাই স্তেপের উপর দিয়ে দলিত মথিত করে ছুটেছে। খাচ্ছে, পান করছে, হস্ত মৈথুন করছে, লুট করছে, গলাটিপে মারছে, আর উঠছে চিৎকার—চলো, চলো, এগিয়ে চলো!

ওরা এক খামার বাড়িতে রাত কাটালো। বুড়ো হেসে সার্জিকে বললে, তোমাদের সৈন্যেরা তো ঈশ্বরের কথা বলছিল......

কি বলছিল?

বলছিল, ভগবান নাকি রেগে গেছেন, তিনি বলছেন, একি ব্যাপার? রুশরা তো আমাকে ত্যাগ করেছে। কিন্তু এখন পাজিগুলো নাকি আবার আমার উপরই ভরসা করছে।.........

সার্জি জবাব দিলে, ঠাট্টা নয়। আমরা এখন ভরসা করছি বই কি। মিত্র শক্তির উপর।

না, আমাদের নিজেদের উপর।

কি গন্ধ! লেগে আছে, সয় না। পোড়া কাঠের গন্ধ। লোকে বুঝি তাই বলে পোড়া কাঠের গন্ধের মতোই কটু......বুড়ো ওকে মদ খেতে দিল। মদেও স্তেপের গন্ধ, পুড়ে যাওয়া ঘাসের।

বুড়ো বুঝিয়ে দিলে, ডনের মদে ফুলের গন্ধ।

সার্জির মনে পড়লো, মাদো বলেছিল মিষ্টি মদ খেলে জিভ তেতো লাগে। সে কি সত্যি—সেই শান্তির দিনের গ্রীষ্মকাল। মাদো আর সেই স্তূপীকৃত ছবিভরা ষ্টুডিয়ো। এখন ফ্রিৎসরা সেখানে। পরবর্তী তিক্ততা বুঝি ঘনিয়ে এসেছে মিষ্টতার পরে। না, তার থেকেও খারাপ.........হঠাৎ সে হেসে উঠলো।

ওরা ঈশ্বরের সম্বন্ধে ভারি মজার কথা বলেছে তো। এখনো তাহলে ঠাট্টা করতে পারে মানুষ। ভালো, ভালো। ওরা তাহলে মুষড়ে পড়েনি......

দিনের পর দিন, মাইলের পর মাইল। পোড়া কাঠের গন্ধ। অবশেষ এল ডন।

কর্নেল জানালেন, সেতুর জন্য দায়ী তোমরা।

ভোরোনভ ছক কেটে দেখাল।

জার্মানরা যখন এর উপরে আসবে তখন আমরা উড়িয়ে দেব সেতু। আমি মাত্র বিশজন লোক চাই। আড়াল আছে। গুলীর পাল্লায় ওরা আসার আগেই আমরা চলে যেতে পারব।

জোনিন প্রথমে রাজি হলো না। ঝুঁকি আছে। ভোরোনভ পেড়াপিড়ি করতে লাগলো।

ঠিক, ঠিক আছে আমার ছক।

ওরা দেখতে গেল। সার্জি বললে,

যখন ফিরব, তখন আবার একটা সেতু গড়তে হবে,......

ভোরোনভ শান্তভাবেই বললে, এখানে নয়। তিনশো গজ দূরে।

সোনালি সকাল, গোলাপী আকাশ স্তেপের, স্তেপেই বুঝি এমনি সকাল সম্ভব।

সার্জেণ্ট স্থলিয়াপভ বললে, কমরেড লেফটেনাণ্ট। আপনি চলে যান। আমরা নিজেরাই পারব!

ভোরোনভ হাসলো ঃ আমাকে দেখতে হবে বই কি। ব্যাপারটা যে জরুরী...

প্রথমে চারজন জার্মান সেতুর উপর উঠে এল, তারা এসে নিচে কি দেখতে লাগলো, তারপর ফিরে গেল। দূরবীন দিয়ে ভোরোনভ দেখলে দুজন উপরওয়ালা কর্মচারী উত্তেজিত ভাবে কি বলাবলি করছে। এবার একজন হাত তুললো। পাঁচখানা গাড়ি উঠে এল সেতুর উপর, এবার স্থলিয়াপভ সুইচ টিপে দিলে যন্ত্রের। বিস্ফোরণ। সমস্ত জায়গাটা ভরে গেছে মাটিতে. ঢেকে গেছে। ভোরোনভ গায়ের মাটি ঝেড়ে উঠে পড়লো। বেশ। স্যাপার এগুতে লাগলো ঘাসের ভিতর হামাগুড়ি দিয়ে। মেশিন গান গর্জন করে উঠলো। ভোরোনেভ স্থলিয়াপভকে চেঁচিয়ে বললে,

জবাব দিওনা। হাত আর হাঁটুর উপর ভর দিয়ে পালাও।

পরদিন সার্জেন্ট স্থলিয়াপভ সার্জিকে জানাল,

আমরা লেফটেনাণ্ট ভোরোনভ আর প্রাইভেট ওখরিমেঙ্কোকে হারিয়েছি। আর সবাই ফিরে এসেছে। ওখরিমেঙ্কো তখনি মারা যায়। লেফটেনাণ্ট মাথায় জখম হয়েছিলেন! আমরা তাকে একটা ঢালু জায়গায় নিয়ে যাই। জার্মানরা ছুটে আসছিল রাতের অন্ধকারে। আমাদের তারা দেখতে পায়নি। আমরা লেফটেনাণ্টকে সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিলাম। তিনি তখন অজ্ঞান। তাকিয়ে দেখি—তাঁর শেষ সময় এসে গেছে। আমাদের আর দাঁড়াবার সময় ছিল না—ভোরের আগেই এখানে চলে আসতে হবে... একশোর উপরে জার্মান সৈন্য হত হয়েছে, এর পরে কিছু সময় হাতে পাব। আমরা যে মাটি চাপা পড়িনি সেই-ই ভাগ্য!...

স্থলিয়াপভ সার্জির হাতে ভোরোনভের কাগজপত্র আর দুখানা ফোটো তুলে দিলে। বেরে টুপী পরা একটি তরুণী—সুখী, হাস্যমুখী, আর একটি ছোট ছেলে। এই নিশ্চয়ই মিশকা•••নিকোলাই ভোরোনভ কখনো কাউকে দেখায়নি এই ফোটো দুখানি। ভোরোনভ তাহলে মারা গেছে! আমরা তিনশো গজ নিচে সেতু গড়ব, সে না একথা বলেছিল! কিন্তু সে তো তখন থাকবে না। ....কিন্তু বীরের মতো মরেছে সে—একশো জার্মান গেছে—আর প্রায় একটা দিন সময় পাওয়া গেল....একটা দিন—কত তুচ্ছ এই দিন। ওরা যে এগিয়ে আসছে শীগ্‌গির্‌ই তো মাস পুরবে। একশো ফ্রিৎস আর কি! প্রায় সারা ইউরোপই তো এসেছে এখানে। স্থলিয়াপভ সেনাধ্যক্ষের চোখের দিকে তাকালো! বিপদের আভাস্ সে মুখে। সে বললে, কমরেড ক্যাপটেন, আমরা লেফটেনাণ্টের মৃত্যুর শোধ তুলব, এমন পিটব যে ওদের গিন্নীদের নাম ভুলিয়ে দেব...

সার্জি মাথাটা হেলিয়ে সার্জেণ্টের দিকে তাকাল। স্বপ্নালু তার স্বর, সে যেন আপন মনেই বলছে :—

হাঁ, পিটব বইকি। লেফটেনান্টের জন্য আমি দুঃখিত। কি মানুষই ছিল!...কিন্তু বলে লাভ কি। আমাদের এই পথে মাইন পাততে হবে। ঐ নির্বোধগুলো এই পথে আসতে পারে...

তিন

কেলার ছোট্ট মেয়েটাকে হাঁটুর উপর বসালো। তিন কি চার বছর তার বয়েস, ওকে দেখে তার মনে পড়ছে নিজের মেয়ের কথা। গ্রেচেন এখন বড়ই হয়েছে। দুবছর তো সে তাকে দেখেনি। এখন তার পাঁচ বছর বয়েস। রোজ বোধ হয় স্কুলে যাচ্ছে।

মেয়েটি কেঁদে উঠলো। কোল থেকে নেমে ছুটে গিয়ে মার স্কার্টের আড়ালে লুকালো। কেলারের মেজাজ খুবই শরিফ। প্রথমে সে আজ থেকে নন-কমব্যাটাণ্ট, জঙ্গী সেনা নয় আর কি। আর সবে এইমাত্র এক পেট ভর্তি দই আর সর খেয়েছে। আর তৃতীয়ত, খতিয়ে দেখা যাচ্ছে এবার শীতের আগেই সব শেষ হয়ে যাবে। চমৎকার! আর একটা শীত সহ্য করতে কেউ পারবে না। তার মনে পড়লো—সেই শীত, উকুন, ফুলে-ওঠা পা —সে এক জঘন্য কাণ্ড...বোধ হয় এখন একটু বেশি গরম পড়েছে। কিন্তু একে গ্রীষ্মকাল, তায় তারা প্রায় এশিয়ায় এসে পড়েছে।...বোকা মেয়ে, ভাবলে কিনা আমি ওকে কামড়ে দেব। এখানকার মানুষগুলোই জংলী, ওরা অপরিচিতকে ভয় পায়...

কেলার একটা লাল কুকুর ছানা দেখতে পেল। লাল তার গায়ের লোম, পা খোঁড়া। কুকুরছানাটাকে ডেকে এনে আদর করতে ইচ্ছে হোলো, কিন্তু সেটা লেজ গুটিয়ে গেল পালিয়ে। কুকুরগুলো পর্যন্ত বিশ্রী। ...কিন্তু এর চেয়ে প্রেরণাময় আর কি আছে—এই মহান অভিযান! আর

শপ্‌গিরই তো আমরা যাব আর এক মহাদেশে। কাল তারা একটা উট দেখেছে ···কেলার কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি সে কখনো এখানে আসবে। সে বিজ্ঞানী, পড়াশুনো নিয়ে ছিল ব্যস্ত। যুদ্ধের আগে মানুষ যেত বার্লিন, পারী, সুইট-জারল্যাণ্ডে, বেড়াতে যেত...কিন্তু এখানে যা দেখলো তার কথা তো স্বপ্নেও সে ভাবেনি। যুদ্ধকে নিন্দা করা বোকামি; তেমনি প্রেমকে নিন্দা করাও তাই। প্রেমও তো যুদ্ধের মতোই যুক্তিহীন, নীতিবোধহীন।....

গত গ্রীষ্মে যেমন দেখেছি, এখানকার গ্রামগুলি তেমনি দারিদ্র্য-পীড়িত নয়। এখানে শুয়োর ছানা আছে, ফল আছে প্রচুর, মদও খারাপ নয়। খানিকটা রিইসলিঙের মতো। ওরা একটা গোটা পিপেই সে দিন পেয়েছিল... আপশোস হয়, মিমি এখানে নেই, কিন্তু সে তো আর সম্ভব নয়। আর রুষদের উপর চটলে কি হবে, ওরা আদিম জাতি, নৃতত্ত্ব ওরা পড়েনি। অসভ্যদের কাছ থেকে ভাবাবেগের জটিলতা আশা করা বৃথা।...কাল রাতটা বেশ স্ফূর্তিতেই কাটিয়েছে। অবশেষে যা হোক কিছু পাওয়া গেল। যদিও মেয়েটা সারারাত ধরে কেঁদেছিল, কিন্তু তাতে আনন্দ আছে বইকি। আমরা অনেক কিছু চট করে বাদ দিয়েছি, সব কিছুকেই নতুন রূপ দিচ্ছি বলে বড়াইও কর্ছি, কিন্তু চিরন্তন প্রবৃত্তি তো আছেই। একটি মেয়ে যদি তাকে দেখে ভয় পায় পুরুষ খুশিই হয়—তার পৌরুষ সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে ওঠে।...

কেলার এখনো আদর্শ গৃহী। প্রায়ই গার্ডাকে চিঠি লেখে। একজন ছুটি নিয়ে দেশে যাচ্ছিল, তার কাছে সে কিছু টাকা, চর্বি আর একজোড়া ফারের জুতো পাঠিয়েছে। জুতো জোড়া পেয়েছে এক রুশ পরিবারে। লেফটেনাণ্ট ক্রাউস বলেছেন, বড়দিনে যদি যুদ্ধ শেষ না হয়, তুমি বাড়িতে বসেই বড় দিনের গাছ দেখতে পাবে। তোমার ছুটি পাওনা ছিল অক্টোবরে, কিন্তু আমি এমনভাবে বন্দোবস্ত করে দিয়েছি যে ছুটির দিনক'টা পরিবারের মধ্যেই থাকতে পারবে। যাই হোক, লেফটেনাণ্ট

ক্রাউস লোকটা খারাপ নয়। তিনি কেলারকে বিজ্ঞানী ভেবেই কথা বলেন, তাতে খানিকটা খুশিও হওয়া যায়। গার্ডা খুশিই হবে....কিন্তু সে এবার প্রতিশোধ নেবে—সে তাকে বুঝিয়ে দেবে যে সে প্রভু....গার্ডা তার সন্তানদের জননী, কিন্তু এমন মুহূর্ত আসে যখন সে শুধু নারী—মিমি, লটে—কারকভের লালচুলওলা মেয়েটির মতোই নারী। আমি বেচারী হ্বোরকে বললাম, আমি সেই দিনের স্বপ্ন দেখছি যখন আবার আমার বইয়ের জগতে ফিরে যাব। সে শুনে হাসলো। হয়তো সে ঠিকই করেছে ...বিজ্ঞানকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু বর্তমান যুগ যেন এসেছে অন্য কিছু করবার জন্য। আমি কি সেই কেলার যে ক্লিশের ভয়ে অস্থির হয়ে উঠত?...ফ্যুরার ইতিহাস গড়ছেন, তার নাম থাকবে স্তম্ভে স্তম্ভে খোদাই হয়ে। এমন কি রাশিয়ায়ও থাকবে...কিন্তু যুদ্ধ তো আমাদের কাছে ইতিহাস নয়, এ এক ভয়ানক রোমাঞ্চময় খেলা। এর পরে কাজ করতে বসা? সত্যি বলতে কি, সে তো বিশ্রীই লাগবে। হয়তো পরে, যখন বুড়ো হব তখন...এখন তো অন্য কিছু চাই। আমি গ্রামের নাম জানিনা, এখানে সবই গৃহস্থের বাড়ি। কাল কি হবে কে জানে। হয়তো হত হব। কিন্তু আমি তো আর খেলুড়ের হাতের তাস নই, আমি নিজেই খেলোয়াড়। 'পাস' আমি দেব না...কাল 'পি, কের' এক ছোকরা বলছিল, 'ভগবান আমাদের সৃষ্টি করেন নি, করেছেন ফ্যুরার।'....ছেলেমানষি কথা, কিন্তু কিছু সত্যি আছে বইকি। আমি ফ্যুরারের সৃষ্ট জীব নই। তাঁর আগেই আমার অস্তিত্ব ছিল। আমি পড়তাম, কাজ করতাম। কিন্তু যুদ্ধ আমাকে ঢেলে সেজেছে—আমি এখন ভিন্ন মানুষ...

কেলার হ্বিলির সঙ্গে থাকে। সে লেফটেনাণ্ট ক্রাউসের পেয়ারের লোক। কেলার তার এই ভাই-বেরাদরদের সঙ্গে ভালই ব্যবহার করে, হ্বিলির প্রতিও সে সদয়। হ্বিলি হাল আমলের ছেলে, সাহসী, ফূর্তিবাজ আর ভারি হামবড়া তার ভাবখানা। সে কেলারকে বললে ফ্রাঙ্কফুর্টে ইর্মা নামে

তার একটি মেয়ের সঙ্গে ভাব আছে। সে তো ওর বিরহে পাগল হয়ে গেছে। তার ঘণ্টাখানেক পরেই আবার বললে, ইর্মা তাকে কাছেও ঘেঁষতে দেয়না। রুশদের উপর সে ভারি খাপ্পা। তার স্বভাব অমন নয়, বাহবা নেবার জন্যে অমনি করে। কেলার তাকে বহুবার বারণ করেছে, রাধাও দিয়েছে। ওরা যে বাড়িতে আস্তানা গেঁড়েছে, সেখান থেকেই সে একটি মুরগের ছানা চুরি করলে। বাড়ির কর্ত্রী মেয়েমানুষটি তো চেঁচিয়ে এক কাণ্ড বাঁধালে, যেন কেউ তাকে খুন করছে আর কি। এসব কাজ করা বোকামি বইকি—আমাদের তো আরো দুটোদিন এখানে থাকতে হবে।

শোনো, আমি এই ঠিক করে নিয়েছি, যেখানে রাত কাটাব, সেখান থেকে কিছু নেবনা......অন্য বাড়িগুলি তো রয়েছে, সেখান থেকে যা খুশি নাওনা......যে জায়গায় আছি, সেখানকার বাসিন্দেদের সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে হবে......কেলার হ্বিলির লুটের মাল নিয়ে বাড়ির কর্ত্রীকে ফিরিয়ে দিলে। মেয়েলোকটি তার অমূল্য নিধি বুকে চেপে ছুটে পালাল। কেলার হাসলো। তা দিতে বসা মুরগীর মতো মেয়েমানুষটা, একেবারে তাই।...

হ্বিলি আর একটা ছানা জোগাড় করে নিয়ে এল। কয়লার আগুনে ভাজা হোল। কেলার ঠোঁট চাটতে চাটতে মন্তব্য করলে, দিজঁ্যর লা ক্লোসেতের পুলর্দের মতো, শুধু এখন এক বোতল বারগাণ্ডির যা অভাব।

হ্বিলি তারও ব্যবস্থা করলো। সে এক বোতল রম্ বার করলো। হঠাৎ কেলারের মনে হোলো ঃ

আরে আজ তো আমার জন্মদিন। বরাত ভাল, জিরোনো চলছে...... চৌত্রিশে পড়লাম। আমার বয়েসে দান্তে লিখেছিলেন, তিনি তার জীবনের অর্ধেকটা পথ পার হয়ে এসেছেন। আর আমরাও সেই বিরাট মোগলের রাজধানীর পথে অর্ধেক পাড়ি দিয়ে এলাম·········

দীর্ঘ অট্টহাসি উঠলো বাড়ির কর্ত্রীর মুখে চোখের জলের দাগ, সে উঠোন থেকে ভীরু চোখে উঁকি মারলো।

যতটা টানা উচিত তার চেয়ে একটু বেশিই কেলার টেনেছে রম্, কিন্তু মাতাল তেমন হয়নি। সে চেঁচাচ্ছে, গান গাইছে, গ্রামের পথ ধরে হেঁটে চলেছে। দিনটা গরম, তবু ভ্রূক্ষেপ নেই। জীবনকে সে উপভোগ করছে। কি আপশোস, রুশ ছুঁড়িটা এখানে নেই, যত বুড়ী আর কাচ্চা-বাচ্চার দল! মেয়েগুলো বোধ হয় লুকিয়ে আছে। আজ ভোরে লেফটেনাণ্ট ক্রাউসকে একটা ছুঁড়ির সঙ্গে দেখা গেছে। তার পরণে শহুরে পোষাক। লোকটা যেন সব কিছুই এক চেটে করে নিচ্ছে।

ভোজের পরে শুয়ে পড়লো সবাই। কেলারের চোখে ঘুম এল না। সে পড়বার চেষ্টা করলো। কিন্তু উপন্যাসখানা একেবারে বাজে, কৌতূহল জাগায় না। মনোরোগী এক ছাত্রের কথা। সে জমিদারের ছেলে, আর আছে একটি খোঁড়া, কিন্তু সুন্দরী মেয়ে। সম্পত্তির আর প্রেমের স্থায়িত্ব নিয়ে লেখা, নববুই পাতা এসে গেছে, তবু এখনো কিছুই ঘটলো না......বই রেখে দিয়ে বাড়ির খুদে মেয়েটাকে ভয় দেখিয়ে খানিকটা আমোদ পেতে সে চাইলো। যেন ওকে গুলী করতে যাচ্ছে সে, তারপর কয়েকখানা বিস্কুট ছুঁড়ে দিলে তার দিকে। বোকা মেয়ে, এত ভয় পেয়েছে যে নিতে চাইছেনা.......সত্যিই এরা কি ভয় পেয়েছে? যদি পুরানো দিন থাকত, এদের এই বিশেষত্ব নিয়ে গবেষণায় মেতে উঠতাম; এই লাল ঝাণ্ডাওয়ালাদের মধ্যে তুমি সব রকম জাতই দেখতে পাবে। না, ব্যাপারটা ভারি একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। এর চেয়ে গলা ছেড়ে গান গাওয়াও ভাল,

আমার একটি কথা, শুধু একটি ভাবনা
লটে, লটে, কোথায় তুমি—এই তো কামনা।

কিন্তু লটে নেই, কালকের ছুঁড়িটাও নেই......সে কুকুর-ছানাটাকে ডাকলো, বিস্কুটগুলো খেয়ে ফেলুক, ওরও নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। কিন্তু সেটাও খাটের নীচে ভয়ে কুঁকড়ে আছে, আর বিশ্রী শব্দ করছে........ তাকে ঘুমুতেই দেবেনা......তবু কেলার চোখ বুজলো। জানালায় কি

একটা শব্দে সে জেগে উঠলো। ছটা......তাহলে তুঘণ্টা ঘুমিয়েছে। বেশ, বেশ!......ওখানে ওরা কিসের হল্লা করছে? বিপদের সঙ্কেত নাকি? লেফটেনাণ্ট ক্রাউস না বলেছেন, তিনদিন এখানে তারা জিরোবে।

হিবলি উত্তেজিত হয়ে ছুটে এল ঃ

আরে—ঘুমোচ্ছিলে নাকি? আমরা একটা রুশ গোয়েন্দাকে ধরেছি—একটা মেয়েমানুষ। লেফটেনাণ্ট ক্রাউস তাকে জেরা করছেন। আর এক মিনিটের ভিতরেই ওকে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে, যুদ্ধের আইন মতোই চপপট নিকেশ করে দেবে। আমি তো কিছুই জানতাম না। আমি ষ্ট্রাউসের সঙ্গে বসে তাস পিটছিলাম, হঠাৎ কে চেঁচিয়ে উঠলো, ভোল্‌গার নাকি একটা রুশ মেয়েকে ধরেছে। ওর কাছে তুটো হাত-বোমা পাওয়া গেছে, ভেবে দেখ, কি ভয়ানক ব্যাপার!

......এবার লেফটেনাণ্ট এসে হুকুম দিলেন, ওকে এখুনি ফাঁসীকাঠে ঝোলাতে হবে। তিনি ষ্ট্রাউসকে একখানা কাগজে লিখতে বললেন যে মেয়েটা দস্যু। রুশ ভাষায় লেখা কাগজ থেকে ষ্ট্রাউস একেবারে ছবি-আঁকিয়ের মতো লিখে দিলে.......চল দেখে আসি গে!.......

হিবলি আগে আগে ছুটলো, সে অধীর হয়ে উঠেছে, হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বললো, দেখ দিকি, ক্যামেরাটায় ফিলম ভরে নিতে ভুলে গেলাম। কাল একটা রিলই খতম হয়ে গেছে। উঃ ছবি যা উঠবে চমৎকার।.........

ধূসর পোষাক মেয়েটার পরণে, বুকের কাছে ছেঁড়া, হাত তুখানা বাঁধা। যুবতী, সতেরো কি আঠারো তার বয়েস, দেখে সন্ত্রাসবাদী বলে মনে হয় না। মমতা ভরা তুটি তার চোখ, উঁচু কপাল, চুল পালিশ করে আঁচড়ানো, মাঝখানে সিঁথি করা। শহুরে মেয়ে, তাতে সন্দেহ নেই—ওকে এই কাজে পাঠানো হয়েছে।......কেলার ওর তামাটে দেহের অনাবৃত অংশ থেকে চোখ ফেরাতে পারল না।

সার্জেন্ট ষ্টেলব্রাখ্‌ট লেফটেনাণ্ট ক্রাউসের কাছে এগিয়ে এসে বললে,

ওকে কিন্তু পুলিশের কাছে পাঠানোই বোধ হয় ঠিক হবে, কি বলেন ?

কেন ? ও তো নিজেই বলেছে, জ্বালানি কাঠের গাড়ির উপর হাত-বোমা ছুঁড়তেই ও চেয়েছিল। আমাদের আর পুলিসের কাজ এক নয়। ওরা তো সীমান্তে আসতে ভয় পায়। আমি রাইখের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, গেষ্টাপো বা পুলিশ নই......তারপর একটু থেমে বললেন, মিছিমিছি ওর উপর অত্যাচার করে কোনো লাভ হবে না, ওতে আরো প্রতিরোধ শক্তি বাড়বে। আমি ওকে আঘাত পর্যন্ত করিনি, মুলার আর ভোগলার ও যখন পালিয়ে যাচ্ছিল, ওর পোষাক ধরে টেনে ছিঁড়েছে......

কর্পোরাল হ্বারগাউয়ের উপর ফাঁসী লটকাবার ভার পড়লো। সে ছেলে মানুষ। বাবা তার পনীর তৈরী করে। নিজে সে হোলষ্টাইনের হিটলারী যুবসংঘের নেতা ছিল। মিলেরেভোয় দুটি কমিউনিষ্ট স্ত্রীলোক আর এক বুড়ো ইহুদীকে ধরে সে ফাঁসী লটকায়। ওকে দেখলে কেলারের অনুভূতি দুরকম হয়ে ওঠে—ওর অভদ্রতার জন্য ঘৃণা দেখা দেয়, আবার ঈর্ষাও হয়। নতুন মানুষ এরা—আমাদের সংস্কার ওদের নেই, ওদের কাছে সবই সহজ.........

হ্বারগাউ মেয়েটিকে একটা টুলের উপর দাঁড় করালো, গাছের একটা মজবুত ডালে বাঁধলো দড়ি, তারপর পরখ করে দেখলো ভার সইবে কিনা। লাফিয়ে উঠে ডাল ধরে এক মুহূর্ত নিজেই ঝুলে রইলো, হাঁ, মজবুতই আছে .....

হ্বিলি কেলারের হাতে ক্যামেরাটা গুঁজে দিলে।

এমন ভাবে ছবি তোল যেন আমাকে জল্লাদ বলে মনে হয়। আলো ঠিক আছে শুধু বোতামটা টিপবে।.........

মেয়েটি চেঁচিয়ে কি যেন বললে। এই বছরই কেলার একটু-আধটু রুশ ভাষা শিখেছে, কিন্তু মেয়েটি কি বললে সে বুঝতে পারল না। শুধু একটা কথাই সে বুঝতে পারলে, 'আমি মরছি' আর 'স্তালিন'। হ্বারগাউ কৌশলে টুলটা লাথি মেরে সরিয়ে দিলে। মেয়েটির দেহ কেঁপে কেঁপে উঠলো।

স্মিমিডট্ বুড়ো চাষী, কুসংস্কারও তার আছে (তার গলায় আধ ডজন খানেক কবচ-তাবিজ) সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো,

আমার এসব ভাল লাগে না……

ভোগ্‌লার গাল দিয়ে উঠলো।

ওরা আমাদের হাতে ছুঁড়িটাকে আগে তুলে দিলে না কেন। লেফটেনাণ্টের সেদিকে নজরই নেই। সে তো তার ছুঁড়িটাকে ঠিক বাড়িতে তালা বন্ধ করে রেখেছে।

হ্বিলি উত্তেজিত হয়ে কেলারকে বললে,

খাসা হয়েছে। আমার তো ভয় হয়েছিল ছবি বোধ হয় উঠবেই না। আলো তো নেই বললেই হয়……..যাক! ইর্মার কাছে ছবি পাঠাব। ছুটিতে যখন বাড়ি ফিরব ও ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরবে।………

কেলার চারপাশের কথা শুনতে লাগলো। সবাই মেয়েটির কথা বলছে। নেই অসূয়া, নেই করুণা, কেমন স্বপ্নালুভাব। আর স্বপ্নেই যেন সবাই গাল দিচ্ছে।

কেলার আস্তানায় ফিরে গিয়ে গার্ডাকে একখানা ছোট্ট চিঠি লিখলে ঃ

আজ আমার জন্মদিন। এখানে বাড়ির গড়া জন্মতিথির কেক নেই, নেই তোমার আলিঙ্গন।

আমরা পৃথিবীর আর এক প্রান্তে এসে পড়েছি। রুডিকে বলো উটগুলিকে এখানে চিড়িয়াখানায় পুরে রাখা হয় না, তারা মুক্ত ঘুরে বেড়ায় ঘোড়ার মতো। আমি চুম্বন জানাচ্ছি ছেলেমেয়েদের আর তোমাকে। আমার প্রিয়া, আমার পুতুল তুমি। তোমার চিরদিনের জোহান।

সে মনে মনে ভাবলো, ফাঁসীর ব্যাপারটা না লেখাই ভালো, ওসব প্রবৃত্তি খুঁচিয়ে না জাগানোই ভাল……আমাদের জগৎ এখানে আলাদা। আমরা সৈনিক…কালই হয়তো মরে যেতে পারি।……

সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে হ্বিলি, আমরা কোন্ সহরে চলেছি।

স্তালিনগ্রাদে।

মেয়েটি চিৎকার করে উঠেছিল, 'স্তালিন' !...ওরা এত বোকা, এত ক্ষ্যাপা ! হয় ওরা মারবে, নয়তো মরবে। শান্তিতে বাস করবার জন্য ওরা তৈরী হয়নি, তৈরী হয়নি সভ্যতার বিকাশের জন্য। ওদের শক্ত রাশ দিয়ে বাঁধতে হবে, বন্দুকের নল থাকবে উদ্যত......হাঁ ফাঁসী দেবার মানে হয় বইকি। ওদের গুলী করা তো উচিত নয়, যুদ্ধে তো গুলী বৃষ্টিই চলে।...... কিন্তু মেয়েটির দেহের সেই কুঞ্চন, তার তো অন্য—অন্য মানে......

সন্ধ্যা নেমে এল। ল্যাম্পের নিবুনিবু আলোয় পড়া তো অসম্ভব।...... কেলারের অস্বস্তি লাগছে। যুদ্ধের আগের হাইডেলবুর্গের উজ্জ্বল আলোয় আলো পথে বেড়াতে পারলে আজ কত ভাল লাগত। একটা কাফেতে গিয়ে সে ঢুকত, তারপর বাজনা, ডোরাকাটা টেবিল ঢাকনা, লেস দেওয়া পোষাক-পরা পরিচারিকা......দূর ছাই ! এই দেশে ঘুমে একটা না একটা বাধা আসবেই—হয়তো ছারপোকা, নয়তো কাঁদুনে বাচ্চা-কাচ্চা, বা হুলো বেড়াল......ঐ বিশ্রী কুকুর ছানাটাও আছে ! ভদ্র কুকুর হলে চুপচাপ শুয়ে থাকত। এই চোপরও ! হঠাৎ কেলার হেসে উঠলো,

হ্বিলি, তোমার কাছে এক টুকরো ফাঁসীর দড়ি রাখনি। কি বিশ্রীই কাটলো জন্মদিনটা......সারা বছরটা কেমন যাবে কে জানে.........

চার

দিনে অসহ্য গরম ! রৌদ্রদগ্ধ স্তেপ, মরুভূমি, হলুদ ছোপ ধরেছে, গন্ধকের মতো কটুগন্ধী। গলা জ্বালা করে, আর আছে দুর্নিবার তৃষ্ণা। কিন্তু রাতগুলি এখনই ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। জলহাওয়াই যে এর জন্যে দায়ী, একথা কারো মনেই হয় না, জলহাওয়া যে আছে তাই কি মনে হয় ! এখন না হেমন্ত। ঋতুতো নেই—শুধু তার স্মারক রয়েছে নির্মেঘ আকাশ। তার

মানে শীগ্‌গিরই আসবে মাথার উপরে ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান।...তুমি কথা বলতে পার্চ্ছনা, পা নাড়তে পারছ না, চোখ খুলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে তোমার, পা চলছে আপনিই, তোমার চোখও তাই—তোমার উপর তো আর তারা নির্ভর করছেনা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসেরই শামিল এ যেন একখানা রুটী, এক টীন পেট্রোল, যার জন্যে নালিভাইকোর ভাবনার অন্ত নেই, অথবা মেশিনগানের কার্তুজের বন্ধনী, যেন ছেঁড়াখোঁড়া মানচিত্র, তাতে লাল নীল পেন্সিলের বৃত্ত, আঁকাবাঁকা আর গোল রেখা। শুধু একটী জিনিষ এখন আছে—সে যুদ্ধ, সবাই তা জানে, কিন্তু কেউ দেখতে পাচ্ছে না।—এমন কি ওসীপ, ক্যাপটেন মিনায়েভ আর কর্ণেল ইগনাৎসেভও। মনে হয় যুদ্ধ দেখতে যেতে হবে অন্য যুগে, নয়তো ষ্ট্রাটোস্ফিয়ারে। পুরো একদিন কি তার বেশি ধরে হয়তো চললো যুদ্ধ, কয়েক ঘণ্টার জন্যে আবার এল বিরতি, আবার জ্বলে উঠলো। একি যুদ্ধ! মানুষকে হতবুদ্ধি করে দেয়, বিস্মৃতির গর্ভে টেনে নিয়ে যায়, এ এক যেন জড়তা এনে দেওয়া বাতব্যাধি। চোখ আর হাত রয়েছে সজাগ আর সক্রিয়, ইচ্ছাশক্তিও জাগ্রত, কিন্তু সে যেন অন্যের। স্থাপালভ ট্যাঙ্ক প্রতিরোধকারী কামান চালায়, ট্যাঙ্ক একশো গজের ভিতরে সে আসতে দেয় এই ইচ্ছাশক্তির বলে, গোলন্দাজ চাচুসকিনকে সে দ্বিতীয় লাইনে শত্রুর ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা ছুঁড়তে সাহায্য করে, সার্জেণ্ট-মেজর নালিভাইকোকে সময় মতো রসদ জোগায়, আর ক্ষুদে মেয়ে লিনা গোরেলিক যে নিয়মিত বিমান হাম্‌লার পর গায়ের মাটী ঝেড়েঝুড়ে ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সেবায় লেগে যায়, তাকেও শক্তি জোগায়। এ তো দৃঢ়তার চেয়েও অনেক বেশি, অধ্যবসায়ের চেয়েও এ মূল্যবান। মানুষ যখন কোনো কিছু ভাবতে পারে না, মনে আনতে পারে না, তখনো সে তার ভিতরে থাকে। শত্রু তার গন্তব্যে এসে পড়েছে, উত্তেজনায় এগিয়ে চলেছে ডনের দিকে, যেন সে তাড়াতাড়ি দৌড় শেষ করে বাজি জিততে চায়, তাকেও সে যেন বাধ্য করছে। এই তাণ্ডবলীলায় আরো ট্যাঙ্ক আরো সংরক্ষিত সৈন্যের সে

জোগান দেবে, আকাশ ছেয়ে ফেলবে জাঙ্কার, মেসাররিট আর ফক্ বিমানে!

আবার সেই শব্দ। ডুবুরী বোমা পড়ছে...ভাঙচুর আর শব্দ। যেন আন্তঃগ্রাহিক একস্‌প্রেস গাড়ীগুলি পূর্ণবেগে এসে এই টিলার ওপর পড়ছে। টিলাটা বহুদিন ধরে চষা হচ্ছে, ফালায় ফালায় চিরে গেছে। সেখানে দুশো মানুষ একটা বিরাট বাহিনীকে রুখবার চেষ্টা করছে। হয় সে নতুন, নয়তো বিদ্ধস্ত বাহিনী। তিনশো ছেষট্টি নম্বর, না অন্য কোনো পল্টনই হবে। ট্যাঙ্কের উপরে আঁকা মদমত্ত হস্তীসার, শুঁড় তাদের উঁচিয়ে আছে, নয়তো রহস্যময় অর্ধ অশ্ব বা অর্ধ নর মূর্তি বা নর-কপাল। নরকপালের তো শেষ নাই। শিরস্ত্রাণে, বিমান চালকের টুপীতে, সৈন্যের পল্টনি টুপিতে ছড়িয়ে আছে, দাঁত তাদের বার করা, মুখ বিকৃত করে আছে, ভয় দেখাচ্ছে। পরশু মিনায়েভ দেখেছে পায়ের সার—স্কন্ধহীন পায়ের সার—স্কন্ধ নেই, জর্মান বুট, আর পট্টি শুধু। তারাই এগিয়ে আসছে। কাদের পা, কেন ওরা এল এখানে?

এই টিলা—এক বিন্দু বালুর কণা, মানচিত্রে দেখা যায় না এমনি অস্পষ্ট একটা বিন্দু। কত হাজার হাজার এমনি টিলা আছে—স্তেপে ছড়িয়ে আছে, আছে নিচু জমিতে—বালুর স্তরে—আবার শহরের কাছে উচ্চ ভূভাগেও রয়েছে—কারখানা অঞ্চলের কাছে। সব মিলিয়েই তো যুদ্ধক্ষেত্র —যুদ্ধ চলছে, যেন দাবা খেলার চালের মতো আগে থেকেই ভেবে রাখা হয়েছে। ঘড়ীর কলকব্জার মতোই জটিল—এ যেন এক বিরাট যন্ত্র— নালিভাইকো যদি জালানি কাঠ জোগাতে না পারে, সার্জির স্যাপাররা যদি সেতুর সংস্কারে বিফল হয়, একটা মেশিনগানও যদি হঠাৎ বিকল হয়ে যায়—চির খেয়ে যাবে, দেখা দেবে ফাটল—মানুষের এই দেয়াল ধসে পড়বে। এই যুদ্ধে সবই ন্যায়, অন্যায় এখানে নেই, সব কিছুই হঠাৎ এসে পড়ছে, ঠিক যেন জীবনের মতো। ওসীপ, মিনায়েভ আর জারু-

বীনের কাছে এই পাথরের স্তূপে বোমার খাত ছাড়া আর কিছু নেই। চাতুসকিনের শুধু কর্ণেল ইগনাতভের খাতের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে—একটি সূক্ষ্ম ইস্পাতের তারে, সেও তো ষ্টিল তার, যে কোনো মুহূর্তে ছিড়ে যাবে, তাদের জীবনের তারের মতো। অবসাদ, অসহ ক্লান্তি, কানের পটাহ ছিড়ে আছে, চোখ মনি কোঠা উলটে যাচ্ছে, মন অবসন্ন, কিন্তু তবুও টিকে আছে—থাকতে হবে টিকে। এ যেন দেহযন্ত্রের ব্যাপার, চিন্তার গণ্ডীর বাইরে। টিকে থাক, থাক্। সবই অজানা, শুধু একমাত্র জানা উড়ে আসবে বিমান, গোলন্দাজ বাহিনী শুরু করবে দাগরাজি। আসবে হুড়মুড় করে ট্যাঙ্কের সার। স্থাপোভালভ আর টিঝিক বন্দুক শক্ত করে চেপে ধরবে। চাতুসকিনের গা দিয়ে দরদর করে ঝরবে ঘাম, তার লক্ষ্য স্থির—ট্যাঙ্কের দিকে উদ্যত হয়ে আছে তার নল। যদি ট্যাঙ্ক তারা থামাতে পারে, তারা হাঁফ ছাড়বার সময় পাবে—একটা মাংসের টিন খুলে ফেলবে, শেষ বিজ্ঞপ্তির খবর জিজ্ঞাসা করবে, হয়তো বা চিঠি লিখতে বসে যাবে—নয়তো একটা সিগারেট পাকিয়ে নিয়ে কষে টান দেবে—একটা আক্রমণ প্রতিরোধ করে কষে এক টান মারা—যেন আবার জীবন ফিরে পাওয়া।

কি আশ্চর্য! তাড়াতাড়ি আবার জীবনের বৃত্তে ফিরে আসা যায়। প্রথমে মুহূর্তের শূন্যতা এসে সব কিছু ছেয়ে ফেলে, চোখ বিস্ফারিত হয়ে থাকে, কিছুই দেখতে পায় না; ঘর্মাক্ত মুখ, কথা নেই। তারা নিজেরাই বিশ্বাস করতে পারে না তারা বেঁচে আছে। এমনি এক মুহূর্তে ওসীপের মনে হলো, বহু বহু আগে সে জারুবীনকে বলেছিল, ভয় আসে অনভিজ্ঞতা থেকে, ভয় কেমন থিতিয়ে যায়, তার উত্তেজনা থাকে না। হাঁ, সত্যিই তাই হয়। অন্যপক্ষ যখন গুলীর পর গুলী ছুঁড়ে যায়, তখনতো মন অবসন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু এখন সবই শান্ত। হঠাৎ ভয় এসে তোমাকে ছেয়ে ফেলবে, যা হয়ে গেছে তারই ভয়। কথা বলার মূল্য কি, তুমি ভয়তো পেয়েছই,

কিন্তু তার চিন্তাটাই বাজে....ওসীপ দাড়ি কামাতে বসলো, ব্লেডখানা ভোঁতা, ও কেটে ফেললো। জারুবীন সঞ্চয়ী, তার কাছে নতুন ব্লেড আছে। ভালোই হোলো, কিন্তু জার্মানরা......

এক ঘন্টা আগে পায়ের নীচের জমি কেঁপে উঠেছিল, একথা এখন তো বিশ্বাস করা অসম্ভব। ওরা ঠাট্টাতামাসা শুরু করেছে, একের অন্যের উপর তম্বি চলছে, যুদ্ধ নিয়ে চলছে তমুল তর্ক বিতর্ক—তাদের স্বমুখের এই যুদ্ধ নয়, দূরের যুদ্ধই তাদের বিষয়। জারুবীন ভয়ে ভয়ে জামিয়ার একখানা সংখ্যা বার করলো—সেনাবাহিনীর মুখপত্র।

মিনায়েভ চেঁচিয়ে উঠলো, আমরা তো এখানে বসে কিছু জানতে পারছিনা। ভিয়াজমা আর রেজাভে আমরা আঘাত হেনেছি। যদি ব্যূহ ভেদ করা যায় তাহলে জার্মানদের তো নিকেশ করে দেব।

জারুবীন এক টুকরো পনার চিবুচ্ছিল, সে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কুড়ে মানুষ, মিনায়েভ তাকে তাই বলে আর তাতে অবাক হবার কিছু নেই। সে বললে,

কাল সাত নং পণ্টনের ক্রানৎস জার্মান বেতার ধরেছিল, তাতে বলা হয়েছে যে মিত্রশক্তি নেমে পড়েছে....আমি লিখে নিয়েছি। আস্তে আস্তে সে নোটবইয়ের পাতা ওলটাতে লাগলো। এই তো পেয়েছি। দ্যিপে শহরের কাছে নেমেছে।

তখন বলনি কেন? তুমি একেবারে কুড়ে। এই তো দ্বিতীয় রণাঙ্গন —খেয়াল হয় নি বুঝি?

মিনায়েভ ভারি আমুদে লোক, ওর চেয়ে কারো জিভে ধার নেই, সবাইকেই জালায়, আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেও ওর জুড়ি মেলা ভার। ওসীপ প্রায়ই বলে,

তুমি যেন একটা হাউই···এই তো এই মাত্র মিনায়েভ খেতে পর্যন্ত পারলনা; সে হাত নেড়ে চেঁচিয়ে বললে,

না, নাহে তোমরা বুঝতে পারছনা। ব্যাপারটাকে অত খেলো ভেবনা। এই তো দ্বিতীয় রণাঙ্গন!...তার মানে ফ্রিৎসদের হয়ে এসেছে...আর দেখ দেকি, এই সময়ে একখানা মানচিত্র পর্যন্ত নেই! দ্যিপে কোথায়? ওসীপ তোমার মনে পড়ছে। পারী থেকে বহুদূরে নাকি?

না, খুব দূরে নয়, ওখানে সব জায়গাগুলিই কাছাকাছি।

তুমি বেশ ধীরে সুস্থে একথা বলতে পারছ।

একটু সবুর করোনা সাঙাৎ, তুমি তো একেবারে অধৈর্য হয়ে উঠলে দেখছি.......খবরের কাগজে তো এসম্বন্ধে কোনো খবরই নেই। হয়তো জার্মানরাই খবরটা তৈরী করেছে, অথবা এটা ছোটখাটো একটা হামলামাত্র। আমি ওসব মায়াবাদে বিশ্বাসী নই।

মিনায়েভ ওসীপ যেমন করে সভায় কথা বলে, ঠিক তেমনি ভাবে ভ্রূকুটি করে একটা টিনের উপর পেন্সিল ঠুকতে ঠুকতে বললে,

এই সময়ের শূন্যতায়, মায়া তো আগাছার মতো গজাবেই, কিন্তু সেই মায়ার বিরুদ্ধে চালাতে হবে লড়াই। লম্বা গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে ও গান গেয়ে উঠলেন,

যার মায়া গেছে, তার কি আছেরে আর।......

জারুবীন বলে উঠলে, আহা এই সময়ে একটা গ্রামোফোন নেই!

আমরা এবার দ্বৈত সঙ্গীত জুড়ে দেব। ডাক্তার গোয়েবলস্ এবার গান শোনাবেন। মিনায়েভ গান গেয়ে উঠলো, ওর ধূসর রঙের কুকুর ছানাটাও ডাকতে শুরু করলে—যেন সে মিনায়েভকে ঠাট্টা করছে। ওসীপ হো হো করে হেসে উঠলো।

জবর গান! এ গান ওকে শেখালে নাকি?

আমি? নাতো। আমার কি আর শেখাবার ফুরসৎ আছে। ফ্রিৎসরা ওকে শিখিয়েছে। আমি শুধু ওর অন্তর্নিহিত প্রতিভা আবিষ্কার করেছি। ডাক্তার গোয়েবলস্ এবার দ্বিতীয় রণাঙ্গনের উদ্বোধনে আমাদের একটা গান শুনিয়ে দিন.........

যুদ্ধের আগে মিনায়েভ ছিলো আইন কলেজের ছাত্র। ওকে যখনি জিজ্ঞেস করা হোত, ও কি হবে, সরকারী উকিল না ব্যারিষ্টার, ও জবাব দিত, একটা ছোট কেন্দ্রের সৌখীন অভিনেতাদের পরিচালক। ওসীপকে সে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল তার বহুমুখী প্রতিভায়। সাঁতারু হিসাবে সে বিখ্যাত, দাবাখেলা সে ভালবাসে, সাহিত্য সম্বন্ধে তার পড়াশুনা আছে, ভাল গল্পও বলতে পারে। বহুদিন ওসীপ ওর কথা বিশ্বাস করতে পারেনি, সে ভাবত সবই বুঝি ওর বানানো। কিন্তু যে দিন শুনলো সে কর্ণেল ইগনাতসভকে বলছে, সে আর কমিশার মিলে এক ধ্বংসকারী শত্রুকে ধরেছে, সে তো অবাক। কাহিনীটি একেবারে সত্যি, শুধু সত্যি ঘটনা ওর বর্ণনার গুণে আরো চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠলো.........

ওসীপ তাই বললে, পারীতে আমার এক ভাই আছে, জানি না সে বেঁচে আছে কি মরে গেছে......সে একেবারে খাঁটি দুঃসাহসী। কিন্তু লোক ভাল। সে আমাকে তার জীবনের ঘটনা বলে। সে যেন এক উপন্যাস। তুমি শুনলে একখানা বই লিখে ফেলতে পারতে।.........

মিনায়েভ জবাব দিলে, আমার নিজেরই দুঃসাহসিকতার অভাব নেই। যখন যুদ্ধ শেষ হবে, আমি এই অভিশপ্ত টিলা নিয়ে একখানা বই লিখব, তোমার কথা, আমার এই কুকুর ছানা ডাক্তার গোয়েবলস্-এর কথাও তাতে থাকবে। দেখবে কেমন মোটা টাকা পাই......

মনে হয় মিনায়েভ বুঝি গম্ভীর ভাবে কথা বলতে জানে না। ওসীপের তাকে হিংসে হয়। তরুণ মিনায়েভ, আর ওর অমনি বেপরোয়া স্বভাব। ওসীপ নিজের দুঃখের কথা তো কাউকে বলেনি। তাই বোধ হয় দুঃখ অসহ্য হয়ে উঠেছে। সে আপন মনে ভাবে, আশাকে আঁকড়ে ধরে থাকাতো বোকামি। এক বছর কেটে গেল, ওরা একেবারে অসহায় হয়ে গেছে ......হাঁ, এ তো স্পষ্ট কথা। সঙ্গীরা যখন চিঠির কথা বলে, ওর মনে ঘনিয়ে আসে অন্ধকার। পরিবারের মাসোহারা, ছেলেমেয়েদের স্কুলের নম্বর,

ঘর পাওয়া আর হারানো, বিচ্ছেদ, আমোদ-প্রমোদ, বিশ্বস্ততা ওর কাছে এসবের কোনো দাম নেই। কেউ কাউকে নিজের আশঙ্কার কথা জানতে দিতে চায় না, সবাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ধোঁয়াটে ভাবে বলে, কাগজে একটা কবিতা দেখলাম, নাম তার 'তোমার প্রতীক্ষায় আমি বসে আছি।' ভাবছি সত্যিই কি আমাদের মেয়েরা বসে আছে......জারুবীন ভাবলেশহীন স্বরে বলে, কেউ বা বিশ্বাসী হয়ে আছে, কেউ বা ওদের পোষ মেনেছে। তারপর তার বুকখানা দমে যায়। যদি তার মাশেঙ্কা ওদের পোষ মানে!

মিনায়েভ হেসে ওঠে,

তোমার নিজের প্রিয়াটির কথা ভাবছ না তো? ভাল, ভাল। আমার ঠিক ঐ একই কথা। আমিও ভাবছি না, আর আমার ব্যাপারটা একটু অন্য ধরণের। আমার একটি বান্ধবী ছিল। মা প্রায়ই বলতেন রেজিষ্টারী আফিসে যেতে, কিন্তু আমরা শুধু ব্যাপারটা দূরে সরিয়ে দিচ্ছিলাম। এত ঘন তখন আমাদের প্রেম যে অনুষ্ঠানের কথা নিয়ে মাথাই ঘামাচ্ছিনা। তারপর যুদ্ধের ঠিক আগে কয়েক সপ্তাহের জন্য গেলাম লেনিনগ্রাদে। ফিরে যখন এলাম মেয়েটি বললে, আমার উপর রাগ কোরো না, আমার দোষ নেই। সংক্ষেপে ব্যাপারটা এই! কারমেনের বাজনা, আর অন্য আর একজনের বিয়ের নিমন্ত্রণে ব্যাপারটা সেইখানেই ইতি হয়ে গেল। আমার এখন ওসব অপঘাতী ব্যাপারে একেবারে ইন্সিওর করা আছে।

মিনায়েভ তার মাকে নিয়েও ঠাট্টা করে, মা মানুষটি ভাল। তিনি লিখেছেন, আমিও যাব, লড়ব। এই টিলার উপরে তাঁর ছবি আমি যেন দেখতে পাচ্ছি। তিনি হয়তো এখানে বসে ভাবতেন, ঐ হিটলার দাঁড়িয়ে আছে। ওর কাছে গিয়ে ওর গালে এক চড় কষিয়ে দেব!.........মার বয়েস তেষট্টি বছর, এখনো শক্ত-সমর্থ আছেন, কাঠ কাটেন .....মিনায়েভ চিঠির সেই অংশটা বাদ দিয়ে যায়, যেখানে আছে মার মনের ব্যাকুলতা। মন ছুঁয়ে যায়। সে ভাবছে মার চোখের জলে চুপসে গেছে অক্ষরগুলি। সে বলে না,

মা কাঁদছেন বসে বসে আর বলছেন, আমার মিত্তেঙ্কা কোথায় গেল ?

কিন্তু তাঁর মিত্তেঙ্কা তো এখন দক্ষ সেনাধ্যক্ষ। কোথায় বাধা দিতে হবে তা সে বেছে নিতে পারে, জলদি সে বেছেও নেয়, কর্ণেল ইগনাতভ বলবার আগেই পরিকল্পনাটা বুঝে নেয়, শুধু একটা ব্যাপারেই ওসীপ ওকে ভৎর্সনা করে।

তুমি নিজেকে বড় খেলো করে ফেল, এটা নিছক বোকামি।

মিনায়েভ তর্ক জুড়ে দেয়না, কিন্তু যা ভাল বোঝে তাই করে। তার মনে হয় সবাইকে উৎসাহ দিতে হবে। সব কিছুই আজ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। যে নিয়তি তাঁদের জন্য ওৎ পেতে আছে তার স্বরূপটা সে আগেই জানিয়ে দিতে চায়।

ফৌজে সংযত, গম্ভীর বয়স্ক যেমন আছে, তেমনি আছে তরুণের দল। ভদ্র নম্র উজবেক, উদ্ধত ইয়ারোস্লাভ, জেলে, মিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রী—হরেক রকমের মানুষ আর পেশার সমাবেশ। কারো সঙ্গে মিনায়েভ একেবারে ব্যবসাদারী চালে কথা বলে ; কারো সঙ্গে বা হাসি ঠাট্টা করে, কাউকে বা বিদ্রূপে অতিষ্ঠ করে তোলে ; কেউ বা হাস্যাস্পদই হয়। হাস্যাস্পদ হবার জন্যেই যেন লিউবিমভের জন্ম। বেসামরিক জীবনে, ওর পেশা ছিল নাপিতগিরি। কিন্তু এখন ও একজন স্কাউট (যারা শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে দেখে।) লিউবিমভের কাছে সবই 'ঐতিহাসিক'। জারুবীন যখন কর্ণেলের ঘাঁটিতে তাকে যাবার হুকুম দিলে, সে বলে উঠলো, এ এক মহান ভার আমার উপর অর্পিত হোলো—এ তো ঐতিহাসিক দায়িত্ব। ও বলে, যুদ্ধের আগে লিউবোচকাকে নিয়ে আমি যখন রেজিষ্টারি অফিসে গিয়েছিলাম, সেদিন এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছিলাম আমি। একদিন মিনায়েভ ওকে ভারি জ্বালাতে শুরু করলে। ও কিছুটা মাখোরকা (একরকম তামাক) ওর হাতে ঢেলে দিয়ে বললে, এই নাও, এবার একটা ঐতিহাসিক সিগারেট

পাকিয়ে টানো। লিউবিমভ কিন্তু এ ব্যাপারটা বানানো বলেই উড়িয়ে দেয়। বলে, কমরেড ক্যাপটেন আমি কখোনো একথা বলি নি।

সেদিন বিকেলে লিউবিমভ জানালো, সে খবর আনতে যাবে। ফ্রিৎস-গুলো যেন চুপচাপ মেরে গেছে, ওদের কিছু একটা ফন্দি আছে নিশ্চয়ই। ...মিনায়েভ তাকে যাবার হুকুম দিলে। কমিশার ছিল না—তাকে কর্ণেল ঘাঁটিতে তলব দিয়েছিলেন।

ইগনাতভের ঘর তামাকের ধোঁয়ায় আছন্ন। ওসীপ তো প্রথমে মেজরকে দেখতেই পায়নি। কর্ণেল মানচিত্রের উপর ঝুঁকে পড়ে কি দেখছিলেন, কনুই ছুটো পাখার মতোই দুলছিল।

কর্ণেল ওকে দেখে বলে উঠলেন, কিহে তোমাদের ওখানে সব চুপচাপ নাকি? রোমানভ্স্কী আর বাবেচেঙ্কোর ওখানেও তাই। ওরা নতুন পল্টন আমদানি করেছে। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। কিন্তু কোন্ পল্টন এলো তা জানতে পারিনি। রোমানভস্কী তা জানবার ভার নিয়েছে। ওরা বুঝতে পারছে, সহজে কাজ হাঁসিল হবে না, তাই পল্টনের পর পল্টন আমদানী করছে...., আমাকে জানানো হয়েছে কাল আমরা সৈন্য পাব। লোকজন কেমন আছে? খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বুঝি?

ইগনাতভ এবার মেজরের দিকে তাকালেন।

এই ব্যাটালিয়নের কমিশার আলপের্ত। আমি তো আশা করি...

কিয়েভ-এর লোক আপনি? মেজর জিজ্ঞেস করলেন।

হাঁ।

আপনার স্ত্রীর নাম কি রাইসা গ্রিগোরিয়েভ্না?

হাঁ।

ঠিক এই সেই লোক। কমরেড কমিশার আপনার স্ত্রী আপনাকে খুঁজছেন। হঠাৎ আপনাকে আবিষ্কার করা গেল যাহোক। কর্ণেল আমাকে কথায় কথায় আপনার নাম করেন। নামটা খুব সাধারণ নয়,

তাই আমি আপনাকে জানাতে বলি আমি পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে সোজা এখানে এসে পৌঁছেছি আঠারোই তারিখে···ওখানে এখন জোর লড়াই চলছে....

মেজর এবার রেজেভ আক্রমণের গল্প ফেঁদে বসলেন। বেশ শুরু হয়েছিল, কিন্তু তাঁর পল্টন একটু বেশি দূর এগিয়ে গেল, ডান দিকের রেজিমেণ্ট তার সাহায্যে এগুতে পারলো না। এবার এল ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি।... মেজর নিজের গল্পে এত মসগুল হয়ে গেলেন যে কমিশারের স্ত্রীর কথা তাঁর মনেই রইল না, ওসীপের তাঁকে বাধা দেবার সাহস হোলো না। শেষে তাঁর মনে পড়লো।

আরে ভুলেই গেছি, আপনি আপনার স্ত্রীর খবর জানতে চান। আমার তিরিশ নম্বর পল্টনে তিনি যুদ্ধ করছেন।...তিনি স্নাইপার (আড়াল থেকে যারা গুলী ছোঁড়ে)।

ওসীপ লাফিয়ে উঠলো, সে অবাক হয়ে গেছে। রায়া—স্নাইপার—অসম্ভব! কমরেড মেজর, আপনার হয়তো ভুল হয়েছে।

না, না, ভুল হয়নি। আমাদের তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে দেননি—বার বার পেড়াপীড়ি করতে লাগলেন, যাতে আমরা পিপলস্ কমিসারিয়েট আর রাজনৈতিক দপ্তরে লিখে আপনার খবর নিই। আমি বলছি শুনুন, রাইসা গ্রিগারিয়েভনা আলপের্ত, কিয়েভ-এ বাড়ি, স্বামী রাজনীতি শেখান —আর আপনি কি চান?...তিরিশটা ফ্রিংসকে তো তিনি ঘায়েল করেছেন। বীরত্বের জন্য 'লাল তারা' পদকও পাবেন...

ইগনাতভ সসেজ আর আলু ভাজা খাওয়ালেন, সঙ্গে ভোদকা। ওসীপ বসে গেল খেতে, তার মুখে হাসি—নিজের অনুভূতিকে সে চেপে রাখতে পারছিলনা। মেজর কি বলছিলেন, তাও শুনতে পায়নি। সে যেন তখন স্বপ্নের ঘোরে। মেজর এবার বললেন, দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার খবর শুনছি—সেটা কি সত্যি?

ওসীপ স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলো।

কর্ণেলের মুখে বিদ্রূপের হাসি।

দ্বিতীয় রণাঙ্গন!...জার্মানরা তো আগেই ভেগে পড়েছে। এটা কি আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না মেজর—একদল টহলদারী সৈন্য পাঠানো, না লোক দেখানো? কিন্তু সে যাই-ই হোক, একটা কথা বহুদিন থেকেই স্পষ্ট বুঝেছি, আমাদের নিজেদের উপরেই নির্ভর করতে হবে।...আমাদের কেউ রক্ষা করবে না। ওরা বরং আমাদের ওদেরকে রক্ষা করবার জন্য ডাকতে পারে...

সে রাতে ওসীপ তাঁর বন্ধুদের বললে,

শুনেছ, স্ত্রীকে ফিরে পেয়েছি। ও স্নাইপার···ও এক সময়ে পিয়ানো বাজাত। মা ওকে একটা সার্ট ধুতেও কখনো দেননি। ভারি দুর্বল কিনা। আর ও-ই কিনা তিরিশটা জার্মানকে ঘায়েল করেছে! আবার লাল তারা পদক পাবে...কি বল হে...ঠিক উপন্যাস নয়?

মিনায়েভ হো হো করে হেসে উঠলো,

বলি নি তোমাকে? লেখক টেবিলে বসে মাথা ঘামিয়ে কত কথা লেখেন, তার জন্যে টাকাও পান, কিন্তু জীবন উপন্যাসের চেয়েও অদ্ভুত, অদ্ভুত তার ঘটনা..কমিশার, তোমাকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। তোমার খুদে মেয়েটির কথা কিছু বললেন?...

না, তিনি জানেন না। সে তার ঠাকুরমার কাছে আছে। আমার তো তাই মনে হয়। রায়া তাদের অন্য কোথাও নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দিয়েছিল।

কর্ণেল দ্বিতীয় রণাঙ্গনের কথা কিছু শুনেছেন?

সে তো একটা ভণ্ডামি। দ্বিতীয় রণাঙ্গন বলে কিছু নেই। শুধু লোক দেখানো মাত্র...

মিনায়েভ জলে উঠলো ঃ

কি! ছেলেখেলা নাকি! ওরা অথচ আমাদের অভিনন্দন জানিয়ে

ঝুড়ি ঝুড়ি তার পাঠাচ্ছে। না, না ছেলেখেলা নয় মশাই। আমি তো বলব, ভদ্রলোকের মতো ব্যবহার তো এটা নয়।

হঠাৎ মিনায়েভ হেসে উঠলো।

হাসছ কেন?

একটা হাসির গান মনে পড়লো।

ইংরেজ লাটটি,
গুমোর তার ভারি
খুব তার মনের জোর
অনেক জাড়িজুড়ি।
দেশের সেবা করেন তিনি
আর আছে তাঁর মান
ভালো খাওয়া-পরা আছে
তারপরে নিদ্ যান।

নিজে বানালে না কি?

না পলিসায়েভের ছড়া। তখন পুশকিন বেঁচে ছিলেন।

লিউবিমভ সত্যিই একটা কাজ করে ফেলেছে। সে একজন জার্মান-কে বন্দী করে নিয়ে এল।

ক্যাপ্টেন, এই হাঁদাটা জল আনতে গিছলো। দুজন ছিল, একটাকে সাবড়ে দিয়েছি।...

তোমার উর্দিতে রক্ত কেন?

বেজন্মাটা ছোরা বসিয়ে দিয়েছিল আর কি! ভাগ্যিস ফসকে যায়। আমি এটাকেও নিকেশ করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু অনেক করে ইচ্ছে চেপে রেখেছি। ভাবলাম—দেখি—ওকে কথা বলানো যায় কিনা। ও একজন যেমন তেমন লোক নয় কমরেড ক্যাপ্টেন।......

মিনায়েভ হাসলো।

তবে কি 'ঐতিহাসিক' কিছু হবে ?

না, না ঐতিহাসিক নয়। ও সাধাসিধে লোক নয়, কিন্তু খাঁটি বেজন্মা। ওর সঙ্গে খুদে পাখীর মতোই ব্যবহার করলাম, ওকে পিঠে বয়ে নিয়ে আসছিলাম, আর ও কিনা ছোরা বসিয়ে দিলে...

লিউবিমভ এবার গালাগাল দিতে লাগলো। ভূতপূর্ব্ব এই নাপিত, যে চিরদিন ভদ্র ব্যবহারই করে এসেছে, সে কোথা থেকে শিখলো এত গালাগাল, 'এত পুঁজি তার কোথায় ছিল ? হয়তো এখন ওর ভিতরটা একেবারে গরম হয়ে টগবগ করে ফুটছে, নিজেকে সে দমিয়ে রাখতে পারছেনা—কেউ তাকে থামাবারও চেষ্টা করলো না—ওর ভিতরে যা কিছু জমে আছে বেরিয়ে আসুক না।...

লিউবিমভ থামতে ওসীপ বললে,

লিনার কাছে যাও, ও তোমার ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেবে।

লিউবিমভ ওসীপের দিকে তাকিয়ে লজ্জিত হলো। মিনায়েভকে সে বললে,

কমরেড ক্যাপ্টেন, আমি ওর গায়ে হাতও তুলিনি, কিন্তু বেজন্মাটা আমাকে ঠিক চোরা-গোপ্তা মেরে বসলো। যখন জেরা শেষ হবে, আমাকে এক ঘা কষাতে দেবেন। ওতো ছোরাই মেরেছিল...

জার্মান সৈনিকটি দাঁড়িয়ে আছে, সে মিনায়েভকে 'হের্ কর্ণেল' বলে ডাকলে। সে জানাল তার ডিভিসন এখনো লড়াইয়ে নামেনি। ওরা দু-সপ্তাহ হোলো ন্যান্স থেকে এখানে এসেছে।

আমাদের উপর হুকুম হোলো ছাব্বিশে তারিখে ভোলগার পারে পৌছতে হবে। পরশু খবর পেয়েছি, স্তালিনগ্রাদ দখল হয়েছে।

মিনায়েভ বললে, কে এ খবর দিলে—গোয়েবল্‌স্ নাকি ? ডাক্তার গোয়েবল্‌স্, চুপ করে আছ কেন ? খবরটা সমর্থন কর।...

কুকুরছানাটা কেঁইমেই করে উঠলো। জার্মান সৈনিক ব্যাপারটা বুঝতে পারল না, কিন্তু রুশ সৈনিকদের হাসতে দেখে সেও হেসে উঠলো।

তোমার উপরওয়ালারা কি বলছে? এখানে যে তোমরা এখনো রয়েছ?

উপরওয়ালারা বলছেন, সব দিকেরই খবর ভাল, কিন্তু এখানে একটা খণ্ডযুদ্ধ বেঁধেছে, কারণ.......

কি ব্যাপার?

হের্ কর্ণেল, আমি সামান্য সৈনিক, শুধু হুকুম তামিল করেই আমি খালাস...

তোমার উপরওয়ালারা কি বললে, তাই জিজ্ঞেস করছি।

তারা বললেন, আমাদের খ্যাপা মানুষদের সঙ্গে এখানে লড়তে হচ্ছে...

ভোরের দিকে জার্মান বোমারু বিমান উড়ে উড়ে এল মাথার উপরে। মনে হয়, এত ঝাঁকে ঝাঁকে এর আগে কখনো আসেনি। হয়তো ভুলই হবে। পাঁচদিন আগে মাগার্জ যখন মারা যায়, তখনো তো মনে হয়েছিল, এমন বিমান আক্রমণ বুঝি আর হয়নি। সবাই চেঁচিয়ে উঠতে চায় আর কি!...জার্মানরা চলে যেতে, লিনা গুঁড়ি মেরে খাত থেকে বেরিয়ে এসে লেফটেনাণ্ট বারানোভের হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে শুরু করে দিলে। হাতের হাড় চুরমার হয়ে গেছে তার। কাল বারানোভকে হাত দিয়ে উর্দির কলার সেলাই করতে দেখে মিনায়েভ বলেছিল, তুমি তো দেখছি ভারি দোরস্ত লোক। হাতখানা জখম হয়েছে, তবু কাজ চালাচ্ছ।...আজকের বিমান আক্রমণে ক'জন মরলো? ইগনাতভ বলেছেন, সৈন্য আসছে, রসদ আসছে...এদিকে ট্যাঙ্ক ছুটে আসছে তাদের দিকে। ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী কামান চালাচ্ছে সাপোভালভ —লক্ষ্য তার স্থির—এমন সময় গোলার একটা টুকরো বিঁধলো এসে তার হাতে, কিন্তু তবু সে থামলো না, তিনটে গুলী করে একটা ট্যাঙ্ককে থামিয়ে দিলো। চাতুস্কিন বিরাট ট্যাঙ্কগুলির দিকে গুলী ছুঁড়তে লাগলো। একটা একেবারে টিলার কাছে এসে পড়লো। চাতুসকিন ছুঁড়লে গুলী। দুটো গোলা এসে টিলার উপর পড়লো। জাগভজদেভ আহত, শেষের গুলীটা লক্ষ্যে গিয়ে পৌছেছে, ট্যাঙ্কের গর্বিত পদক্ষেপ চুরমার হয়ে গেছে। টমি-গানধারী জার্মানসৈন্য তবু ঠেলে এগুতে চায়, তাদের বাধা দিল মেশিন-

গানের ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী। কি ঘটছে বোঝা যাচ্ছে না। যুদ্ধ তো এমনিই হয়। কিন্তু যার যা কর্তব্য সে তাই করে যাচ্ছে। এখানে নেই ভাবোচ্ছ্বাস, নেই সাহসের গর্ব, শুধু দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি আর ক্লান্তি থেকে যে তীব্রতা দেখা দিয়েছে, সারা ব্যাটালিয়ানকে তাই-ই বাঁচিয়ে রেখেছে। যুদ্ধের প্রথম থেকে এমনিই চলে আসছে। প্রচণ্ড শক্তি তাদের পুষ্ট করছে, ক্লান্তির শক্তি, দৃঢ়তার শক্তি। মিনায়েভের মুখখানা কঠিন, কঠোর। দাড়ি তার কামানো হয়নি। বয়েস যেন বিশ বছর তার বেড়ে গেছে। জামার হাত দিয়ে সে মুখ মুছছে। ফোনের রিসিভারে সে চেঁচিয়ে উঠলো, ...আর ষোলোটা ট্যাঙ্ক...মেসারমিট. ওসীপ কিছুই ভাবছেনা—না, রায়া, না স্তালিনগ্রাদের কথা। পরেও সে মনে করতে পারেনি, কি করে সে মেশিনগানটার কাছে গিয়ে শুয়ে পড়লো—জাভিয়ালভের মৃত্যুর পর কি? সার্জেণ্ট কোরোলিয়ভকে সে যে চেঁচিয়ে বলেছিল, কমিউনিষ্ট দল, এগিয়ে চল।—তাও তার মনে নেই......

তারপর নীরবতা। প্রথম মুহূর্তের কাম্য, পীড়াদায়ক নিস্তব্ধতা—এই মুহূর্তেই তো মানুষ, পৃথিবী আর বাতাস তাদের সংজ্ঞা ফিরে পায়। ওসীপ সাপোভালভের কাছে এগিয়ে গেল।

তোমার হাতে কি হোলো?

পাজিটা গুঁড়িয়ে দিয়েছে। আমি ওকে এগিয়ে আসতে দেখে বন্দুকটা তুলে নিলাম......

পরে ওসীপ মিনায়েভকে বললে:

ওকে হাতের কথা জিজ্ঞেস করলাম—হাড় গুঁড়িয়ে গেছে...কিন্তু ও বলে চললো লড়াইয়ের কথা। হাতের দিকে ওর খেয়াল নেই। আবার আমাদের লেখা উচিত, দুজনেই তাতে সই করে দেব—ওরা এখনো সামরিক পদক চেপে রেখেছে কেন? সাপোভালভ তো সবার চেয়ে যোগ্য...

মিনায়েভ হঠাৎ হেসে উঠলো,

তুমি হাতের কথা জিজ্ঞেস করতে ও লড়াইয়ের কথা বললে তো? জার্মান-গুলো কিন্তু যাই-ই বল, বোকা নয়। আমরা হয়তো সত্যিই উন্মাদ। শুধু আমরাই নই—রোমানোভাস্কীর দলও তাই, আর-আর—সবাই বুঝি ক্ষেপে গেছি ...মনে হয়, ওরা স্তালিনগ্রাদ দখল করতে পারবে না।

এমনি যদি চলে, ওদের আবার এক হপ্তার ভিতরে ফির্‌তি পথে উজিয়ে আসতে হবে......

ওদের মনে হোলো, এই বুঝি সমাপ্তি, আর ক'সপ্তাহ বাকি আছে, তার পরেই আসবে চরম মুহূর্ত। কিন্তু যুদ্ধ তো সবে দাউ দাউ করে জলে উঠছে, লক লক করে উঠছে তার শিখা।

পাঁচ

রায়া বার বার পড়লো ওসীপের চিঠি, প্রতিবারই সে এল সেই ছত্রে যেখানে লেখা—তোমার ছবি কিন্তু নিশ্চয়ই পাঠাবে। ভুলো না। কেমন বিব্রত হোলো রায়া, মুখে হাসি ফুটে উঠলো। ওতো আমাকে চিনতেই পারবে না.... আরসীতে সে দেখলে মুখ—সত্যিই কি সে আগের মতোই আছে—না, চেনা যায় না তাকে? না, না, কিয়েভের রায়া তো এ নয়। এ একেবারে আলাদা —রেজভের রায়া···ওসীপকে তাহলে সে খুঁজে পেল! কি আনন্দ! বনে ঘুরে ঘুরে সে বেড়ালো, হাসলো—বন লাল আর সোনালিময়, পাতায় পাতায় ফুলে ফুলে রঙের আগুন। হঠাৎ সে থেমে পড়লো—সব কিছু তার মনে পড়ছে—সে যে স্মৃতিকে নিষিদ্ধ করে রেখেছিল, সেই স্মৃতি। কিয়েভ, পোশাকের আলনার পিছনে মার দীর্ঘশ্বাস। আলিয়ার সবুজ ফ্রক; মেয়ে-পুতুল মাশাকে ধরে আছে এক হাতে, আর এক হাতে খেলনা উটটা—'আমাল উৎ'...তাই বলতো না আলিয়া?...রায়া হাসলো, কিন্তু চোখে তার জল ঝরছে....সারা বছরে এই প্রথম তার চোখে জল। সার্জেণ্ট রাইসা আল-

পেত´, স্নাইপারদের মিছিলে সেও ছিল।....সে ওসীপের সঙ্গে দেখা করতে চায়—এখুনি দেখা করতে চায়। ছুটে গিয়ে ওর বুকে সে মাথা রেখে কাঁদবে —বহুক্ষণ ধরে কাঁদবে.......

আবার ছোট্ট চিঠিটা সে পড়লো। ওসীপ কোথায় আছে তা জানায়নি —আর তা জানানোও নিষিদ্ধ। কিন্তু সে জানে মেজর কালুঝ্নি স্তালিন-গ্রাদে গেছেন। কি লিখিছে ওসীপ?—'এখানকার পরিস্থিতি এমন জটিল, মন কোনো কিছুতেই বসে না—বসা ভারি শক্ত।' চিঠি যখন আসছিল, ও হয়তো এরই মধ্যে হত হয়েছে। ওকে পেল সে, কিন্তু পেয়ে হয়তো হারালো। না রায়া, এ তোমার দুর্বলতা! স্তালিনগ্রাদ মানেই কি অবশ্য-ম্ভাবী মৃত্যু? না, না। ওসীয়াতো কখনো দুর্বল হয়ে পড়বে না। মা বলতেন, ওসীয়া আমার লিওভা নয়। ওসীয়ার মনের জোর আছে -- বেচারী মা। কিন্তু, ওরা তাঁর কি হাল করলো?···ওসীপ লিখেছে, ও সবই বুঝেছে, কিন্তু রাইফেল কাঁধে করে আছি আমি—এ ছবি ওর ধারণার বাইরে। আমিই কি কখনো ভেবেছি? সেদিন 'বিদায় সমরসজ্জা', বইখানা পড়ি সেদিন তো কেঁদেছিলাম। ভালিয়াকে ডেকে বলেছিলাম, মানুষ যখন গুলী ছোঁড়ে তখন তো ক্ষেপে যায়।... ...

যখন রায়া ধ্বংসকারী সেনাদলে যোগ দেবে এই স্বপ্ন দেখছিল, সেখানে কি করতে হবে সেকথা সে একবারও ভাবেনি। সে শুধু ভেবেছিল এই গোলমালেভরা ক্রেশচাত্তিক থেকে জীবনধারা বয়ে যাবে প্রান্তরে, বনে, বয়ে যাবে এক অজ্ঞাত জগতে—একেই না পোলোনস্কী বলত—'রণাঙ্গন—রণ-রঙ্গের মঞ্চ'। হাসপাতালে যখন ভর্তি হোলো, সে কাজে নিজেকে ঢেলে দিলে, নিজে সে খুশিই হয়ে উঠলো ঃ এখানেও আমি কাজ করতে পারি, কাজের লোক আমি।...তখন সে আপন মনে ভেবেছে ঃ শীগ্গিরই আমরা জিতে যাব। ওসীপের সঙ্গে দেখা হবে, সব কিছু বদলে যাবে। ও আমাকে বুঝবে এবার। আলিয়ার দিকে নজর দিতে হবে—আমার এখন একটু বুদ্ধি-সুদ্ধি

হয়েছে। আগামী তার কাছে আসবে উৎসবের সমারোহ নিয়ে। 'যখন যুদ্ধ শেষ হবে', একথা মনে হতেই যেন তার বুকখানা নেচে ওঠে। সে স্বপ্ন দেখে শান্ত নিপারের, বাদাম গাছের সার পথের ধারে ধারে, মৃদু স্বর বাজে কোথাও, আর আছে ঢালাও শান্তি...শান্তি...

কিন্তু এল সেই সর্বনাশা দিন : আমাদের সৈন্যদল কিয়েভ ছেড়ে চলে এসেছে। বিজ্ঞপ্তির হুঁসিয়ারী : রায়া সব কিছুই করে গেল আগের মত। আহতদের ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলে, তাদের সান্ত্বনা দিলে। দক্ষ, স্নেহময়ী সেবাব্রতা রায়া। কেউ তো জানলোনা ওর ঐ হাসি, সান্ত্বনা, আর ঐ দীর্ঘপক্ষ্ম চোখের আড়ালে আছে শুধু মৃত্যুর শীতলতা। রোস্তভের কাছে ওদের ছাউনি পড়লো। ঝোড়ো হাওয়া বরফের শক্ত কুচি ছড়িয়ে দেয় নাকে মুখে। আহতরা এল। এবার রায়া জার্মানদের দেখতে পেল।....ওদের কি আমি সেবা করব নাকি? ...হপ্তাখানেক আগে একটি মেয়ে এসেছিল কিয়েভ থেকে, সে বললে, ওদের বাবীআরের মাঠে খুন করেছে.. ছেলেমেয়েরাও বাদ যায় নি...হয়তো এই সৈন্যটাই আলিয়াকে মেরেছে...

কিয়েভে ছিলে নাকি? শুনছ—কিয়েভ?

জার্মান সৈন্যটি মাথা নাড়লো।

সন্ধ্যের দিকে রায়া গেল লিজকভের কাছে :

কমরেড কমিসার, বদলির দরখাস্ত করব আমি......

লিজকভ কাগজ পড়ছিলেন, একটু বিদ্রূপ করেই বললেন,

তুমুল লড়াই যেখানে চলছে, সেখানেই যাবে নাকি?

না। আমার বাচ্চা মেয়েটা কিয়েভে পড়ে আছে, আর আছেন আমার শাশুড়ী...

কিন্তু এখানেও তো তুমি দায়িত্ব নিয়েই, কাজ করছ।

জানি। কিন্তু আর পারছিনা...আমাকে খুন করতে হবে।

এমন তার স্বর, লিজকভ মুখ তুলে তাকালেন।

গুলী ছুঁড়তেও সে শিখলো, শিক্ষকরা বলত ওর চোখের মালুম ভাল, হাতও মজবুত। কিন্তু গুলী ছুঁড়বে কোথায়? আমি এখানে বসে বসে কি করছি? এর চেয়ে আহতদের সেবাই ছিল ভাল···সে যুবতী, তার চারিদিকে তার পুরুষ। এমন কত ব্যাপার ঘটতে লাগলো, যাতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায় না। কেউ কেউ ওর সঙ্গে নাগরালি করবার চেষ্টা করলে, কিন্তু ও উঠলো খেঁকিয়ে, 'দেখ, ওসব রেখে দাও, আমি অমন মেয়ে নই।'······একজন লেফটেনাণ্ট বললে, বাপ্, ওতো মেয়ে নয়, যেন চকমকি পাথর! কোসিকভ সাইবেরিয়ার মানুষ, চওড়া তার কাঁধ, একগুঁয়েও সে। ও প্রথম রায়াকে দেখে কেমন বিশ্বাস করতে চায়নি, ওর আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে দেখছিল। একেবারে গাংচিলের মতো উড়ন্ত মেয়ে! কিছু হবে না। কিন্তু পরে সে-ই জাঁক করে বললে, 'আমিই তো ওকে শিখিয়েছি বন্দুক ধরতে'······

প্রথম যেদিন একটা জার্মানকে ও হত্যা করলো, সেদিনের কথা ও ভুলতে পারবে না।

উজ্জ্বল বসন্তের দিন। গাছের মাথায় মাথায় সবুজের পসরা নেমেছে লেসের মতো। কোসিকভ জিজ্ঞেস করলে রায়াকে, দেখতে পাচ্ছ?······ রায়া একটা পেরিস্কোপের চোঙ্ দেখতে পেল দূরে। সে অপেক্ষা করতে লাগলো। সমস্ত জীবন যেন চোখে তার সঞ্চিত হয়ে আছে—লক্ষ্যভ্রষ্ট সে হবে না, হলে চলবে না। ত্ব-তিনঘণ্টা পরে একটি জার্মান সৈনিকের মাথা দেখা দিল। হয়তো তার বদলি এসেছে, সে ছুটি পেল। রায়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হোলো না। কোসিকভ বললে, অমনি যেন মাথা গরম না হয়, প্রথম গুলী যে ফস্কে যায়নি সে তোমার বরাত।····· রায়া যেন স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লো, একটা ভারি বোঝা তার বুক থেকে নেমে গেছে।

এক সময়ে শোপাঁ ছিল তার খুবই প্রিয়। 'বসন্তের বারিরাশি' শুনে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে নতুন করে সে চুলের কেয়ারী করেছে, ওসীপ সেদিকে

চেয়ে না দেখলে হয়েছে হতাশ···কিন্তু এখন তো ওরা বলে, চোখের মালুমটা ওর জোর, একেবারে নির্ঘাত ওর বিচার, হাওয়ার জোরের কথাও ও বোঝে—সবার উপরে ও শান্ত···ঠিক মুহূর্তর জন্য ও চুপ করে বসে থাকতে পারে···আঠাশটা তো নিকেশ করেছে···কিন্তু সে এখন বেঁচে আছে তার উনত্রিশটির জন্যে—এবারেও লক্ষ্য অব্যর্থ হবে। এরই জন্য যেন তার জীবন। ছুটি জীবন। হাঁ, আর ছুটি নারী···হয়তো তাদের হৃদয় এক, পুরানো দিনের সে জিনিষ—যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে (যাবে কি?) সার্জেণ্ট রাইসা আলপের্ত আবার রায়া হবে, সে নক্‌টার্ণ (শোপাঁর গৎ) বাজাবে, উপন্যাস পড়ে চোখের জল ফেলবো? ওসীপকে ফিসফিসিয়ে বলবে, প্রিয় আমার, তুমি আর চলে যেও না। কিন্তু তা কি হবে, আর তো তা হয় না।...উনত্রিশ নম্বরকে খুন করা চাই···আলিয়া মৃত, আমিও মরে গেছি। ওসীপ এক আলাদা মেয়েকে লিখেছে, লিখেছে আগের রায়াকে···আমার কথাই বা এত ভাবছি কেন? ওসীপ তো এখন স্তালিনগ্রাদে······

দক্ষিণে আরো দক্ষিণে। স্তেপ আর সুদূরের এক অচেনা শহর। ওরা বলে, সে শহর দীর্ঘ, সাদা সাদা শহরের বাড়িগুলো। এখন তো কালো হয়ে গেছে···সব কিছুরই সিদ্ধান্ত হবে সেখানে। আশ্চর্য ওর এই নাম—স্তালিনগ্রাদ। এতো আকস্মিক নয়···ওদের ওখানে ঢুকতে দেওয়া যে যায় না। ওরা একথা বোঝেনা কেন?

দূরে রায়া নদীর রেখা দেখতে পেল। বিক্ষুব্ধ তার হৃদয়। এই-ই ভোল্‌গা! কত বড় এই নদী। এখানে ওখানে বন, জলা, পার হওয়া দুঃসাধ্য—তারা যেন তোমাকে গ্রাস করবে। এই তো কালই একটা ট্যাঙ্ক পাঁকে ডুবে গেল, তোলা গেলনা কিছুতেই। কিন্তু ওসীপ আছে স্তেপে। একটা গাছের ডাল যদি ভেঙে ফেলে দাও নদীতে, ঐ ডাল ভেসে ভেসে ওর কাছে গিয়ে পৌঁছিবে।···

একমাসের উপর রেজভের উপর ওরা আক্রমণ চালাচ্ছে। বিমান

ঘাঁটি দখল করে নিয়েছে; কিন্তু জার্মানদের ছাউনি এখনো আছে। দুটি বাড়ি তাদের চোখের সুমুখে রয়েছে, একটি একটু বড়। ওরা তাদের নাম দিয়েছে কর্ণেল আর লেফটেনাণ্ট কর্ণেল। ডান দিকে রয়েছে রেজভ। দূর থেকে অটুট আছে বলেই মনে হয়, কিন্তু বেশির ভাগ বাড়িই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, শুধু রয়েছে দেয়ালগুলি। জার্মানরা আছে খাতে। শহরের সুমুখে ছোট একটা বন, একদিকে তার আমাদের সৈন্যরা, অন্যদিকে শত্রু। ছদ্ম আবরণে গা ঢেকে চলেছে টহলদারি সৈন্যরা, মনে হয় যেন ভবিষ্যৎ-পন্থীদের আঁকা ছবি। ক্যাপটেন গোরোকভের সেনাদলে বহু উজবেক আছে। ওদের দেহ মজবুত, রং কালো, ছদ্ম আবরণে ওদের প্রাচ্যের রূপকথার যোদ্ধার মতো দেখায়। কিন্তু এত আর রূপকথা নয়। গভীর অন্ধকার খাতের গহ্বর, ট্রেঞ্চের কাদা প্যাঁচ প্যাঁচ করে পায়ের নীচে; গোলার দাগ-রাজি প্রতি ইঞ্চিতে, রাতদিন জ্বলছে আগুন, চারদিকে ভাঙাচোরা লোহার স্তুপ—বিধ্বস্ত ট্যাঙ্ক, কাঁটাতারের বেড়া আর শিরস্ত্রাণ। জমিতে গোলার টুকরো টুকরা, পোড়া মাথার খুলি আর জমাট রক্ত। এক ফোঁটা জায়গা, তারই মধ্যে দশহাজার মানুষের জীবন-মরণের খেলা চলছে। কখনো কখনো শোনা যায় জার্মানদের কথা আর গান। যখন মাথার উপরে উড়ে আসে বিমান, চোখ কুঁচকে তারা দেখে, আর প্রার্থনা করে, লক্ষ্য যেন না ব্যর্থ হয়··· রাতে বোমা পড়ছে শহরের উপর, বিধ্বস্ত শহরের যতটুকু বাকি ছিল জ্বলে পুড়ে যায়। সৈনিকরা মাখোরকার কথা বলাবলি করে, সিগন্যালের মেয়ে মানিয়া গিয়ে সেঁধিয়েছে ক্যাপটেনের খাতে—সেকথাও বাদ যায় না; আর আছে সেনাবাহিনীর দোকানের কথা। চিঠিপত্র যে যাচ্ছেনা এসম্পর্কে ওরা খবরের কাগজে নালিশ জানাবে—এসবও বলে। তারপরে আবার আক্রমণ। দুটো অঞ্চল দখল হোলো। অঞ্চলের সীমানা আর নেই, ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা এখন শুধু মানচিত্রের ছক মাত্র।—

শুধু ভগ্নস্তুপ, ভাঙা কাচ আর কাদা। আরো একশো গজ হয়তো

এগুতে হবে··ব্যাটারীর একে অন্যের খোঁজ নেয়, মর্টারের খোঁজ পড়ে যায়। তারপর সব চুপ। নীরবতা ভেঙে শুধু আসে মেশিন গানের শব্দ। কাদা লেগে আছে মুখে। হাত চট্চটে, রক্ত লেগে আছে সেখানে। ওরা গুণে দেখে, কজন মরলো, কি কি জিনিষ শত্রুর কাছ থেকে পাওয়া গেল। সামরিক সম্মান পাবার জন্যে যাদের তালিকা তৈরী হয়েছে, সামরিক পরিষদের একজন সভ্য তার উপর চোখ বুলিয়ে যান। আদিম যুগের কেরোসিনের বাতি টিমটিম করে জ্বলে, তারই আলোয় টমি-বন্দুকধারীদের শিকার চলে, ওদের বলা হয় পোকা। তর্ক-বিতর্ক বাঁধে—কখন্ একশো গ্রাম ভোদকা বরাদ্দ চালু হবে তাই নিয়ে। অক্টোবর না নভেম্বরে—কখন? দাড়িওয়ালা সার্জেন্ট-মেজর বলে উঠেন, যাক এতদিন পরে তবু আরামে ঘুমোনো যাবে।··· আধঘণ্টা পরে তাকে পাওয়া যায় মৃত অবস্থায়—একটা গোলা তার কাছে ফেটে যায়, তারই ফল। এক অদ্ভুত একঘেয়েমি—শব্দ, দৃশ্য, কাজ সবই একঘেয়ে।

ওরা আলো ফেলেছে যখন, এখুনি শুরু হয়ে যাবে......

বেজন্মাগুলো, ডুবে ডুবে বোমা ফেলছে।

ওকা, কারনেশন কথা কইছি।

লাইন ছেড়ে দাও বলছি, গোল্লায় যাও......

ব্যাপারটা কি বল!

উনিশ ঘণ্টায়,.......

আমাকে একটু কিছু পান করতে দেবে নার্স?

অসংলগ্ন কথার স্রোত, অসংলগ্ন কাজ..আর তারই আড়ালে মহাযুদ্ধের দ্বিতীয় বর্ষের ভীষণতা,—এমন এক অন্ধ আবেগ, যার প্রকাশ করবার ভাষা ফুরিয়ে গেছে!

দর্শকরা হয়তো অবাক হবে এই ব্যর্থ প্রয়াসে। পুড়ে-যাওয়া বাড়ীগুলো থেকে আসছে গোলা, তাকে রুখতে হচ্ছে। জেনারেল সেদেলনিকভ বারবার

বলছেন ঃ স্তালিনগ্রাদ থেকে জার্মান বাহিনীকে এদিকে ভুলিয়ে নিয়ে আসতে হবে। জেনারেলের মুখখানা ফোলাফোলা, মাথায় ধূসর খাড়াখাড়া চুল, তার আর্দালী রাতে শুধু শুধুই তার জন্যে বিছানা করে রাখে। তিনি মানচিত্র দেখতে-দেখতে তারই উপর বার বার ঝিমিয়ে পড়েন। বৃদ্ধ, নিঃসঙ্গ মানুষটি, স্ত্রী নেই, ছেলেপুলে নেই—সমস্ত জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন সেনাবাহিনীর কাজে। শুধু যে এই একগুঁয়ে জেনারেলই এই সামরিক কৌশলের কথা জানেন, বোঝেন, তা নয়। একথা জানে সুশ্রী মির্জা আলিমভ। সে তার সুন্দরী এস্থারকে কোন এক সুদূর শহরের আনার বাগিচায় ফেলে এসেছে। সবাই জানে একথা! গোলার গর্তে, কাদাভরা ট্রেঞ্চে; অভিশপ্ত, কাঠের পর কাঠ স্তূপীকৃত যে পথের উপর দিয়ে মোটর ট্রাক গুঁড়ি মেরে চলে যেখানে, সেদেলনিকভের ছাউনিতে সবার উপরে যেন একটা কথা ভাসছে, ভাসছে বিস্ফোরণের বজ্রনির্ঘোষে, মুমূর্ষুর আর্ত-চিৎকারে—সে কথা স্তালিনগ্রাদ।

রায়া চেষ্টা করে অতীতকে ভুলতে, কিছুই মনে রাখতে চায় না। সে ভাবে, যদি কিছু মনে পড়ে আমি তো লক্ষ্যভ্রষ্ট হব···তাকে ঐ মেশিন-গানধারীকে পেড়ে ফেলতে হবে মাটিতে—নির্ঘাত ফেলতে হবে—ওতো একটা আপদ-বিশেষ......। আর সে এখন ভাবে না, ও আলিয়াকে খুন করেছে, অথবা ও জার্মান; শুধু সে ভাবে ও একটা আপদ। এখন মহা-যুদ্ধের আত্মা তার ভিতরে সঞ্চালিত, সঞ্চারিত!

রায়া খাতে চলে গেল, একটু চাঙা হয়ে নেবে। শীতে শিটিয়ে গেছে, এখন চাই একটু তাপ। এখনো ভোর হতে চার ঘণ্টা বাকি। শীতে ভরা রাত। নিঃশ্বাস নিতে কষ্টই হয়—মানুষের নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে যেন রুদ্ধ-শ্বাস খাত। স্যাতস্যেঁতে তাদের পোষাক, তারই সোঁদা গন্ধ আসে। লেফটেনাণ্ট মিলেৎস্কী কেরোসিনের বাতিটার কাছে বসে আছেন। তিনি ওকে দেখে বললেন, তোমার উনত্রিশ নম্বরের জন্য তোমাকে অভিনন্দন

জানাচ্ছি। এবারে জুবিলি হ'বে তিরিশ নম্বর দিয়ে। মিলেৎস্কী শূন্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছেন মানচিত্রের দিকে, ওর প্রতি ছোট রেখাও তার চেনা। আগেকার শিল্প-সমবায় ভবনের বাড়িটা ছিল উনপঞ্চাশ নম্বর মহল্লার কোনে, এখন সেখানে কিছু নেই, তবু তিনি জায়গাটা চেনেন মানচিত্রের সূক্ষ্ম রেখায়। তিনি কি চোখ চেয়ে ঘুমুচ্ছেন নাকি! হঠাৎ রায়ার মনে পড়লো ঃ ওসীপ বেঁচে আছে! যদি যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়, বেঁচে থেকে আবার তুজনে দেখা হয়—তাহলে! এ এক নিষ্ফল, নির্বোধ স্বপ্ন—এ বোকামি বইকি।···সে তার ঝোলা থেকে বার করলো চিঠি। চিঠিখানা সে লিখে রেখেছে কাল। সেনাবাহিনীর খবরের কাগজ থেকে নিজের ছবি কেটে নিয়ে চিঠির মধ্যে পুরে দিয়েছে। ফোটোগ্রাফার তাকে ছবি তোলার সময় মাথাটা একটু তুলতে বলেছিল, বলেছিল এক ঝলক হাসতে······জাইৎ-সেভের রক্ত! সেতো ছিল সুশ্রী সুন্দর ছেলে, একর্ডিয়ন যারা বাজাত তাদের দলের নায়ক। রায়া চিঠির খুদে খুদে লেখার দিকে তাকিয়ে রইলো। সত্যিই, কেন ওকে লিখলাম....মা আর আলিয়া পড়ে আছে কিয়েভ-এ—একথা তো জানাবার দরকার নেই। ও তো এখন স্তালিনগ্রাদের কাছে...এমনিই তো ওর বিপদ। সে চিঠি ছিঁড়ে ফেললে। ছবির উপরে লিখলে—প্রিয় আমার, লিখতে তো পারছিনা। তোমাকে আবার খুঁজে পেয়েছি, এতেই আমার কত আনন্দ! আমি শীগ্‌গিরই চিঠি লিখব। এখন শুধু পাঠাচ্ছি আমার ছবি। আমাকে কিন্তু ছবিখানার মতো অবিকল ভেবে বোসো না। ফোটোগ্রাফারটি একটু বেশী উৎসাহী। তোমার কাছে আমি তেমনিই আছি—ঠিক তেমনি—কিয়েভ-এর রায়া।

ছয়

যখন কর্ণেলের আর্দালী তাঁর কাছ থেকে নিমন্ত্রণের খবর নিয়ে এলো, রিকৃটারের মুখচোখে খুশি উপছে পড়লো। ছ'বছর আগে রিকটার কর্ণেলের

জন্য একখানা পল্লী-ভবন তৈরী করে দিয়েছিল, আর বাড়িখানা কর্ণেলের পছন্দসইও হয়েছিল। তিনি সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, এবাড়িখানায় পুরানো দিনের জার্মানীর ঐতিহ্য আর আত্মার সঙ্গে আধুনিক আরামের সমাবেশ হয়েছে। তারপর থেকে গেবলার প্রায়ই স্থপতিকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে পাঠাতেন। সপ্তাহখানেক আগে রিক্‌টার কর্ণেলকে রিট্টার ক্রুজ সামরিক খেতাব লাভের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে একখানা চিঠি লিখেছিল, সে আশাও করেনি উত্তরে গেবলার তাকে নিমন্ত্রণ জানাবেন।

, আজ পাঁচদিন রিক্‌টারদের পল্টন বিশ্রাম করছে। সময়ও বিশ্রামের উপযোগী ; সবারই স্নায়ু ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে যেন......সবাই তো বলছে, দক্ষিণে নাকি অবস্থা বেশ ভাল—রুশরা পালাচ্ছে, জার্মানরা ককেশাস অঞ্চলে ঢুকে পড়েছে ঃ স্তালিনগ্রাদ আর ক'দিনের ভিতরেই সাফ হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে তো এখন নরক গুলজার! এই অভিশপ্ত রেজভকে তো সে কখনো ভুলতে পারবে না।......সে রুশদের কামানের কথা গত বছরেই শুনেছিল—এক-একবারে নাকি বহু গোলা তাতে ছোঁড়া যায়। এ এক আবিষ্কার বটে—একেবারে সাংঘাতিক! তখন সে উড়ো কথার মতো শুনেছিল, এখন তো নিজেই টের পাচ্ছে। পাগল করবার পক্ষে এই তো যথেষ্ট। একটা রুশকে গ্রেফতার করে আনা হয়েছিল। ইভানটা (রুশদের বহু প্রচলিত নাম। এখানে রাশিয়ার যে কোনো মানুষ হিসেবে নামটা ব্যবহার করা হয়েছে) বললে, ওরা নাকি আদর করে কামানগুলির নাম দিয়েছে 'কাটুশা'......যারা এমন ভয়ংকর জিনিষের কোমল মেয়েলি নাম দেয় তাদের বুঝে ওঠা তো অসম্ভব......কিন্তু 'কাটুশা' নিয়েই বা ওরা করছে কি—আর করবেই বা কি! এও ভাগ্য ভালো যে কর্ণেল গেবলার এখানকার সেনাধ্যক্ষ হয়ে এসেছেন। উনি ভুইফোঁড় নন্‌, পুরানো, অভিজ্ঞ লোক। আমি একজন নন-কমব্যাটাণ্ট, আমার মতো লোক কর্ণেলের কাছ থেকে পেয়েছে নিমন্ত্রণ—এ কতবড় সম্মান।....গেজ্‌, যে ঈর্ষা

করবে তাতে আর বিচিত্র কি! যখন আর্দালি এল আরশুলার গালপাট্টা-ওলা মুখের কি অবস্থা হয়েছিল ভাবতো...... !

কর্ণেল গেবলারের আবাস একটা দোতলা কাঠের বাড়িতে। লালঝাণ্ডা-ওয়ালার দল যখন এখানে ছিল, এটা ছিল একটা ইস্কুল বাড়ি। আবার নতুন করে রং ফেরানো হয়েছে। রিক্‌টার হেসে উঠলো ঃ জার্মানরা হচ্ছে প্রতিভাধর—কেমন সাদা রং করে নিয়েছে—একেবারে খাঁটি আর্য-আবহাওয়া, এই বিদেশী দিগন্তের সঙ্গে খাপ খায়—আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে বিডেরমিয়ের-এর কথা—সেই জার্মানীর পুরানো, ভারি পুরানো শহর···।

বাড়ির ভিতরে উজ্জ্বল আলো আর পরিচ্ছন্নতা—ঝকঝকে তকতকে মেঝে, টবে টবে ফুল, কাঠের দেয়ালে দেয়ালে ছবি। অদ্যঁ কোলোঁর আর চুরুটের গন্ধে ম'ম' করছে বাড়িখানা। বুড়ো হয়ে গেছেন কর্ণেল—হাঁ, গত দু'বছরে অনেকখানি বুড়িয়েই গেছেন, তা অবাক হবার তো কিছু নেই—তিন-তিনটে অভিযান তো হয়ে গেল এরই মধ্যে। তা নিশ্চয়ই ষাট বছর তাঁর বয়েস হবে। রিক্‌টার তাকে অধীনস্থ সৈনিকের মতোই সামরিক কেতায় অভিবাদন করলে, কিন্তু গেবলার হাত বাড়িয়ে দিলেন।

বোসো, বোসো, পদমর্যাদার কথা এখন ভুলে যাও। পুরানো পরিচিতের সঙ্গে দেখা হয়ে সত্যিই খুশি হচ্ছি। আজকাল যত লোকের সঙ্গে দেখা হয় সব সামরিক খেতাবওয়ালা মানুষ, কিন্তু নিজের মনের কথা বলবার লোকও তো চাই—চাই সংস্কৃতিবান মানুষ আর শিল্পী। আমার মনে হচ্ছে, রুশদের এই গর্তগুলি তোমার কাছে একঘেয়ে লাগছে, এগুলি দেখলে আর মনে থাকে না যে স্থাপত্য বলে কিছু আছে। শোনো, শোনো, স্মোলেনস্ক-একটা অদ্ভুত গীর্জা দেখেছিলাম।......

হাঁ, দু-একটা স্থাপত্যের নমুনা আছে বটে, তবে পুরানো রুশ স্থাপত্যের দৈর্ঘ্য বলে কিছু নেই, ওগুলো দেখলে এই হাল-ঠেলা জাতের অনুদারতা, সংকীর্ণতার কথাই মনে হয়। পশুপালন যারা করে এর চেয়ে আর বেশি

কি হবে, কিন্তু একদিক থেকে এগুলির খানিকটা সৌন্দর্যও আছে...

গেবলার হাসলেন, তাঁর কঠোর মুখ কোমল হয়ে এল—সেনাধ্যক্ষের পরিবর্তে এক সহৃদয় পিতামহ যেন বসে আছেন।

হের্ রিকটার, সত্যিকথা বলতে গেলে প্রত্নতত্ত্ব জিনিষটাই মনকে টানে। আমার মতো বুড়োরাই শীগ্গির স্তম্ভে দাঁড়িয়ে যায়—যুবারা তাদের জায়গা নেবার জন্য বড় ব্যগ্র......

যৌবনের কথা এসে গেল। ফরাসীদের উচ্ছৃঙ্খল আমোদ-প্রমোদ, পুরানো জার্মান নগরগুলির সৌন্দর্য ..তারপর কথায় কথায় এল কর্ণেলের নাতির কথা। সে দক্ষিণে বিমান-যুদ্ধে নাম কিনেছে, হিল্ডার কথাও এল (গেবলার তাঁর কথা জিজ্ঞেস করতে ভুললেন না); ভাল গানবাজনা ছাড়া মানুষ কি করে বাঁচে, সে তো দিন দিন স্থূল হয়েই পড়বে। কর্ণেল যুদ্ধের কথা তুললেনই না শুধু জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের ওদিকের অবস্থা কি খুব জটিল ?

রিক্টার যখন খোলাখুলি স্বীকার করলে যে, পরিস্থিতি বেশ জটিল, গেবলার চিন্তিত হয়ে বললেন, আমরা একটা মুশকিলেই পড়েছি। কিন্তু ফ্যুরার দক্ষিণের থেকে সৈন্য সরিয়ে আনতে পারছেন না। উপায় নেই। আমাদের আত্মরক্ষার যুদ্ধ করতে হচ্ছে .....সত্যিই ভারি দুঃখ হয়। সেনা-বাহিনীর বাছা বাছা পল্টন এখানে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, শীতের অভিযানের অভিজ্ঞ যোদ্ধারা এখানে মারা পড়ছে......

রিক্টারের খুব জানতে ইচ্ছে হোলো, দক্ষিণে এখন কেমন অবস্থা ; আর যুদ্ধ কি শীতের আগেই শেষ হবে, কিন্তু সাহস হোলো না। গেবলার আবার কথার মোড় ফিরিয়ে দিলেন সঙ্গীতের দিকে।

ভাগনারকে আমার ভাল লাগে না। বোধহয় আমি বড্ড বুড়িয়ে গেছি। আমি এমন সঙ্গীত চাই যা মানুষকে বাস্তবতা ভুলিয়ে দেবে।

স্ববার্ট, স্থমান আমার পছন্দ......তুমি তো একজন শিল্পী। তোমাকে লুকোতে আমি চাইনা—মেণ্ডেলসনকে আমার ভাল লাগে, যদিও রাজনৈতিক কারণে তাঁকে আজ ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে বিস্মৃতির আবর্জনায়। কিন্তু জার্মান-হৃদয়ের কোমলতা একমাত্র তিনিই মূর্ত করে তুলেছেন।

রিকৃটার যে হিল্ডার সঙ্গে মাঝে মাঝে কনসার্টে যেত তার জন্যে এখন সে খুশিই হোলো। এসব ব্যাপারে কিছু না জানলে এখন সে মুশকিলেই পড়তো, ভারি বিশ্রি লাগতো তার নিজের। মেণ্ডেলসন সম্বন্ধে কর্ণেল ঠিকই বলেছেন—নাৎসীরা যোদ্ধা হিসাবে ভালই, কিন্তু ওরা কাঁটা দিয়ে ফুল ছিঁড়ে ফেলছে···এই উপমাটা রিকৃটারের এত ভাল লাগলো যে সে সাহস করে কর্ণেলকে বলেই ফেললে,

আজকালকার তরুণরা কাঁটা ফেলে দিয়ে গিয়ে গোলাপটাকেই ছিঁড়ে ফেলছে। কর্ণেল আবার হাসলেন, বিষণ্ণ হাসি ঃ

কখনো কখনো গোলাপের বদলে ওরা কাঁটাও তুলে নিচ্ছে।

ফিল্ডের ফোন বেজে উঠলো। রিকৃটার লাফিয়ে উঠে ঘর ছেড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু গেবলার তাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন।

কোন বাহিনী? তিনশো সাতচল্লিশ নম্বরে ষাটজন মাত্র আছে। যদি নতুন সৈন্যদল না আসে, সংগঠন নতুন করে না হয়, তাহলে আমার কোনো দায়িত্ব নেই। হাঁ, ঠিক, তুমি বলতে পার আমি এ দায়িত্ব নেব না......

কর্ণেল রিকৃটারকে একটা চুরুট দিলেন। নিজের চুরুটটা ধরিয়ে, কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর রাগে ফেটে পড়লেন ঃ

এটা এখন বোঝবার যথেষ্ট সময় হয়েছে যে, গতবছর আর এবছরে অনেক তফাৎ। রুশরা এখন অনেক অভিজ্ঞ। দক্ষিণের পরিস্থিতি জটিল! আমাদের সেনাবাহিনীর শক্তি সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাসী, কিন্তু যে কোনো লোক যে এ ব্যাপারে নাক ঢোকাবে সেইটেই অসহ্য হয়ে উঠেছে···একটা পল্টনের পরিচালনা সঙ্গীত পরিচালনার মতোই শক্ত। আমি সঙ্গীত

ভালবাসি, কিন্তু হের্ রিক্টার, একথা আমি আপনাকে বলতে পারি যে, পরিচালনা-দণ্ড হাতে তোলবার সাহস আমার কখনোই হবে না। শত্রুর শক্তি সম্বন্ধে সময় থাকতে জানতে হবে, তারপর সেইমতো কাজও করতে হবে। যে পক্ষ তার সৈন্যদের ছড়িয়ে দেবে তাদের হার তো হবেই। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে আমরা জিতব কিন্তু, এই যে এত লোক মরছে, এতো বন্ধ করা যেত।.......

তারুণ্য এক বিরাট শক্তি একথা আমি স্বীকার করি, কিন্তু তরুণদেরও বুড়োদের কাছ থেকে বহু জিনিষ শেখবার আছে.........

রিক্টার মনে মনে ভাবলো: আমি হিটলারী তরুণ বাহিনী থেকে আসিনি। সে সশ্রদ্ধ হাসি হাসলো।

কর্ণেল এবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন। তাঁর মনে পড়লো, রিকটার তাকে সাইবেরিয়া ভ্রমণের কথা বলেছিল।

তুমি এই প্রথম বোধ হয় এখানে আসনি? তুমি কি রুশ ভাষা জান?

গত বছরে কিছু শিখেছি। যুদ্ধের আগে যখন এখানে এসেছিলাম, জার্মান ভাষাই বলতাম।

তার মানে তুমি বুদ্ধিজীবিদের সঙ্গেই মিশতে। তবে এখানে তাদের সংখ্যাও বেশি নয়। তোমার কি মনে হয়—রুশরা আমাদের সত্যিই ঘৃণা করে—না, এ আর কিছু—এ এক কঠোর বাধ্যতা, মূর্খতা আর জনগণের মনরোগ?

আপনাকে এর উত্তর দিতে ইতস্তত করছি। নিজেও আমি মনে মনে এ প্রশ্ন করেছি.........আমার কি মনে হয় জানেন—ওদের মন আমাদের উপর বিরূপ হয়ে আছে, আর তা করা হয়েছে। নেতাদের কথায় ওদের খুব বিশ্বাস কিনা। ওদের কাছে আমরা শুধু বিরুদ্ধ ভাবধারারই প্রতিনিধি নই, আমরা এক অজ্ঞাত, অপরিচিত জগতের মানুষ। এখানকার গরীবদের সঙ্গে কথা বলে দেখছি, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে

বলশেভিকদের অধীনে ওরা দুঃসহ জীবন কাটাচ্ছে, আমি ওদের বলেছি, এখন একটু বেশি জোর-জুলুম চলছে, যুদ্ধ কিনা তাই এমনি হচ্ছে। আমরা জিতলে তোমাদের পোষাক আর বাসন-পত্র পাঠাব। একজন বুড়ো মতো লোক, কমিউনিষ্ট সে নয়, এমনি সাদাসিধে মানুষ—সে সাফ উত্তর দিয়ে বসলে ঃ তোমাদের কিছুই আমরা চাই না।.......সে কি ভাবছে সে কথা সোজা বলতে পারলো না, কিন্তু ওর কথা থেকে বুঝতে পারলাম, ও নিজেদের বর্তমান রাজত্বই চায়। ওরা যেন এই নিয়ে পাগল।

তুমি ঠিকই বলেছ, আমারও তাই মনে হয়। আমি এ সম্বন্ধে অন্য যুগের মানুষের মত জানতে চেয়েছিলাম। তোমরা তো আমাদের থেকে আলাদা যুগ আর ভাবধারার মানুষ। এ সম্বন্ধে কিন্তু আগেই আমাদের চিন্তা করা উচিত ছিল······এখন জার্মানীর একমাত্র আশা—আমাদের সেনাদের নিজেদের সম্মান আর বাহিনীর সামরিক কৌশল। আমার এ বিশ্বাস আছে যে, রুশদের আমরা নুইয়ে দেব, লুটিয়ে দেব তাদের মাথা, কিন্তু পশ্চিমে কিছু শুরু হবার আগেই তা করতে হবে...ওরা এখনো তৈরী হয়নি, ওদের নিজেদের পরিকল্পনা আছে, ওদের ধূর্ততারও সীমা নেই। রাশিয়া যদি হেরে যায় ওদের তাতে আপত্তিও নেই, শুধু একটা শর্ত ওদের আছে, আমরা যদি শক্তিহীন হয়ে পড়ি তাহলেই হোলো। দুই রণাঙ্গনে যুদ্ধ আমরা চালিয়ে যেতে পারবনা। একথা আমি গত হেমন্তেই বলেছিলাম। পুরানো দিনের রোমের কায়দা-কানুন এখন আমাদের মধ্যে চল্‌তি হচ্ছে। এই তো তুমি আসার আগেই বিৎবাক্‌টারে পড়ছিলাম, আমরা নাকি গ্রহদেব মঙ্গলের পূজারী। আচ্ছা এই পুরাণো সাহিত্য থেকে জেনাসকে উদ্ধার করছে না কেন? শান্তির সময়ে রোমানরা তাঁর মন্দির বন্ধ করে দিত, কিন্তু যুদ্ধের সময়ে জেনাস ছাড়া ওদের দেবতা ছিল না।···তার দুই মুখ—এক মুখ পিছনে, আর এক সামনে—পূর্বে আর পশ্চিমে তাকিয়ে আছে। কি আফশোস বলতো, উনিশ শো চল্লিশ সালের গ্রীষ্মে কঁপিয়ের অভিযানের পর আমাদের জেনাসের

পূজো হয়নি, এমন কি এক চল্লিশ সালে হলেও চলতো—কর্ণেল হাসলেন, পর মুহূর্তেই তাঁর মুখ কঠোর হয়ে এল। যাক হের্ রিকটার, আমরা এবার বিয়াল্লিশের হেমন্তে এসে পড়েছি। ফরাসীরা যেমন বলে, যখন পাত্রে মদ ঢালা হয়ে গেছে, আমাদের পান করতে হবে বই কি। আমাদের সৈন্যেরা পশ্চাদ্‌পদ হবে না ....

গেবলার রিক্‌টারকে আবার বললেন তার সঙ্গে দেখা হওয়ায় তিনি খুশি হয়েছেন, এবার কথাবার্তা শেষ হোলো।

যখন রিক্‌টার তার ছাউনিতে ফিরে এল সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়ালো। কারো জিজ্ঞেস করবার সাহস নেই কর্ণেল কি বললেন। রিক্‌টারও কিছু বললে না; কি বলবে ভেবেই পেল না। আরগুলা আর চেপে রাখতে পারলো না ঃ

দক্ষিণে শীগ্‌গিরই সব চুকে বুকে যাবে সে কথা উনি বলেন নি?

হাঁ, শীগ্‌গিরই শেষ হবে।

আমিও তাই ভেবেছি, যখন দক্ষিণে সব শেষ হয়ে যাবে, এখানকার রুশগুলো হুমড়ি খেয়ে লুটিয়ে পড়বে। তবে শীতের আগে শেষ হলে হয়!...

সবাই রিক্‌টারের দিকে তাকিয়ে আছে—সে যেন এক বিখ্যাত ব্যক্তি। মারাবু শুধু রয়েছে দূরে, সে কথাবার্তায় যোগ দিচ্ছে না। সন্ধ্যেয় রিক্‌টার যখন একা ছিল, সে এসে তাকে জিজ্ঞেস করলে, গেবলারকে কেমন দেখলে?

বেশ ভালই। (রিক্‌টার মারাবুকে ভয় করে, যখন তার সঙ্গে কথা বলে প্রতি কথাটা মেপে-জুপে বলে)

অদ্ভুত কিন্তু—গেবলার হচ্ছে পুরাণো সামরিক ভাবধারার মানুষ। ওরা ভাবে, ক্লসউইজ আর মল্ট্‌কের সূত্রই ওদের জিতিয়ে দেবে। কিন্তু তাতো নয়, ফ্যুরারের ঐতিহাসিক নিয়তিই জেতাবে জার্মান জাতিকে। জার্মানীর অর্ধেক মানুষ স্তালিনগ্রাদে ধ্বংস হতে পারে, কিন্তু স্তালিনগ্রাদ হবে আমাদের।

রিকৃটার তার বিরুদ্ধে কথা বলার কোনো চেষ্টাই করলো না। যেমন সব সময়েই করে আজও মারাবু তার ভবিষ্যৎ বাণীর অন্ধকারে তাকে ছেয়ে ফেললে, বিভ্রান্ত করে দিলে। কিন্তু যখন সে ঘুমিয়ে পড়ছিল, সে চাইলো কোনো সুখকর কিছু ভাবতে। কর্ণেল বলেছিলেন, মিত্রশক্তি এক খেলা খেলছে বটে, এতে আমাদেরই সুবিধে...হয়তো ফ্যুরারও ব্যাপারটা আগেই বুঝেছিলেন? যদি তাই-ই হয়, তাহলে তিনি ঐ চতুরদের জাড়ি-জুড়ি ভেঙে দেবেন, বুদ্ধির লড়াইয়ে ওদের দেবেন হারিয়ে। প্রথমে সবাই তো তাঁকে ক্ষ্যাপাই ভেবেছিল। কিন্তু মিউনিকের পর অবিশ্বাসীরাও স্বীকার করেছেন তিনি একজন ওস্তাদ কৌশলী। গেবলার নিশ্চয়ই নাৎসীদের পছন্দ করেন না, পুরাণো দিনের সেনাপতিরা সবাই ঐ এক রকম। ওদের নিচুদরের লোক বলেই গেবলার ভাবেন। কিন্তু ফ্যুরার তো জেনাসের মতোই দেবতা—এক মুখ তার প্রাচ্যের দিকে—আর এক মুখ পাশ্চাত্যে......যাই হোক, কর্ণেলের সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই লাগলো, ...তিনি আমাকে ছুটির ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন। আমি হিল্ডাকে চিঠি লিখব না, হঠাৎ গিয়ে হাজির হব। আমাকে দৃঢ় হতে হবে, কি ব্যাপার চলছে দেখতে হবে।.........কি বললে মারাবু? ঐতিহাসিক নিয়তি............

সাত

ষ্ট্র্যাণ্ড ধরে হেঁটে চলেছে লুই। উষ্ণ, হালকা কুয়াশাভরা দিন। লণ্ডন যেন ম্লান, শীর্ণ রোগী, যেন সবে আরাম হয়েছে। মানুষ ভুলে গেছে বিমান-হানার কথা, ধ্বংস স্তূপ আর তাদের ভীত করতে পারে না—ঐ ধ্বংস স্তূপও যেন ইংলণ্ডের দৃশ্যের সঙ্গে জড়িত—তারই অংশ-বিশেষ। সিগারেট যারা খায়, তারা পাইপসেবীদের ঈর্ষা করছে। পাইপের

তামাক সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু সিগারেট পাওয়া দুষ্কর। খবরের কাগজগুলো সুদূর রাশিয়ার যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত। লণ্ডনবাসীরা মানচিত্রে ছোট ছোট নিশান বসিয়ে লাল ফৌজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে। তারা বলছে, শুধু রুশদের পক্ষেই এ ব্যাপার সম্ভব। সব কিছুই এখানে মিশে আছে—প্রশংসা, ভয়, করুণা,—পাঁচমিশেলি অনুভূতি! স্বেচ্ছাসেবী ফায়ার ব্রিগেডের সম্মানে এক ভোজে এক অধ্যাপক রাশিয়ার সম্মানে পানের প্রস্তাব করতে গিয়ে বলেছেন, স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধ হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞান আর আদিম বিশৃঙ্খলার মিশ্রণ। এ যেন এইচ জি ওয়েলস্-এর উপন্যাসের ব্যাখ্যা করছে টলষ্টয়ের সৃষ্ট চরিত্র প্লাতন কারাতায়েভ...সময়ে সময়ে লণ্ডনবাসীদের মনে পড়ে সেই ভয়ংকর বছরের কথা, যখন ভূগর্ভস্থ আশ্রয়ে খাতে তারা মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বসে থাকত; স্কুলের ছেলেমেয়েরা যখন নেবাত আগুনে বোমা, আর বুড়ো কেরাণীর দল চলতো সামরিক ভঙ্গীতে মার্চ করে, তারাও ছুটতো শত্রুকে বাধা দিতে। আমরা তো শত্রুকে বাধা দিয়েছি, টিকে গেছি, এবার আমাদের পালা নয়—লণ্ডনবাসীরা এখন বলছে একথা......কিন্তু খবরের কাগজে স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধের বিবরণ পড়ে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেছে, ভাবছে : আর আমরা বসে আছি কেন?

সত্যিই ওরা বসে আছে কেন; লুই ও ভাবলো একথা। দুবছর হয়ে গেছে, জেলে নৌকো এসে সেদিন ভিড়েছিল ইংলণ্ডের উপকূলে। প্রথম বছর এমনি অবস্থা ছিল যে লুই ভাববার সময় পায়নি, প্রতি রাতেই বিমান যুদ্ধে তাকে যোগ দিতে হতো; তিনখানা শত্রু-বিমান সে পেড়ে ফেলেছে! ছ'মাস তাকে হাসপাতালে কাটাতে হয়েছে। আহত পা খানা আরাম হতে সময় লাগলো। তখন শুধু লণ্ডন রক্ষা করবার জন্যই সে বেঁচেছে, অন্য কথা সে ভাবেনি। বিধ্বস্ত নগর, সাইরেনের চিৎকারে ধ্বনিত—এই নগরকে দেখে তার মনে হয়েছে নিজের শহরের কথা; নিজের শহরের সঙ্গে প্রভেদ বুঝতে পারেনি। এ তার নিজের শহর—যেমন পারী তার

নিজের। সে যে ফ্রান্স ছেড়ে এসেছে তার জন্যে দুঃখ নেই। সে তো ফ্রান্সকে নিয়ে এসেছে নিজের সঙ্গে—তারই জন্য লড়ছে লণ্ডনের আকাশে।

কতদিন আগের কথা! যুদ্ধ এখন দূরে সরে গেছে। মানুষ আশ্বস্ত হয়ে যুদ্ধের গল্প করতে বসে গেছে। কি লুইর মন থেকে চিন্তা তো যায় না; ঐ বর্বর জার্মানের দল এখনো পারীতে। কিন্তু তাকে এখনো এখানে অপেক্ষা করতে হবে। কিসের অপেক্ষা—ঈশ্বর জানেন!

যখন প্রথম সে এখানে এল, তার মার কবরের দৃশ্য ভাসতো তার চোখের সুমুখে—কবর, গোলাপগুলি বিবর্ণ হয়ে এসেছে। বাস্তহারাদের তাঁবুর আগুনের কুণ্ড, ছেলেমেয়েদের মৃতদেহ, আর স্ত্রীলোকদের জলে ভিজে ভিজে ফুলে ওঠা চোখের মিছিল চলে যেত। এক আঁধার রাতে সে মাদোর কাছে বিদায় নিয়েছিল, মাদো তাকে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরেছিলঃ ভাইকে সে যেতে দেবেনা। কি হোলো মাদোর? কি হোলো ফ্রান্সের?

এক বছর চলে গেলো। লুই এক বাণ্ডিল পারীর পুরাণো সংবাদপত্র পেল; সে পড়লো, পড়ে বুঝতে পারল না। থিয়েটার চলছে পারীতে, পরিচিত অভিনেতাদের নাম, নতুন বইয়ের ঘোষণা, বাড়ি ভাড়া, কার্পেট বিক্রির বিজ্ঞাপন, একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা তার কুকুর হারিয়েছেন ...... হঠাৎ তার নজর পড়লো সমাজের স্তম্ভে এক ঘোষণার উপর,— 'বিবাহের সংবাদ, বিখ্যাত শিল্পবীর, ইঞ্জিনিয়ার ম্যঁসিয়ে জোসেফ বার্তি, বিশেষ সম্মান লিজিয়ন অফ্ অনার বিভূষিত বার্তি মাদমোজেল মাদেলিন লাঁসিয়েকে বিবাহ করেছেন। আজকালকার এই পরিস্থিতিতে, উৎসবে শুধু দম্পতির আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাই এসেছিলেন।' খবরটা এই—লুই খবরের কাগজখানা তালগোল পাকিয়ে ফেললে মুঠোয়। বিরক্তিকর ব্যাপার! বার্তি সম্ভ্রান্ত লোক, কিন্তু জার্মান শাসনের আওতায় বিবাহ-উৎসব—এতো ভাবা যায় না!......সমস্ত ফ্রান্স কি তার বাবার মতোই ভাবছে নাকি?...

না, তা হতে পারে না। সাহসীরা ওখান থেকে আসছে, তারা বলছে, ফরাসীরা অধীনতা মেনে নেয় নি, বর্বর জার্মানরা রাতে নিহত হচ্ছে, ট্রেন-উলটে দেওয়া হচ্ছে। হয় তো এই থিয়েটার, বই আর বিবাহ-উৎসব—এ সবই হচ্ছে আবরণ—আড়াল মাত্র—তাই কি? মাদো তো নীচ কিছু করতে পারে না। যদি সে এই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে বার্তির সঙ্গে তার ভাগ্য জড়িয়ে ফেলে, তাহলে বুঝতে হবে বার্তি দেশ-প্রেমিক, সে আমাদের প্রতিরোধ সংগ্রামেরই একজন, প্রতিদিন সে তার জীবন বিপন্ন করে কাজ করছে। এখানে থেকে কেউ কি কিছু বুঝতে পারে! সেও তো পারছেনা। ইংরেজরা এখনো ফ্রান্সে নামবার যোগাড়-যন্তর করছে না কেন? তাহলে তো বোঝা যেত! ওখানে গিয়ে বর্বর জার্মানগুলোকে তাড়িয়ে দেওয়া চলতো!.........

যুদ্ধের আগে লুইর মতে রাজনীতি ছিল নিতান্ত একঘেয়ে বাজে ব্যাপার। প্রথমে লোকে সভা-সমিতিতে গলাবাজী করে, পৃথিবীতে স্বর্গ এনে দেবে এমনি সব প্রতিশ্রুতি দেয়, প্রতিদ্বন্দ্বীদের গালাগাল দিতেও ছাড়ে না; তারপর প্রতিনিধিরা গিয়ে বুরবোঁ প্রাসাদে জড়ো হন, তার মধ্যে কেউ কেউ মিলেমিশে সরকার গড়েন, কেউ বা সেই সরকারকে খতম করবার চেষ্টায় থাকেন। কমিউনিষ্টরা বলেন, বামপন্থী রিপাব্লিকানরা জুয়াচুরীর মধ্যে আছে, তারা অসাধু; আবার বামপন্থী রিপাব্লিকানরা বলেন যে, কমিউনিষ্টরা হচ্ছে বিদেশীর টাকা-খাওয়া দালাল মাত্র। ভারি বিরক্তিকরই লাগে।...তার বাবার আশা ছিল সে হবে আইনজীবী......কিন্তু লুই বাগ্মিতা ঘৃণা করে এসেছে, বক্‌বকানি তার সয় না। যার জিভে যত ধার, সে ততো পাজি—এই তার মত। বিনয়ে যে গলে পড়ে তার মতো বদমায়েস আর নেই··· সে দেখতে সুশ্রী, লম্বা, তামাটে তার রং, মুখখানা লম্বা ধরণের—একেবারে স্পেনবাসীর মতো তাকে লাগে। মেয়েরা তাকে পছন্দ করে, কিন্তু কখনো হাল্‌কা ছেনালি সে করেনি, আবার সত্যিকারের প্রেমেও

সে পড়েনি। সে বড় হয়ে উঠেছে শিল্প-জিজ্ঞাসা আর লাসিয়ের হালকা ধরণ-ধারণের মধ্যে। তবু কবিতা সে ঘৃণাই করত (কেন ছন্দে কথা বলতে হবে এই ছিল তার প্রশ্ন); সে চেয়েছে বিপদ বরণ করতে, তাই সে হয়েছে বৈমানিক। যুদ্ধে সে অনেক কিছু জেনেছে, বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে। সে দেখেছে সর্বনাশ; দেশের পতন, প্রলয়। তার মধ্য দিয়ে তাকে বাঁচাতে হয়েছে। তাই সে বোঝে জীবনটা খেলা নয়। উনিশ শো চল্লিশ সালের গ্রীষ্মে প্রতিটা কুটীর, প্রতিটা লাইম গাছ দেখে ভালবাসা আর হতাশা এসেছে তার মনে। এই তো ফ্রান্স, তার ফ্রান্স, আর সে তাকে সঁপে দিচ্ছে শত্রুর হাতে—অধীনতা মেনে নিচ্ছে!......যখন তার বাবা পেতাঁর পক্ষ হয়ে বলতে গিছলেন, সে বুঝতে পেরেছিল রাজনীতি সবাইকে বিষাক্ত করে ফেলেছে। নিজের পকেটের জন্য ওরা মাতৃভূমিকে বিকিয়ে দিতে রাজি। বাঁচাতে হবে, নিজের সঞ্চয় বাঁচাতে হবে তো।.... তাকে কে বলেছিল, একজন জেনারেল প্রতিরোধ-সংগ্রামের আহ্বান জানাচ্ছেন। সে এক জেলে নৌকোয় তাই জায়গা করে নিয়ে ভেসে এল লণ্ডনের উপকূলে। লণ্ডনে এসে সে দেখলো দ্যগলকে। লুই অবাক হয়ে গেল, যখন সে শুনলো ইংরেজরা 'স্বাধীন ফ্রান্সের' কথা বন্ধুর মতোই বলছে। কিন্তু বন্ধুভাবের চেয়ে মুরুব্বীয়ানা কম নেই। কেন?........ চিন্তাধারায় সংলগ্নতা সে তখন আনতে পারেনি। এক বিরাট বিমান-যুদ্ধ তখন চলছিল।

তারপর যখন এল বিরতি, সে আবার ভাবতে বসলো। মানুষ আর কিছু বলছে না, তাদের মুখে শুধু রুশদের কথা। গত হেমন্তে সবাই ভেবেছিল রুশরা হারবে, কিন্তু তারপর বলতে লাগলো, রুশরা জার্মানদের চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে। তারপরে সুর পালটে গেল: রুশরা এবার খতম হয়ে যাবে। লুই শুনেছে, এখানে-ওখানে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরেছে, টেনেছে সিগারেট—সিগারেট তখন দেওয়া হচ্ছে সৈন্যদের...হঠাৎ তারও মনে হলো,

এর সঙ্গেও কি রাজনীতির সম্বন্ধ আছে? নির্বাচনী সভা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁচা যায়, কিন্তু এখন তো আর সে অবস্থা নয়।...তুমি এখন বলছ, আমি আমার জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত, কিন্তু তোমার জীবন রাজনীতি বিশারদদের অধীনে, যেমন আগে তাদের অধীনে ছিল কর আর ভাতার ব্যাপার।......কেন, কেন ওরা দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলে দিচ্ছে না? সে বহুবার তার ইংরেজ বন্ধুদের জিজ্ঞেস করেছে। তারা উত্তর দিয়েছে, আমরা এখনো প্রস্তুত নই। আর একটা ডানকার্ক হোক এ আমরা চাই না।..... সে তর্ক করেনি, কিন্তু মনে মনে রেগে গেছেঃ ওরা ফ্রান্সের কি ধার ধারে? ওদের উপরে বিমান হামলা আর হচ্ছেনা, এতেই ওরা সন্তুষ্ট!......তার সন্দেহ দেখা দিয়েছে মনে...মনে হয়েছে, ইংরেজরা হয়তো তাকে ঘৃণার চোখেই দেখে—হেয় বলে মনে করে। তারা লণ্ডন রক্ষায় সফল হয়েছে, আর ফরাসীরা পারীকে সঁপে দিয়েছে···ফ্রান্স এখন আর তাদের কাছে একটা দেশ নয়, রাষ্ট্র নয়—সে এক আসন্ন রণরঙ্গের মঞ্চ। ওরা বলে, যখন আমরা তৈরী হব, ফরাসী উপকূলে নেমে পড়ব...সেই দীর্ঘদেহ জেনারেলের দিকেও কেউ ফিরে তাকায় না, তিনি বিরাট অপরিচিত শহরে বুঝি হারিয়েই গেছেন।

এই তো সেদিন সে মেজর ডেভিসের সঙ্গে আলাপ করেছে। যুদ্ধের আগে ডেভিস বৃটাণীতে একবার ছুটির দিনগুলি কাটিয়েছিলেন। তিনি ফ্রান্সের মানুষদের পছন্দ করেন। লুই তাকে জিজ্ঞেস করলে,

'ওরা দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলছে না কেন?

এখন তাতে বিপদ আছে। এটা খুবই সত্যিকথা যে, জার্মানরা তাদের বহু পল্টন রাশিয়ায় সরিয়ে নিয়েছে, কিন্তু উপকূলভাগ এখনো সুরক্ষিতই আছে; তাছাড়া সেনাবাহিনী এখনো একেবারে ফ্রান্স ছেড়ে যায়নি। ওরা যে কতখানি শক্তি ধরে তা আমরা জানি। এখন যদি আমরা ফ্রান্সে অবতরণ করতে যাই ওরা আমাদের তাড়িয়ে সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ফেলবে।

তার চেয়ে অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। শুধু শুধু হতাহতের সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ কি ?

কিন্তু হিসাবে ভুল হবার কি আপনাদের ভয় নেই ? যখন জার্মানরা ভারসৌ দখল করে, আপনাদের মুখের দিকে আমরা করজোড়ে তাকিয়ে ছিলাম। আপনি তো জানেন তার ফল কি হয়েছে......

ওটা একটা তুলনাই নয়। পোলরা জার্মানদের দুর্বল করে ফেলতে পারেনি, কিন্তু লালফৌজের কথা স্বতন্ত্র। হেমন্তেই জার্মানরা বলতে শুরু করেছিল, বহু মূল্য দিয়ে তাদের জয়লাভ হোলো।

আপনার কি মনে হয় রুশরা ওদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে ?

না, মনে হচ্ছে স্তালিনগ্রাদের নাভিশ্বাস উঠেছে। তার মানে হচ্ছে তেল পাবার রাস্তা তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তবে এতে রাশিয়ার প্রতিরোধ-সংগ্রাম থেমে যাবেনা। কিন্তু বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। হিটলারের আর একবার জয়লাভ হবে, কিন্তু সে তো ক্ষণিকের জন্য। আমরা শেষ আঘাত হানবো......

লুই কি জবাব দেবে বুঝতে পারলনা। ডেভিস বহুদিন থেকেই সেনাদলে আছেন, পদও তার উচ্চ, সামরিক কৌশলও তার জানা, তিনি যা বলছেন তাতে যুক্তিও আছে। কিন্তু তবু .....

সে বললে, হয়তো আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু বৈমানিকদের একটা নিয়ম আছে, যখন একজনকে কেউ আক্রমণ করে, আমরা তার সাহায্যে ছুটে যাই। আমার তো মনে হয় এ নীতি বিমান-যুদ্ধের ব্যাপারেই শুধু খাটে না......

মেজর হাসলেন। তার ইটের মতো লাল, জল ঝড় আর রোদে পোড়া মুখখানায় সরল হাসি ফুটে উঠলো।

তোমার কথা আমি বুঝি, আমি নিজেও রুশদের কথা ভাবলে কেমন অস্বস্তি বোধ করি...কিন্তু কি করবে বল তো ? আমরা মানুষ। তুমি ফ্রান্সকে

ভালবাস, রুশরা রাশিয়া ছাড়া আর কোনো দেশকেই ভালবাসে না। আমার ইংলণ্ডই পছন্দ। রুশদের জীবনধারা থেকে ইংলণ্ডের একটি ছেলের জীবনধারাই আমার কাছে কাম্য। হয়তো কথাটা মানবতাবিরোধীই হোলো, কিন্তু তাতে ক্ষুণ্ণ হবার তো কিছুই নেই। যুদ্ধটাই যে মানবতা-বিরোধী অমানুষিক ব্যাপার। আমি একজন সৈনিক, রাজনীতির বড় ধার ধারিনে। আমার শ্বশুর হচ্ছেন লোকসভার একজন সদস্য। তিনি আমাকে বুঝিয়েছেন যে জার্মান অভিযানে আমাদেরই সুবিধে। যদি বলশেভিকরা হেরে যায়, আমরা রুশদের আমাদের মতো এক রাষ্ট্র তৈরী করতে সাহায্য করব, ঠিক আমাদের এমনটি না হোক, এর কাছাকাছি তো অন্তত যাবে। এমন কি জার্মান শক্তি যখন চুরমার হয়ে যাবে, তখনো যদি বলশেভিকরা দু একটা জায়গা দখল করে বসে থাকে, আমাদের পরিকল্পনায় বাধা দেবার তাদের আর শক্তি থাকবে না। হাঁ, তখন তারা কত দুর্বলই হয়ে পড়বে। অবশ্য, এসব রাজনীতির ব্যাপার, জানিনা আমার শ্বশুর এসব কতটুকু বোঝেন··· আমি এই অসময়ে নামবার বিপক্ষে—হাঁ, সামরিক নীতির দিক থেকেই বিপক্ষে। কিন্তু তাই বলে স্তালিনগ্রাদ যারা রক্ষা করছে তারা প্রচণ্ড কমিউনিষ্ট হলেও আমি তাদের প্রশংসা করব না এমন তো কথা নেই। আমি তাদের প্রশংসাই করি।

কথাবার্তা শুনে গম্ভীর হয়ে উঠলো লুইর মুখখানা। মার কবর, ফ্রান্স, সবই আছে আর আছে এই অভিশপ্ত রাজনীতি······ফ্রান্স থেকে আসছে ভয়ানক সব খবর। লাভাল্ জার্মানদের সেবা করছে পরম বিশ্বস্ততায়। মানুষদের জোর করে পাঠানো হচ্ছে জার্মানীতে। জেনারেল ষ্টুল্পনাগেল প্রতিভূ বন্দীদের গুলি করে মারছে। কিন্তু ইংরেজরা তো ফ্রান্সকে বাঁচাবে না। ডেভিসের শ্বশুর যে বলশেভিকদের ভয় করেন, উনিশ শো ছত্রিশ সালে তার বাবা এমনি ভয় করতেন লেজাঁকে!

লুইর সাথী আন্দ্রে ছুটে ঘরে ঢুকলো, ওকে কোনো সম্বোধন না করেই চেঁচিয়ে উঠলো :

ওরা রাশিয়ায় এক বিমান-পল্টন পাঠাচ্ছে। মিচেল তো ভর্তি হয়ে এল !

লুই বুঝতে পারলো না—কে কাকে পাঠাচ্ছে। আন্দ্রে বিস্তারিত বললে,

আমাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মস্কোর একটা চুক্তি হয়ে গেছে, ভারি চমৎকার না ?

ওখানে এখন সত্যিকার যুদ্ধ হচ্ছে। ওখানে আমরা জার্মানদের সঙ্গে লড়াই করতে পারব। শুনলাম ওরা বাছাই করে লোক নিচ্ছে। আমাকে নেবে না। তুমি তো সেদিক থেকে যোগ্য, তিনখানা উড়োজাহাজ নামিয়েছ .....

লুই বললে, চল যাই, তোমাকেও ওরা নেবে। এখানে তো আমাদের কিছু করবার নেই। ডেভিসের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। এদের বিরতি চলছে—আর পঞ্চম অঙ্ক পর্যন্ত সে বিরতি চলবে—

ওরা যে রক্ষণশীল। ওরা কমিউনিজমকে ভয় করে। গোল্লায় যাক না ওরা !......এখন সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে জার্মানদের সঙ্গে লড়াই।

ওরা ভর্তি হতে গেল। লুই একখানা সান্ধ্য খবরের কাগজ কিনলে, ষ্টকহলমের বিশেষ সংবাদদাতার বিবরণ ওরা বেশ ব্যগ্র হয়েই পড়লো : জার্মান খবরের কাগজগুলি স্তালিনগ্রাদে রুশদের উন্মাদনার কথা লিখিতেছে। এই কাগজগুলির মতে এই নগরের মধ্যে এখন যুদ্ধ চলিতেছে। ভোল্গা পার হইবার সময় জার্মান গোলন্দাজ বাহিনী দ্বারা রুশ সেনাবাহিনী নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে......

লুই বললে,

যুদ্ধের আগে একজন বোলশেভিক আমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসে, যতদূর মনে পড়ছে বোধহয় ইঞ্জিনিয়ারই হবে। রুশরা যুদ্ধ করবে কিনা এই নিয়ে ওখানে তর্ক বেধে যায়। সে বলে, যদি যুদ্ধ করবার দরকার হয় তো তারা এমন যুদ্ধ করবে, যার কথা ভাবতেও শিউরে উঠতে হয়। আর সত্যিই তো তাই হচ্ছে, তাই না ? ওরা এমন লড়াই শুরু

করেছে যাতে শুধু জার্মানরা নয়, ডেভিসের শ্বশুরও ভয় পেয়ে গেছেন ..
কখন রওনা হবে পন্টন, জানো নাকি ? যত তাড়াতাড়ি হয় ততোই ভাল—
সময় মতো লেলিনগ্রাদে পৌছনো যাবে.......

আট

এক সময় যখন সার্জি নিউ ইয়র্কের পুলগুলির ছবির দিকে ঈর্ষাভরে তাকাত আর বলত—অমনি পুল আমি গড়তে চাই !···এখন তার মায়াকোভস্কীর ক'টা ছত্র মনে পড়ছে।

যদি পুরানো পৃথিবী শেষ হয়ে যায়—
বিশৃঙ্খলায় এই গ্রহ মিশে যায় ধূলায়,
শুধু থাকবে তখন এই সেতুটা—কুঁজ জাগিয়ে
ধ্বংসস্তূপের উপর মাথা উঁচিয়ে।

কুঁজ-জাগানো পুল নয়, সমান, কাঠের তৈরী। কিন্তু আর সবকিছুর সঙ্গে মিল আছে ঃ পৃথিবীর শেষ, বিশৃঙ্খলা, ধ্বংসস্তূপ...সব কিছু। এর চেয়ে ব্রুকলীন সেতু তৈরী করা সোজাই ছিল বোধ হয়।···জার্মানরা বোমা ফেলেছে, কামানের গোলা আর ছ'নলা মর্টারে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। রাতে ভোলগা যেন উথলানো কড়াইয়ের মতো হয়ে ওঠে ঃ ওরই পারে জলছে শহর। মানুষ মরছে, এযেন স্বাভাবিক—মানুষ যে বেঁচে আছে অন্যত্র, পরীজ খাচ্ছে গালাগালি দিচ্ছে, ক্ষতের শুশ্রূষা করছে, তামাক খাচ্ছে, চিঠি লিখছে—এই মৃত্যু যেন তেমনি স্বাভাবিক! একে কি বলবে—মৃত্যু যন্ত্রণা, উদাসীনতা, অথবা যুদ্ধের উল্‌টো দিকটা—না, যুদ্ধের দৈনন্দিন ঘটনা —কোনটা বলতে চাও ?

একটা কথা চলে আসছে : মানুষ নাকি অন্যান্য জীবদের থেকে হাসতে পারে বলেই বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু এখানে আনন্দের হাসি তো অদ্ভুত, অস্বাভাবিক, মনে হয়। এখানে বুঝি ভয়ার্ত চিৎকারই শুধু সম্ভব। কিন্তু তবু জোনিন হেসে উঠলো। সংক্রামক সে হাসি। সার্জিই তাকে হাসালে।

জানো, ফরাসীরা বোঝে না, কি করে পরীজ মুখে দেওয়া যায়, খাওয়া যায়, এক-ফরাসী ভদ্রলোক বলেছিলেন, ওতো আমাদের দেশের গোরু-মোষে খায়। পারীতে আমাদের রাষ্ট্রদূত ভবনের এক মেসেঞ্জার একথা শোনে। সে ক্ষুব্ধ হয়ে উত্তর দেয় : আপনারা যে ব্যাঙ খান, আমাদের দেশের গোরু-মোষেও তা খেতে পারে না।....

জোনিন অবিশ্বাসভরে জিজ্ঞেস করলে, সত্যিই কি ওরা ব্যাঙ খায় নাকি ?

হাঁ, আমিও তো খেয়েছি। চমৎকার খেতে। আমার পরীজ ভাল লাগে, কিন্তু ব্যাঙ এনে দিলেও ছুঁড়ে ফেলে দেব না।...

রাশেভস্কী বললে, (সে আবার একটু দার্শনিক হতে ভালবাসে)

যদি দিনের বেলা মরে যাও—তাহলে বলা হবে সোজা গুলী এসে বুকে বিঁধেছে, কিন্তু রাতে যদি মর—তাহলে সে হোল আকস্মিক ব্যাপার।

রাতে জার্মানরা এলোপাথারি গুলী ছোঁড়ে। মানুষরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তারা খায় দায়, স্মৃতির রোমন্থন করে :

মাংস খেতে আমি খুব ভালবাসি, সির্কা দিয়ে মাংস। আর দুশো গ্রাম ভোদ্‌কা।

অত বিনয় করছ কেন বাপু, বল ডজন, ডজন বোতল...

আমার মাংসের জেলি খুব প্রিয়...

মাছের চেয়ে কিছুই ভাল নয়।

আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানে খুব মাছ। কস্ত্রোম্‌কা নদী আর

আছে হ্রদ। বসন্তে এমন বন্যা হয় যে বাড়ি থেকে এক পা হেঁটে বেরোনা যায় না, তবে সবারই নৌকা আছে...

আমরা ভলকভ নদীর উপর দিয়ে নৌকো বেয়ে যেতাম, সঙ্গে থাকত একতারা, গান গাইতাম···নদীর একধারে পাইন বন, সেখানে তরুণ অগ্রগামীদের তাঁবু। একটি মেয়ে আমাদের সঙ্গে প্রায়ই আসত নৌকোয়, সে গাইত সেই যে 'প্রিয় শহর আমার' সেই গান।....

আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানে আছে একটা ছোট্ট নদী—বাটবাখ তার নাম, রুশ ভাষায় যাকে বলে জলা। সত্যিই সেখানে এক বিরাট জলা ছিল, আর মানুষের বসতি ছিল না। এখানে সেখানে বসেছে এক মস্ত যৌথ-খামার। সেখানে টোমাটো, তরমুজ খুব ফলে...

একবার দেখতে পেলেও হোত আমার বাড়ি, একটিবার দেখতে পেলেও কি যে ভাল লাগতো !...

জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছ নাকি ?....

স্বপ্ন ভেঙে গেল, সাইবেরিয়ার কাস্তোদিয়েভ-এর জীবন গেল চুরমার হয়ে। সার্জেণ্ট কাটজেল সাংঘাতিকভাবে আহত। দুজন আর্দালী তাকে তুলে নিয়ে গেল। গলায় তার ঘড়ঘড়ানি শুরু হয়েছে [মনে হচ্ছে মাচা যেন মড়মড় করছে] ; কিন্তু সেতু তবু অটুট রইলো।

জোনিন সার্জিকে জিজ্ঞেস করলে,

যুদ্ধ যখন শেষ হবে, কি করবে তারপর ?

জানিনা, কিছুই ভাবিনি।

আমি জানি। তিনদিন তিনরাত এক নাগাড়ে ঘুমোবে, স্ত্রীকে রাখবো শোবার ঘরের দরজায় পাহারা। যে কেউ এলেই বলবে, 'তিনি ঘুমোচ্ছেন'। যেন আমি একজন জেনারেল এমনি ভাবেই সে বলবে।

সার্জি ভবিষ্যতের কথা ভাবে না, অতীত নিয়ে জাবরও কাটে কম, যখন তার রোমন্থন চলে অতীত তাকে পীড়া দেয়, সে যেন এক অন্ধকার

গহ্বরের দিকে তাকিয়ে আছে—মাথা ঘুরে যায় তার। সে কিছুতেই অতীত জীবনের সঙ্গে যুদ্ধকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। অন্য সবাই মনে মনে ছবি আঁকে। যেন তারা আছে তাদের গৃহকোণে—স্ত্রী আর ছেলেমেয়ের মধ্যে। তারা নিজেদের দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে সজাগ, এতে যেন কোনো আনন্দবিহ্বলতা নেই, এ যেন এক যাত্রীদল চলেছে! জোনিন থিয়েটারপ্রিয়—এখনো নতুন কি নাটক হচ্ছে মস্কৌয় সে খবর সে বেশ মন দিয়েই শোনে। কাল সার্জেণ্ট কাটজেল আহত হয়েছে, কিন্তু তার আগে সে সবাইকে বলে বেরিয়েছে তার সোনিয়া ইস্কুলে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে, আর মনিচ্‌কার সবে বেরিয়েছে দাঁত। সার্জি ভয়ে ভয়ে আপন মনে ভাবে, শিউরিয়ে ওঠে, সত্যি আমার কি হোলো! আমি যেন পাথর বনে গেছি... ভালিয়ার মুখখানা মনে করতে যাই, পারি না। কখনো কখনো মনে হয় ভালিয়া তার পাশেই আছে, তারই সঙ্গে বেড়াচ্ছে, হাসছে, আর সে ছবি অসহ্য হয়েই ওঠে। সে তো এখন অন্য জীবন কাটাচ্ছে। একদিন তার মনে পড়লো মাদোর সঙ্গে এক সন্ধ্যার কথা, সে তো বিশ্বাস করতেই পারে না—সে ছিল অমনি। সার্জি ইঞ্জিনিয়ারদের সর্দার—সে যেন অবিশ্বাস্য ব্যাপার। সে যেন এক কাহিনী, বইয়ে-লেখা কাহিনী, তাকে মনে রাখাও যায় না, ভোলাও যায় না। বিভিন্ন স্তর একসঙ্গে মিলিয়ে সে বাঁচতে পারে না, এক একটি অনুভূতি হয় তার এক-এক সময়ে। বহু অনুভূতির ধারায় সে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে পারে না। নিনা জর্জিয়েভনা তাই বলতেন, মাঝে মাঝে থিয়েটারে যাস না কেন?...তা না ভূতে-পাওয়ার মতো বই নিয়ে বসে থাকিস....তিন সপ্তাহ হয়ে গেল সে ভালিয়াকে চিঠি লেখেনি। সে হয়তো মনে করতে পারে, সার্জি আর তাকে ভালবাসে না, কিন্তু সে 'ভালিয়া' নামটা উচ্চারণ করতেই যেন পারছে না—সে যেন কত সুদূরের ব্যাপার! মাথাটা ফাঁকা ঠেকে, যেটা নিতান্ত দরকারী সেটা ছাড়া কিছুই মনে রাখতে পারে না; কিন্তু তবু যেন সব সময়েই কি ভাবে।

সে ভাবনা পীড়া দেয় অথচ নীহারিকার মতোই সে অস্পষ্ট। হয় তো অতীতেরই সে-কথা, আবার ভবিষ্যতেরও। তাদের বিচ্ছেদের কথা কি? না, তার চেয়ে অনেক বড়—যুদ্ধের সে কথা।...

নদীর পাড়ে পাড়ে ভিড়, গোলমাল। ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধকারী কামান, মর্টার-গোলার বাক্স, রাইফেলের গুলী বারুদ, টিনে ভর্তি খাবার—সব কিছুই সাজানো হচ্ছে। বস্তার পর বস্তা দড়ি দিয়ে টেনে নামাচ্ছে। আহতদের নিয়ে চলেছে ষ্ট্রেচারে করে। নদীতে ষ্টীমারগুলি ধোঁয়া ছাড়ছে। সৈন্যেরা চলেছে মার্চ করে—আর এক নতুন পল্টন এল তাহলে। কারো কারো গায়ে লম্বা কোট, গায়ে ঢলঢল করছে। ওদের দেখে ছেলে-মানুষ বলেই মনে হয়। ওরা লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে, চিৎকার করছে, কেউ কেউ বা সাবধানে পা ফেলছে, পা দিয়ে যেন জমি পরীক্ষা করে দেখছে। নদীর ডান পারে আছে ওরা আর স্তালিনগ্রাদ। এখানে এসে জড়ো হয়েছে উরাল, ভোলগার তীর আর মস্কৌ থেকে মানুষের দল; এখানে আছে কাজাকরা, ভূগোলের এক শিক্ষক, যৌথ খামারের এক কর্তা, বয়ন বিদ্যালয়ের ছাত্র, তুলোর ক্ষেতের চাষী। রাতের অন্ধকারে দাড়িভর্তি এক-একখানা মুখ ভেসে ওঠে। তারপরে আর মুখের দেখা নেই, শুধু পদক্ষেপের শব্দ। কাল ওরা ট্রেঞ্চের ভিতরে হামাগুড়ি মেরে চলবে, উদবেড়ালের মতো মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে, যাবে ভূগর্ভের ঘরের দিকে এগিয়ে, একটা বাড়ির অটুট দেওয়াল ধসিয়ে দেবে, ট্যাঙ্কের দিকে ছুটে যাবে হাত-বোমা নিয়ে, কাঁটা তারে ঘিরে দেবে, মাইন পাতবে, ফ্রিৎসদের দিকে তাগ করবে, অথবা ছায়ার দিকে পিছন ফিরে সুপভর্তি টিন খুলবে হ্যারিকিনের মিটমিটে আলোয় আর মরবে—বার্ধক্য নিয়ে আসবে না সে মৃত্যু —আনবেনা রোগ—সোজাসুজি আঘাতে তারা লুটিয়ে পড়বে দিনের বেলা। আর রাতে মৃত্যু আসবে আকস্মিকতায়। এরা যখন নিশ্চিন্ত ...

এসে থামবে; আবার স্তালিনগ্রাদ। এতো একদিনের ব্যাপার নয়, এক মাসেরও নয়, বছরের পর বছর ধরে চলবে এমনি। যেমন সেই ক'ছত্র কবিতায় ছিল: সেদিন আসবে ঘনিয়ে...হয়তো সেতুটাও থাকবে আঁট ভোলগার উপরে—ধ্বংসস্তূপের উপরে তো নয়। আর সেই সেতু নিয়ে লেখা হবে গান জলবিহারে চলবে তারই নীচে দিয়ে নৌকার সার। এখন তো নদী পথ কালো কালি—ঐ কালি যেন মুছবেনা এমনি ঘন।···গ্রীক-দের ছিল লেদ্—বিস্মৃতির নদী। সেখানে ছিল মাঝি—চ্যারণ। তাকে পাড়ানির কড়ি গুণে দিতে হোত......একটু ঘুমানো কি যাবে না, হাই তুলেতুলে চোয়াল যে ব্যথা হয়ে গেল। আবার ওরা গোলাবাজি শুরু করেছে. আমার এই কামনা—ওরা যেন সেতু না ছুঁতে পারে..

.......আমরা কাঠ কেটে, তক্তা ফেড়ে, পেরেক ঠুকে বানিয়েছি ঐ সেতু··· আজ কত তারিখ? বোধ হয় চৌদ্দই, না, পনেরোই? চল্লিশ দিন এমনি ধারা চলছে। আজ বেতার শুনিনি। এখানে আমরা বাধা দিচ্ছি, পার হওয়া চলছে—এইটাই তো আসল ব্যাপার। সে হাসলো! আসল কেন?······একটা জায়গায় তুমি আছ—তোমার স্মুখে যা ঘটছে সেইটেই আসল ব্যাপার বলে ভাবছ। পারীতে যখন ওরা ছিল, স্তালিনগ্রাদের নামও বোধ হয় শোনে নি······যাই হোক. ওরা যতই চেষ্টা করুক দখল করতে ওরা পারবে না। এখন তো আমরা আলাদা মানুষ—বাধা দেবার জন্য দাঁড়িয়েছি। আমরা কি অভ্যস্ত হয়ে গেছি? না, তা তো বলা যায় না; অনেকেই তো নতুন, সবে এসেছে, এখনো আনাড়ি, ভয় পেয়ে গেছে—তবু তারা বাধা দেবেই। তারা জানে......শুধু তারা নয়, আমি নই, আমরা জনগণ জানি—শত্রুকে বাধা দিতে হবে, তাকে তাড়িয়ে দিতে হবে। এ যেন এক লণ্ডভণ্ড ব্যাপার, মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু এখন সবাই জানে একটা পরিকল্পনা রয়েছে। দশ বছরে নিঃসন্দেহে সব [illegible] পরিষ্কার বোঝা যাবে. সামরিক বিদ্যালয়ে ওরা সৈন্য পরিচালনায়

প্রতিটি চাল দাবার খেলার মতোই বিশ্লেষণ করে দেখবে। হয়তো এখানো সব বোঝা যায়, যদি বেশ করে এক ঘুম ঘুমিয়ে নেওয়া যায়……ওটা কি একটা কথা হোলো, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে—পার হওয়া। এই সেতুটি ধ্বংস হবার আগে ব্রুকলীন সেতু মিলিয়ে যাবে। নিউইয়র্ক আর ফ্রান্সের মধ্যে বিরাট মোটরে চলা জাহাজ যাওয়া আসা করে—একটা জাহাজের ছবিও আমি দেখেছি। নরম্যাণ্ডি না কি জাহাজের নাম, একেবারে সত্যিকার স্কাইস্ক্রেপার। এখনো এ সব জাহাজ চলছে কিনা কে জানে……কিন্তু একখানা এই ষ্টীমার যদি ডুবে যায়, পর পর আরো ক'খানা আসবে। এখন ভোল্‌গা পার হওয়া সমুদ্র পাড়ি দেবার চাইতেও কষ্টকর। কিন্তু তবু আমরা পার হচ্ছি………

কমরেড ক্যাপটেন, দুই আর তিন নম্বর ভয় পেয়েছে………

ষ্টাফ সার্জেণ্ট স্থলিয়াপভ ভয় পেয়েছে, সে ভেবেছিল খুঁটিগুলো বুঝি মজবুত নয়। জলে সে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো।

উঃ কি শীত!

আমাদের তাড়াতাড়ি করতে হবে, শীগ্‌গিরই হবে ভোর। সবাই কাজে হাত লাগিয়েছে: কিন্তু শান্ত ভাবেই কাজ চলছে, মর্টারের গোলা চারদিকে ফাটছে, তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই। সেই পরিচিত অঙ্গভঙ্গি, মাংসপেশীর কুঞ্চন, চীৎকার—আবার, আবার গোলা পড়ছে!

বালিয়াড়ি—ঢালু নদীর পার, একখানা বিধ্বস্ত ষ্টীমার—ভোর হয়েছে। মেজর শেলিইকো জানালেন: ছটা ট্যাঙ্ক আছে। আমরা সোজা গুলী চালাচ্ছি।

বেলা বাড়ছে, যে কাজাকটি বাটবাখের কথা বলেছিল সে হত হয়েছে—একটা গোলার টুকরো এসে পড়ে, তারপরে হাসপাতালে যাবার পথেই মারা যায়। প্রলাপের ঘোরে সে বলেছিল: বড় ঠাণ্ডা!

সন্ধ্যে হতে সাজি গেল মেজর শেইলিকোর কাছে। একটা খাতে তিনি

তার আফিস খুলে বসেছেন, একে সবাই বলে 'গুহা'। বাতাস তামাকের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, কিন্তু দেখা যায় না।

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের ওদিকের খবর কি ?

সব ঠিক আছে, বেতারের খবর শুনেছেন ?

হাঁ, এমন কিছু খবর নেই। এখানে ওরা বালাসকিনের দিকে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিল, দুটো বাড়িও দখল করে, কিন্তু আলিওয়োশা বললে একটা বাড়ি আমরা আবার দখল করে নিয়েছি। শুনছ, 'কাটুশারা' কেমন গোলবাজি করছে। বাইলভ আজ দুটো ফ্রিৎসকে পেড়ে ফেলেছে। আমি ওকে জ্যান্ত একটাকে ধরে আনতে বলেছিলাম, কিন্তু ও পারে নি ; ও এনেছে এক বোতল রম্ আর একটা সিগার-লাইটার। বোসো, বোসো। রম একেবারে যাচ্ছেতাই, তবু মুখে দেওয়া যায়। ওষুধের উপকার দেয়— আমার সর্দি লেগেছে। গ্রামোফোনটা চালানো যাক কি বল—যাকগে এখন ওসব কথা! রেকর্ড আবার ফাটা, শব্দ করছে—শুনতে পাচ্ছ ?... .....

মেজর লেশচেঙ্কো শুনছেন, এই বোধ হয় একশো বার হোলো, মাথা তার একপাশে হেলে পড়েছে, আর একশো বারের বারই তিনি জিজ্ঞেস করলেন !

ও এত দুঃখ দেয় কেন, এমন বেদনা কেন ওর স্বরে।
সার্জি উত্তর দিলে,
পাড়ি দেবার সময় থাকতে পেলে না বলেই বুঝি......

উত্তাপ, রাম্, শিলিইকোর বক্‌বকানিতে ওর ঘুম পাচ্ছে।

জার্মানরা পার হতে দেবে না, তারা গুঁড়িয়ে দিতে চায় সেতু। মনে হয় যেন রুঢ়, বিসেক, ল্যাপল্যাণ্ড আর লোরেইনের যত লোহা উত্তপ্ত করে গলিয়ে এই ফালি জায়গাটুকুর উপর ওরা ঢালছে, ঢালছে খাতে, ট্রেঞ্চে, এই সাধারণ মানুষদের উপর, যাদের আছে ছিনা, ফুসফুস, চোখের কোমল মণি, ভঙ্গুর ইন্দ্রিয়গুলি।

সার্জি বুঝতে পেরেছে, এখানে আসা তার কর্তব্য—আর সেই কর্তব্যের আহ্বানেই সে ছুটে এসেছে। ভয় তাই তার নেই। একবার বাঁ পাড়ের গোলন্দাজদের কাছেও সে গেছে। সে যেন এক স্বর্গ। স্তালিনগ্রাদের উপরে রয়েছে তারা—এ যেন মস্কোরই শামিল। চা পান চলছে, কাচের গেলাস, হাতল ধাতুর, কেউ বা ঘুমিয়ে আছে পোষাক পরেই। হঠাৎ এল ডুবুরী বোমারু মাথার উপরে। সার্জি ভয় পেল। কেন সে এল এখানে?··· কিন্তু পাড় হবার জায়গায় তার কর্তব্য সে করে—সেখানে তাই ভয় দেখা দেয় না.........

স্থাপারদলের চারটি লোক নেই। একটা গোলার টুক্রো সার্জির বাহুতে এসে লাগলো। সার্জন লেভিন তাকে বাঁ পাড়ে পাঠাতে চাইলেন। সার্জি নারাজ, এখন তো সে সময় নয়।

এখন যদি সাবধান না হও, ঘা ঠিক ভাবে আরাম হবে না।.........

তাতে আর কি হবে, আবার না হয় ওষুধ লাগানো যাবে। তবে আমার উপর তম্বি করবেন না। আমি জানি এ আপনার কর্তব্য। আমি মস্কোর এক সার্জেনকে জানি। খুবই কোমল তাঁর মন, কিন্তু তিনি এমনি চেঁচান যে জানালার শার্সি পর্যন্ত ঝন্‌ঝন করে ওঠে। আমাদের পল্টনেও নিকিতিন বলে এক সার্জেন ছিলেন, তিনিও খুব চেঁচাতেন······

লেভিন অবাক হলেন ঃ

আমি তো চেঁচাই না। আমি একজন সার্জেন, আমার কাজই হচ্ছে অস্ত্রোপচার করা। রোগীরা চেঁচায় কিন্তু আমি তা করতে যাব কেন। নিউরোপ্যাথোলেজিষ্টরাই চেঁচানোয় দড়ো। তিনি একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, আমার ছেলেটি পরশু মারা গেছে। সে মর্টার বাহিনীতে ছিল। উনিশ তার বয়েস, কবিতা লিখত। তার কবিতার দু'এক ছত্র মনে আছে ঃ তুমি তো গভীর, দুঃখের মতোই : সাগর তুমি নও, কিন্তু তুমি তো নদী...বাজে অর্থহীন, তবুতো মনকে দুলিয়ে দিয়ে যায়···

সার্জি বললে, না বাজে নয়, আমি বুঝতে পারি ওর মনের কথা... চলি...খেয়ায় ওরা বোধহয় খুব গোলাগুলী ছুঁড়ছে...

হাতে আঘাত লেগেছে, কিন্তু মুখে বিকৃতি নেই। জ্রোনিন্‌ বললে, তোমার একখানা চিঠি আছে। সার্জি তাকাল—ভালিয়া লিখেছে। তার আনন্দ হোলো, আবার কেন যেন এল ভয়। না, আমি এখন পড়তে পারব না, পরে পড়ব...

মাঝে মাঝে কালো নদী আগুনের আভায় ঝলে উঠছে, হাউই উঠছে আকাশে, তারই ফুলঝুরিতে ইটের মতো লাল দেখায় নদী. আবার আলো ক্ষীণ হয়ে আসে, রং ফেরে, বেগুনী হয়ে দেখা দেয়—আবার কালোয় কালো।

দুটো বিম বদলাতে হবে।

মামুলি, দৈনন্দিন কাজ শুরু হয়ে গেল

নয়

বার্তি মাদোর হাতের লেখা দেখেই চিনতে পারলে। সে তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে ফেললে খাম।

মাদো লিখেছে ঃ তোমার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই। সেদিনের পর থেকে আমি বহু ভেবেছি। আর কারো সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে আমার নেই। শুক্রবার সন্ধ্যে সাতটায় লাবেল হোতেসে থেকো, গত গ্রীষ্মে ওখানেই তো আমরা গিছলাম। বাবাকে কোনো কথা জানিয়ো না— মা। বার্তি হাসলো. প্রেমিক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেছে, তাই এবার বেচারা স্বামীকে মনে পড়লো। কিন্তু এখনো সরলভাবে কোন কথা বলবে না, ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে লিখেছে, 'বহু ভেবেছি'! যেমন বাপ, তেমনি বেটি! ...তেমনি রোমান্সের অদম্য তৃষ্ণা—রাতের অন্ধকারে দেখা...চিঠিখানা সে

মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিলে, আবার কি ভেবে তুলে নিলে। আমি যদি যাই তো, বোকা ছাড়া কিছু নই……

মাদো সেই যে সেদিন বলে গেল, 'আমি যাচ্ছি, আমার আর অন্য উপায় নেই,' সেদিন থেকে তাকে সে দেখেনি। সে কাউকে বলেনি যে, তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছে। সে বলেছে, ও আছে দক্ষিণ অঞ্চলে। শুধু লাঁসিয়ের সুমুখেই সে ফেটে পড়েছিল, পথের বেশ্যার মতো ওর ব্যবহার।…লাঁসিয়েও জলে উঠেছিলেন ঃ মাদোর সম্বন্ধে একথা বলবার তোমার সাহস হোলো কি করে? বেচারী মর্কোলিনের স্মৃতিকে তোমার অপমান করবার অধিকার কি? তুমি ভাবছ, যা-খুশি করতে পার—তাই না? মস্তিয়ে বাতি, আমি ফরাসী দেশের মানুষ; নগণ্য, অসন্তুষ্ট মানুষ—আর তুমি—তুমি—শার্কের ডান হাত।…

আগের দিন লাঁসিয়ে বাতিকে অনুরোধ করেছিলেন, জার্মানদের সে যেন বলে কয়ে রোস আইনের জন্য কিছু কয়লা পাঠিয়ে দেয়। বাতি কাঁধে ঝাঁকুনি দিলে ঃ লাঁসিয়ে তার মেয়েকে অতিরিক্ত ভালবাসেন; তাছাড়া তিনি মূর্খ—অমন লোকের সঙ্গে তর্ক করতে যাওয়া বৃথা।

কোথায় ছিল এতদিন মাদো? একবছর তো হয়ে এল…হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত মেয়ে—যে কোনো লোক ওকে ফুসলে নিয়ে যেতে পারে। বাতি মনে মনে বললে, আমি এতেও অবাক হব না, যদি, ও একটা গেস্টাপোর লোকের সঙ্গে বসবাস করে, সে লোকটার একটা ঘোড়ার চাবুক আর শোবার পরে এক খণ্ড নিটশে থাকাও অসম্ভব নয়। অথবা দ্যগ্যলের ভক্ত কোনো সন্ত্রাসবাদীর প্রেমেও সে পড়তে পারে—হয়তো খুব ষড়যন্ত্রের খেলা খেলছে, পাচ্ছে ইংলণ্ডের টাকা আর কোকেন। হয়তো বা এর চেয়েও সোজা পথ সে ধরেছে। কোনো ঘোড়ার জকি, কি দালাল বা জুয়াড়ীর সঙ্গে সে আছে……

নিশ্চয়ই আবার মিলনান্ত একটা অভিনয় সে করতে চায়, তার উদ্ভট কল্পনায় আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলতে চায়—স্ত্রী, অথচ স্ত্রী সে নয়। কিন্তু

এবার আর সে ফন্দি খাটবে না। হয় এস্পার—নয়তো ওস্পার...আমি সব কিছু ভুলতে রাজি নাকি? না, ও বিরক্তিকর ব্যাপারের ভিতরে যাব না! এযেন এক রোগ—তোমার ভিতরটা কুরে খাচ্ছে। এক ক্লেদাক্ত অনুভূতি—মনে হয় নিজের সমস্ত আত্মসম্মান তুমি হারাচ্ছ।

পরিচ্ছন্নতা বার্তির একটা খ্যাপামিও বলা যায়, সে দিনে দশবার হাত ধোয়। যেখানেই থাকুক না, ভোরে আর রাতে স্নান করে, দুবার দিনে দাড়ি কামায়। সে আরসীর দিকে এগিয়ে গেল, মনে হলো যেন ভাল করে দাড়ি কামানো হয়নি। বয়েস বেড়েছে, কপালে সাদা চুল, চোখের কোল থলের মতো ফোলা...মোরিলো ঠিকই বলেছে—আমার বিশ্রাম দরকার, কিন্তু একদিন যদি কাজ করা থামিয়ে দিই আমি যে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাব, চুরমার হয়ে যাব ......

এর কিছুদিন আগে মোরিলো বার্তিকে বলেছিলেন, আমার তো মনে হয় হিটলারের আগেই তুমি খতম হয়ে যাবে। একথা সত্যি যে ওর বিপদ উপস্থিত, কিন্তু ওতো গলাবাজি করে বলেছে—এ অতি তুচ্ছ ব্যাপার—গোটাকয়েক রুশ স্তালিনগ্রাদে কামড়ে পড়ে আছে। বেশ তো, দেখা যাক না। কিন্তু বার্তি তোমার যা রোগ, আমি ঠিক ঠিক বলে দিচ্ছি; তোমার রক্তের চাপ তেইশ মাত্রায় উঠেছে......

বার্তি তবু মোরিলোকে রোগের কারণ বলেনি। মোরিলো বাক্যবাগীশ যখন যেমন তখন তেমন বলে। ঠিক আবহাওয়ার মোরগের মত। হয়তো দ্যগলের সঙ্গে ওর যোগাযোগ আছে। শুধু তাহলে মাদোই নয়? তাহলে অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে তাকে লড়তে হবে। গত বসন্তে সে না নিরপেক্ষ থাকতে চেয়েছিল—এখন তো তা সেটা হাসিরই ব্যাপার, চাইলেই যেন এমনি ধারা যুদ্ধে—যে নিরপেক্ষ থাকা যায়! জার্মানদের কাছে সে কিন্তু ভিক্ষে চাইতে যায়নি। তার ভাবনা ফ্রান্সের জন্য। সে তো এ যুদ্ধ বাধায়নি—যুদ্ধ বাধিয়েছে কমিউনিষ্টরা।

কেন সে তো জার্মানীর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলে দেবারই চেষ্টা করেছিল ? কিন্তু তাতে তো নিজেকে হাস্যাস্পদই করেছে। তার কারখানার শৃঙ্খলা চমৎকার ঃ তার শ্রমিকরা ভয় পেয়েছিল তাদের জার্মানীতে পাঠাবে বলে ; এখন তারা ধোঁয়া খেতে একবারও প্রস্রাব খানায় যায় না, জটলা করে কথাবার্তাও কয় না। কিন্তু জার্মানরা ঠিকই বলছে ঃ উৎপাদন কমে যাচ্ছে। মার্চেই ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল—একদিন ক্লাচের ভিতরে দেখা গেল একটা পেরেক, আর একদিন বৈদ্যুতিক শক্তি কমে গেল? একটা নাট হারিয়ে গেল, দেখা গেল তেল-খাওয়াবার যন্ত্রটায় বালি ভর্তি। কম-প্রেসরটাকেও কে একদিন ভেঙে দিয়ে গেল। বার্তি দোষীকে ধরে দেবার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করেছিল, দরমো এসে জানাল একাজ করেছে ওলিভিয়ে। বার্তি জানালো পুলিশকে, অলিভিয়েকে মেরে আধমরা করে দেওয়া হোলো। কিন্তু কয়েক দিন পরে জার্মান সদর দপ্তর থেকে খবর এল ঃ অলিভিয়ে নির্দোষী—সে সৎ লোক, সে পি, পি, এফ-এর লোক, দোরিয়ো তার জামিন হলেন। বার্তি দরমোয়কে ডেকে পাঠলে, কিন্তু সে তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

গত জুলাই মাসে শার্কে বলেছিল, কর্তারা আপনার কারখানার যন্ত্র-পাতি সরাবার কথা ভাবছেন। আর উপায়ও নেই। হয় আপনার কারখানার মজুররা কুড়ে, নয় তো আমাদের বিরুদ্ধে মন তাদের বিষাক্ত। কিন্তু আপনার যন্ত্রপাতি ভাল, সবাই জানে আপনি নিজে একজন উদ্ভাবক।

আগষ্টের দোসরা বার্তির পক্ষে এক অশুভ দিন হয়েই এল—কালোয় কালো দিন। কি করে যে এই ধ্বংসকারী দস্যুরা ট্রান্সফরমারটার নাগাল পেলে বহু মাথা ঘামিয়েও সে তো বুঝতে পারে নি। বেরী নাকি ? বেরী আঠারো বছর ধরে এই কারখানায় চাকরী করে আসছে, বার্তির সে অনুরক্ত ভক্ত, কমিউনিষ্টদেরও সে ঘৃণা করে। জার্মানরা এদিকে হুমকীর পর হুমকী দিচ্ছে, কে উড়িয়ে দিল ট্রান্সফরমার, বল বল! বার্তি কি করবে,

সে গিলবের্তকে দেখিয়ে দিল। অবশ্য এটা খুবই সত্য, গিলবের্ত যে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট তার কোনো প্রমাণই তার কাছে নেই, তবু অপরাধী তো একজন চাই। তা ছাড়া একটু যে কারণ নাই তাতো নয়। ১৯৩৬ সালে গিলবের্ত কিছু কিছু মজুরকে খেপিয়ে একবার ক' দফা দাবী এনেছিল··· এমন লোকের পরিবর্তন কখনো হয় না। জার্মানরা জানালো, গিলবের্ত সবই অস্বীকার করেছে। প্রতি ক্ষেত্রেই যা হয় তারই পুনারাবৃত্তি মাত্র। তারা তাকে মারলো গুলী করে। তারপরেই কে একজন প্রধান ইঞ্জিনিয়ার লামপিয়েরকে গুলী করলো। খুনটা কারখানার ভিতরে হয়নি, তবু বাতি গেষ্টাপোদের ডেকে পাঠাল তদন্ত ব্যাপারে। সে বললে, আমি তো পারলাম না, বরাতে থাকে তোমরা পেয়েও যেতে পার দোষীকে......সে বুঝলো, সে ওদের মেনে নিচ্ছে, কিন্তু উপায় তো নেই—আর একমাস মাত্র দেখবে তারপরই জার্মানরা যন্ত্রপাতি সরাতে শুরু করবে। গেষ্টাপোরা যেতেই এল জার্মান ইঞ্জিনিয়াররা; তারা এসে বাতির আফিস-কামরার পাশের ঘরটা দখল করে বসলো।

প্রায় দু সপ্তাহ আগে সার্কে এসে বলেছিল পূর্ব-রণাঙ্গনে জার্মান-বিজয়ের কথা।

গ্রজনি আর বাকু আমরা দখল করে নিয়েছি।

স্তালিনগ্রাদের খবর কি ?

শেষ প্রতিরোধের ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করছি। কত কিছু যে পাওয়া গেছে—শার্কের স্বরে চাপা উদ্বিগ্নতার স্বর। বাতির তাই-ই মনে হোলো।

এই জয়লাভে কিন্তু আপনার স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতিই হয়নি। শীতে যখন পশ্চাদাপসরণ চলছিল তখন আপনার মুখে খানিকটা প্রফুল্লতাই দেখেছিলাম।......

শর্কে এবার কারখানায় বেশি পরিমাণে উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বলতে লাগলেন।

স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে সবকিছুই বহু পরিমাণে ব্যয় হয়েছে। আমাদের মোটর চাই… দেখুন, আমার যতদূর সাধ্য আপনাকে বাঁচাতে চেষ্টা করছি, কিন্তু কর্তারা ওসব ব্যক্তিগত প্রশংসায় কানই দেন না……

কয়েকবার বার্তি কমিউনিষ্ট পার্টির ইশ্‌তাহার পেয়েছে নিজের টেবিলে। তার অফিস-কামরায় যারা অনবরত যাওয়া-আসা ক'রে তারা হচ্ছে যুভনে, ওর বুড়ো দরোয়ান দেলমাজ। তাদের সন্দেহ করা যায় না উচিতও নয়। য়ুভনে পাকা সেক্রেটারী, কিন্তু একেবারে বোকা—তার দুটি জিনিসে মন পড়ে আছে—একটি ভাবাবেগময় ছায়াছবি আর একটি নানা ছন্দে চুলের কেয়ারী করা। দেলমাজ ধর্মভীরু—প্রতি রোববার সে যায় গীর্জায়।

আবার ইশ্‌তেহার সে পেল টেবিলে। প্রতিরোধ গ্রামীদের দ্বারা স্থাপিত গণ-আদালতে দণ্ডিত অপরাধীদের প্রথম তালিকা। বার্তি হাসলো; শুধু ধাপ্পা।…দেখি। কার কার নাম আছে…অবশ্য লাভাল, দিয়েৎ দোরো্যা, দার্লিং তো থাকবেই—থাকা স্বাভাবিকও। তারপরে ছোটরা —অভিনেতা সাষাগ্যেত্রি, লেখক; দ্রিউ-লা রচেলে: আবেল বোনের্দ, মন্ত্রী; লেখক চেলিন, কারখানার মালিক জোসেফ বার্তি।…আর পড়বার দরকার নেই বার্তির, সে তালিকাটা তালগোল পাকিয়ে বাজে-কাগজের টুকরীতে ফেলে দিলে। সন্ধ্যেয় আবার মনে পড়লো তালিকার কথা, সে ভাবতে বসলো। ভয় বা ক্রোধ তার এলো না, ইশতেহারের দাবী রয়েছে তার উপর। সে আপন মনে বললে, এবার আমি ওদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতে পারি। বিশ্বাসঘাতকের দল—ওরা নিজেদের বিক্রি করে দিয়েছে—কেউ বা রুশদের কাছে, কেউবা ইংরেজদের কাছে। ফ্রান্সের কি হোলো তার জন্যে ওদের ভাবতে বয়ে গেছে। কিন্তু আমি ফ্রান্সের জন্য লড়ছি, আমি জোসেফ বার্তি কারখানার মালিক! আমি তবু ওদের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম, ওদের উপর আমি জোর

জুলুম করতে চাইনি। ওদের প্রতি করুণাই করেছি। আর ওরা তার পুরস্কার দিলে এই ভাবে.......

উনিশ শো ছত্রিশ সালে যারা 'ধর্মঘটী সমিতি' করেছিল সে ঠিক করলো তাদের নামের তালিকাটা সে জার্মানদের কাছে পাঠিয়ে দেবে। বত্রিশটা নাম ; তার মধ্যে চৌদ্দজন এখনো কারখানায় কাজ করছে। সে য়ুভনেকে ডেকে নামগুলো টুকে নিতে বললে। একবার য়ুভনের দিকে চোখ পড়লো—কি চমৎকার কেয়ারী চুলে। কিন্তু এই বিলাসী মেয়েটার অফিস-কামরায় একমাত্র সহজ গতিবিধি আছে—আর আছে বুড়ো দরোয়ানটার...হয়তো এরা দুজনেই কমিউনিষ্টরা এই সব বোকাদের দিয়ে অনেক সময় কাজ করায়, এরা হয় তাদের হাতের হাতিয়ার। সে য়ুভনেকে চলে যেতে বললে, তারপর নিজেই চৌদ্দজন সন্দেহ ভাজনের নাম লিখলে ঃ একজন তার ভিতরে ইঞ্জিনিয়ার, চারজন ফোর-ম্যান আর সবাই সাধারণ মজুর। হাতের লেখা খুদে, কিন্তু খুবই স্পষ্ট, ঠিক যেন ছাপার অক্ষর। কলম রেখে দিয়ে আবার কি ভাবলো। কে অফিসে···কামরায় ঢুকলো ? যাকগে, জার্মানরাই জেরা করবে....আবার কি ভেবে সে কলমটা তুলে নিয়ে তালিকায় লিখলে, ১৫নং—য়ুভনে—টাইপিষ্ট, ১৬নং জাঁ দেলমাজ—দরোয়ান। কিছুদিন থেকে বার্তি অনিদ্রায় রোগে ভুগছে। আজ প্রথম ঘুমের ওষুধ না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লো। ভার নেমে গেল বুক থেকে, স্বস্তি পেল, ভাবলে, আমার যা করবার সবই করেছি। আমাকে এখন আর কেউ দুষতে পারবে না· ···

বার্তি তদন্তের কোন খোঁজই নিলে না। সে শুধু দেখতে পেলে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ থেমে গেছে, আর ইশতেহারও পাওয়া যায় না। পরে এক জার্মান ইঞ্জিনিয়ার বললে, ওরা কেউ কিছু স্বীকার করেনি। ওদের নিকেশ করে দেওয়া হয়েছে। শুনলাম, আপনার সেক্রেটারী নাকি

খুব একটা কাণ্ড বাঁধিয়েছিল, সে মেজরকেই কামড়ে দিয়েছিল। বুড়ো দরোয়ানটা জেরার সময়ই মারা যায়.......

বার্তি পুরোপুরি আশ্বস্ত হয়েই ছিল, কিন্তু মাদোর চিঠি সবকিছু আবার ওলট-পালট করে দিয়ে গেল। পুরানো ক্ষতস্থান দিয়ে আবার রক্ত ঝরতে লাগলো। অন্তরালের আততায়ীদের বিরুদ্ধে সে লড়াই চালিয়ে এসেছে, কিন্তু এই পাগল মেয়েটার কাছে সে এমন দুর্বল হয়ে যায় কেন? এ এক নির্বোধ অন্ধ কামনা, প্রৌঢ়ের খামখেয়ালী। যদি সে চাইত, যে কোনো সুন্দরীকে সে বিছানায় পেতে পারত। কিন্তু মাদোকে সে চাইল কেন?

শুক্রবার সকালে বার্তি ঠিক করলো সে যাবে না। যদি যাই, সমস্ত আত্মসম্মান আমার নষ্ট হয়ে যাবে। শান্তভাবে সে ছোট-হাজরী খেয়ে নিলে, তারপরে নতুন মডেলের একটা গাড়ি সম্বন্ধে জার্মানদের সঙ্গে কথা হোলো। বিকেল বেলায় সে ফিরলো বাড়ি, চান করে, দাড়ি কামিয়ে ঘড়ীর দিকে তাকিয়ে হাসলো। সাড়ে ছটা—ঝোরের পথে এখন মাদো, বা পৌঁছেই হয়তো গেছে; ঘড়ীর দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে, প্রতীক্ষায় আছে...যতখন ইচ্ছে প্রতীক্ষা করুক না...এক ঘণ্টার মধ্যেই সে খুদে রেনের সঙ্গে ডিনার খেতে বসবে।

কিন্তু সাতটার পর সে বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে গাড়িতে চেপে বসলো। তার মন তখন ফাঁকা—জোর-কদমে গাড়ি ছুটলো ঝোরের দিকে। আর কিছুদূর ত্রিরিশ কিলোমিটার যেতে হবে...হয়তো মাদো বসে থাকবেনা, চলে যাবে...যা'বার পথে জার্মানরা গাড়ি আটকালো, সে হাওয়ার আবরণ দেখিয়ে দিলে—তার অনুমতি পত্র তাতে সাঁটা। কিন্তু এত সে তখন অস্থির যে তার ভাব-গতিক দেখে একজন সৈন্য তার সঙ্গীকে ডেকে বললে : হয়তো লোকটা বিপ্লবীদলের লোক।—কি বল?

লা বেল হতেস ছোট্ট হোটেল, যুদ্ধের আগে এখানে আসতো প্রেমিক

—প্রেমিকারা, মৎস্য শিকারী আর পেটুক ভোজন বিলাসীর দল, তারা কালো-ঠোঁটউলি মাদাম লা গ্রাঞ্জের রান্নার ভক্ত। এখন খুব কম লোকই আসে।

বাতি শূন্য ভোজনাগারের চারপাশে তাকালো, আবছা আলো-ভরা। একটা হুলো বেড়াল এ টেবিল থেকে ও-টেবিলের নীচে ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে। টেবিলে কাগজের ঢাক্‌না মোড়া, তাও দাগ-ধরা। মাদোকে সে প্রথমে দেখতে পায়নি, সে এক কোণে বসেছিল। বাতি তার দিকে তাকালো। সে বুঝতে পারলো, কিছুই বদলায়নি—না মাদো, না তার উপরে মাদোর প্রভাব। আগের চেয়ে নিস্প্রভ, ম্লান মাদো, একটা বর্ষাতি তার গায়ে, মাথায় নীল রুমাল বাঁধা। বাতি তাকে অস্ফুটস্বরে বললে,

তোমাকে বসিয়ে রেখেছি বলে ক্ষমা কোরো, বড় ব্যস্ত ছিলাম······

মাদো বললে, তাতে কি হয়েছে, আমার যথেষ্ট সময় আছে।

বাতি বসলো একটা চেয়ারে। দুজনেই চুপচাপ। বাতি এবার উঠে গেল মাদাম লে গ্রাঞ্জের কাছে, সে ক্যাশে বসে আছে।

বহুদিন আপনাকে দেখিনি মসিয়ে বাতি।

তা বটে, বড়ই ব্যস্ত, এখন আর এদিকে আসার সময়ই হয়না······

মাদাম বাতি কেমন আছেন ? মাদাম লে গ্রাঞ্জ মাদোকে দেখে চিনতে পারেনি। আর সে তো তাকে একবারই মাত্র দেখেছিল। সে ভেবেছে বাতি তার প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে এই নিভৃতে। সে ফিস্‌ফিসিয়ে বললে কথাগুলি।

ভালই আছে, ধন্যবাদ মাদাম, সে আছে এখন দক্ষিণ অঞ্চলে· আমি কুমারের জীবন কাটাচ্ছি। আমাদের জন্য কিছু একটু তৈরী করে দিতে পারবেন না ?

নিশ্চয়ই ম্যঁসিয়ে বাতি। সময় বদলে গেছে, তবু এখনো আমার ভাঁড়ার শূন্য হয়নি। কিছু দিতেই পারব। আমার যতদূর মনে হচ্ছে, ওমলেট

আপনি ভালবাসেন। আধঘণ্টার ভিতরেই ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে। রাতটা এখানেই কাটাবেন নাকি ?

বলতে পারি না। ডিনারের পরে বলব......

মাদোর কাছে ফিরে এসে বললে,

আধঘণ্টার ভিতরেই ডিনার তৈরী পাবে। তোমার যদি আপত্তি না থাকে আমরা একটু বেড়িয়ে আসতে পারি। এখানে কথাবার্তার স্থবিধে নেই—মাদাম লে গ্রাঞ্জের কৌতূহল একটু বেশি। বাড়িতে গেলেই তো পারতে......

তারা বেরিয়ে পড়লো! সদর সড়কের উপরেই হোটেল, সেখান থেকে একটা সরু পথ বেরিয়ে গেছে নদীর ধার অবধি। জ্যোৎস্না রাত—স্বচ্ছ, নীরবতা। হেমন্ত-শেষের নীরবতার মতোই তাকে উপলব্ধি করা যায়। আকাশের নীল পটভূমিতে নিষ্পত্র ঠুটো গাছের সার—মনে হয় তুলি দিয়ে আঁকা। বার্তি একটু অস্থির, স্নায়ুতে লেগেছে টংকার। সে একটা সিগারেট ধরিয়ে তখুনি সেটা ফেলে দিলে। মাদো কি বলে সে শোনবার জন্য ব্যগ্র।

সে জিজ্ঞেস করলে, ঠাণ্ডা লাগছে নাকি তোমার ? রাতে আজকাল বেশ ঠাণ্ডা পড়ছে।

না।

নিজের কোটের কলার তুলে দিলে বার্তি, নদীর ধারে এসে তারা থামলো, এবার বার্তি ফেটে পড়লো।

কি করে কাটালে—সহিসের প্রেম, না তাদের জুয়াড়ির বিশ্বাসঘাতকতা—কোনটা জুটলো ?

মাদো বললে, সে অনেক কথা......

বার্তির মনে হোলো ও রুমাল খুঁজছে, পকেট হাতড়ে পাচ্ছে না। হয়তো কাঁদছেই। ওর সঙ্গে ভদ্রতা সে যথেষ্ট করেছে, আর নয়!

মাদো আবার বললে,

হাঁ, সেই অনেক কথার মধ্যে আছে, ষোলো জনের হত্যা।

বার্তি কথাটার অর্থ বোঝবার আগেই সে হুমড়ি খেয়ে পড়লো! দূরে—দূরে ভেসে গেল গুলীর শব্দ। মাদাম লে গ্রাঞ্জ টেবিল সাজাতে গিয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললে, জার্মানগুলো আবার গ্রামে এসেছে মাতাল হয়ে।.......

মাদো তাকালো মাটির দিকে, প্রথম রাতের কথা তার মনে পড়ছে, বাতি ঘুমে, জানালা খোলা, ভোর হয়ে এল। সুদূরের সেই সাজির কাছে শপথ।...নদীর পাড়ে নৌকো বাঁধা, সে লাফিয়ে উঠে পড়লো। অপর পাড়ে উঠে ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে এগুতে লাগলো। এবার জেরারের সঙ্গে দেখা।

এত দেরী হোলো যে? আমি তো অস্থির হয়ে উঠেছিলাম।

ও দেরী করে এল।

তারপর?

মাদো মাথা নাড়লো। নিঃশব্দে ওরা এগিয়ে চললো, এবার মোড় ঘুরছে।

আরো দুই কিলোমিটার যেতে হবে। তোমার কষ্ট হচ্ছে?

না...সত্যিই জেরার, আমি ক্লান্ত···কিন্তু কি যায় আসে···

জেরার বাড়ির দরজায় বহুক্ষণ ধরে লাথি মারলো।

বললে,···বাড়ির কর্ত্রী আবার বদ্ধ কালা......

বাড়ীউলী ফুঁ দিয়ে কাঠ ধরিয়ে কেৎলি চাপিয়ে দিলে। বেঁটেখাটো মানুষটি একমাথা পাকা চুল। জেরার মাদোকে বললে।

ওর নাতি এখানে থাকত, সে এখন বন্দী, এখানে আমরা নিরাপদ.....

বুড়ির কানের কাছে মুখ নিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠলো,

এখানে আর কেউ আসছেনা তো?

বুড়ি শুনতে পেলনা। সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে,

ওতো ইষ্টারের পর্বের পরে আর চিঠি লেখেনি....

মাদো আগুনের কুণ্ডের কাছে বসেছে, বর্ষাতি তার গায়ে। কেমন জ্বর জ্বর ভাব। জেরার তার চোখে জল দেখতে পেল।

ওর জন্যে তোমার দুঃখ হচ্ছে?—

দুঃখ হচ্ছে আমার জন্যে, তোমার জন্যে, লাক আর এই বুড়ীর জন্যে... জীবন তো অন্য রকমও হতে পারত...তাই না? কিন্তু বলে আর কি হবে......

লাক্ হয়তো ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ....

ভোরবেলাই ও সব জানতে পারবে, যাও, এখন শুয়ে পড়গে। তুমি বড় ক্লান্ত ......তোমার মুখচোখ বসে গেছে......

দশ

বসন্তে লাঁসিয়ে মর-মর হয়েছিলেন। বাতির সঙ্গে সেই কথা হবার পরই তিনি যে শয্যা নেন, আর ওঠেন নি; রাতে বমি হয়। ঠিক এমনি বমি হয়েছিল যুদ্ধের আগে, যেদিন শুনে ছিলেন, রয়ের টাকা কোথা থেকে আসছে সে কথা। মোরিলো এবারও চিকিৎসার ভার নিয়েছেন। তিনি দেখে শুনে মন্তব্য করেছেনঃ স্নায়ুর ক্লান্তি বন্ধু। খুব বিপজ্জনক নয়, আবার আরামেরও নয়, মনটায় যাতে আনন্দ পাওয়া যায়, তাই-ই কর। তুমি নিজের সংগ্রহের বাতিকটা ছাড়লে কেন? লাঁসিয়ে হেসেছেন, শীর্ণ হাসিঃ—এখন আর আমার কিছুতেই মন বসে না। তুমি ভাবতে পার না ডাক্তার, আমি কি হয়ে গেছি—কি খাচ্ছি তাই-ই বুঝতে পারি না, জলবায়ুর অবস্থাও মালুম হয় না........

এমনি যখন অবস্থা, ভাগ্য তার উপর করুণা দেখালে। বিধবা আমোঁর ছেলেপুলে নেই, তার হৃদয়ে এখনো অ-ব্যয়িত স্নেহের উপাদান মজুদ। লাঁসিয়ে একটা সাহায্য রজনীর গান বাজনার আসরে তার সঙ্গে আলাপ

করেন। ফায়ার ব্রিগেডের মৃত সভ্যদের দুস্থ পরিবারের সাহায্য রজনী ছিল সেটা—মার্থা আমেঁার স্বামী ছিল ফায়ার ব্রিগেডের কর্তা। শীতে নিউমোনিয়া হয়ে সে মারা যায়, কিন্তু মার্থার মতে সৈনিকের মতোই মরেছে তার স্বামী—রণক্ষেত্রে। সে দেখতে সুশ্রী নয়, কিন্তু তার নারী-সুলভ কোমলতায় সে জয় করে নিলে লাঁসিয়ের হৃদয়। শুধু লাঁসিয়ে যখন তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করলেন, সে ঝরঝর করে কেঁদে বলে, মরিস, আমার বয়েস কিন্তু চুয়াল্লিশ·········

লাঁসিয়ের নিজের মনে প্রশ্ন উঠলো, তিনি কি মার্সলিনের স্মৃতিকে অপমান করছেন না—একি বিশ্বাসঘাতকতা নয়? তিনি জানতেন মার্থাকে তিনি কখনো ভালবাসতে পারবেন না—যেমন তিনি ভালবেসেছিলেন তার স্বর্গতা পত্নীকে। কিন্তু তিনি বড় দুঃখী, বড় একা!······মার্সলিনও হয়তো ওঁর এই অবস্থা দেখলে বলতেন, তুমি তো এমনি দুঃখে জীবন কাটাতে পারবেনা মরিস!······যখন মার্থার কাছে তিনি মার্সলিনের কথা বললেন, সে বললে, মরিস, সত্যিকার সুখের স্বাদ তুমি জীবনে পেয়েছ। তোমার স্ত্রী তো সাধারণ মেয়ে ছিলেন না। তোমার কথা থেকেই তা বুঝতে পারি······আমরা দুজনেই যুদ্ধে প্রিয়জনকে হারায়েছি। তুফান ওঠেছে সমুদ্রে, আমরা সেই সমুদ্রে ভাঙাচোরা দুই জাহাজ······ সত্যি, কি ভয়ানক সময়······লাঁসিয়ের ভালই লাগে ওর কথা। ও আজকের জীবনের কথা যা বলছে ঠিকই। জার্মানদের ও ঘৃণা করে, কিন্তু ও জানে ওদের সঙ্গে বাস করতে হবে। সত্যিকার ফরাসী মেয়ে যাকে বলে তাই। মার্সলিনের সঙ্গে তিনি ওর তুলনা করতে চান না, তার সে মার্জিত রুচি, উঁচু মন ওর নেই। নিভেল থাকলে ওকে 'বুর্জোয়াই' বলতো, কিন্তু ওর মতো আমরা সবাই যদি বুর্জোয়া হতাম, তাহলে হয়তো যুদ্ধে হারতাম না।

মার্থাকে বিয়ের প্রস্তাব করবার আগে তিনি তাকে তাঁর ছেলেমেয়ের কথা বললেন! তিনি সব খুলেই বললেন!—

লুই খুব সাহসী, একটু বা বেপরোয়া। কি জানি কি হোলো তার। ইংলণ্ডে তো গিছলো। ভয় হয়, হয়তো মারা গেছে। চুপ করে বসে থাকার ছেলে সে নয়। মার্সলিন ওকে খুব ভালবাসতো। কিন্তু মাদো ঠিক আমার মনের মতো।...আমারই মতো ও রাজনীতি ঘৃণা করে। সবাই বলতো, ও কালে বেশ ভাল চিত্রশিল্পী হবে। ও যখন বাতির প্রেমে পড়লো, আমি এত খুশি হয়েছিলাম যে কি বলবো! কিন্তু বাতি একটা রহস্য, উঁচু আদর্শ আর তর্ক শাস্ত্রের এক অদ্ভুত মিশেল—নাছোড়বান্দা তার্কিক! ও কাউকে বাঁচাতে পারে আবার ধ্বংসও করতে পারে। ওদের মধ্যে কি হোলো কে জানে! হয়তো বাতি মাদোর কাছে কোনো অপরাধ করেছে, তাকে চটিয়ে দিয়েছে, হয়তো একটা উপপত্নীই রেখেছে। যে কারণই হোক, মাদো তাকে ছেড়ে চলে গেছে।......কিন্তু বাতির কি ঔদ্ধত্য, সে কিনা অপমানজনক কথা বলে ওর সম্বন্ধে......এ অমার্জনীয় অপরাধ, অবশ্য ও যে কতখানি সইছে তা আমি বুঝতে পারি।......

লাঁসিয়ে দেখলেন মার্থার চোখে জল ঝরছে। তিনি বললেন,

প্রিয়া, আমার স্ত্রী হও তুমি। আমাদের এ মিলন হোক দৃঢ়। বিপদ যখন তার সৌন্দর্য নিয়ে দেখা দেয়, মন টানে—সে দিন আমরা দুজনেই পেরিয়ে এসেছি। আজকের এই তাণ্ডবের মাঝখানে আমরা চাইছি শান্তি, একটু বিশ্রাম—আমরা একে অপরকে সাহায্য করব.......

মার্থা তাঁকে জড়িয়ে ধরে তরুণীর মতো লজ্জায় রাঙিয়ে উঠলো। সে ফিসফিস করে বললে, নতুন বছরের আগের দিন আমার বোন বলেছিল, তুমি সুখী হবে.......আমি বিশ্বাস করিনি।......তোমাকে পেয়ে আমি সুখ কি আবার তার স্বাদ পেলাম......

বিয়ে বিনা আড়ম্বরে চুপ করেই হয়ে গেল। অতিথিদের মধ্যে লাঁসিয়ে নিমন্ত্রণ করলেন মার্থার বোন আর তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের। তাদের আগেই তিনি বুঝিয়ে দিলেন: মার্সলিনের স্মৃতি পবিত্র—মার্থা আর আমি দুজনেই

তা মনে করি। সবাই তাঁর আবার এই বিয়ে করা সমর্থন করলেন। মোরিলোই শুধু ঠাট্টা করতে সাহস পেলেন, ভারি ইতর, স্থূল ঠাট্টা। তিনি বললেন, মরিস, অতো কিন্তু-ভাব কেন তোমার? তোমার তো পঞ্চান্ন বছর মাত্র বয়েস, খুব একটা বেমানান নয়তো! তাছাড়া জার্মানরা তো এর চেয়ে খারাপও অনেক কিছু আমাদের সইতে শিখিয়েছে।

ল'াসিয়ে সাঁবা আর নিভেলের ভিতরে একটা আপোষেরও বন্দোবস্ত গত গ্রীষ্মেই করে ফেলেছিলেন। তবে মনে তার খুবই ভয় ছিল, তারা আবার ঝগড়া করবে। তাই তাদের সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে কথা বললেন; বললো, আজকের একটা দিনের জন্য রাজনীতি ভুলে যাও। বর্তমানের এই ভয়ংকর পরিবেশের মধ্যে আমার এই তো একমাত্র আনন্দের মুহূর্ত......

ভোজ ভালোয় ভালোয় শেষ হয়ে গেল। সাঁবা কেমন বিষণ্ণ, চুপ করে আছে—ভাবছে মাদোর কথা; তার ব্যর্থ প্রেমের নিষ্ফল তীব্রতা সময় তো কমিয়ে দিতে পারেনি। নিভেল বেশ খোস মেজাজে আছে, এমন মেজাজ তার খুব কমই থাকে। যে যা বলছে, তাতেই সায় দিচ্ছে, যাতে সবাই যোগ দিতে পারে, একমত হতে পারে—এমনি বিষয়ই উত্থাপন করছে—যুদ্ধের আগের করবেইয়ের স্মৃতি মন্থন সে করছে। মার্থার ব্যবহারও বিনম্র। অতিথিদের সে শুধু বার বার বলছে, অত কম খাচ্ছেন কেন?...... ল'াসিয়ে শাম্পেন গেলাসে ঢালার সময় উৎফুল্ল হয়ে উঠছেন। দ্যুমাতো মাতাল। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন,

আমি লিও আলপের্তের স্বাস্থ্য পানের প্রস্তাব করছি। এই সেদিন তার সঙ্গে দেখা, তার বুকে দেখলাম হলুদ রঙের তারা আঁকা। এস, লিও আলপের্তের ঐ তারকা চিহ্নের সম্মানে পান করি বন্ধুদল!

সবার গেলাসেই গেলাস ঠেকিয়ে নিলেন তিনি, একটু শব্দ উঠলো। নিভেল ঠোঁট কামড়ালে, তবুও সে গেলাস বাড়িয়ে দিলে।

না, ম্যঁসিয়ে নিভেল, আপনার সঙ্গে গেলাস ঠেকাতে আমার আপত্তি আছে, অন্তত খানিকটা ভদ্রতাবোধ তো থাকবেই মানুষের......

সাঁবা চেপে রাখতে পারল না, হর্ষধ্বনি করে উঠলো।

নিভেল শান্ত স্বরে বললে,

আপনি মাতাল।......পারিবারিক জমায়েতের এই পবিত্রতা আমি নষ্ট করতে রাজি নই।

লঁাসিয়ে আর মার্থার কাছে বিদায় নিয়ে সে চলে গেল। লঁাসিয়ে হ্যমাকে ভৎ‍র্সনা করে বললেন, অমন করে শুরু করলে কেন......কিন্তু হ্যমা যুক্তি মানতে চান না, তিনি চেঁচিয়ে বললেন শুরু ওরাই করেছে। তুমি কি মনে কর আমি ওর মতো মানুষের সঙ্গে গেলাস ঠোকাঠুকি করতে পারি? তিনি বেরিয়ে গেলেন মোরিলোকে নিয়ে। সাবাঁ বিদায় নেবার সময় লঁাসিয়েকে জড়িয়ে ধরে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলে,

মাদো কোথায়?

আমি কি জানি। বাতির সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে···হয়তো লুই যেখানে গেছে, ও সেখানে আছে।......কোনো কিছু আজকাল বোঝবার তো উপায় নেই। সবই জটিল.......

অতিথিরা চলে গেলেন, মার্থা এবার লঁাসিয়েকে বললে,

দেখ দিকি, ওরা ঝগড়া করলেন তো! অধ্যাপক কিন্তু ঠিকই বলেছেন—কোন মানী লোককে তিনি ইহুদী বলে অত্যাচার করা উচিত নয়। বেচারী চার্লস, ওর অধীনেও তো ক'জন ইহুদী ছিল, কিন্তু ও কখনো বাছ-বিচার করেনি।......কিন্তু একটা জিনিষ বুঝতে পারছিনা—অধ্যাপকই বা ম্যসিয়ে নিভেলের উপর এমন দুর্ব্যবহার করলেন কেন।

তুমি ওসব বুঝবেনা মার্থা, ওসব রাজনীতি। নিভেল বলেন, জার্মানদের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতা করা উচিত।

তাতে দোষটা কি? ওরা যখন এখানে এসে গেছে, সহযোগিতা তো

করতেই হবে। আর তারা কি আমাদের উপর নির্ভর করছে!.......সবাই-ই তো সহযোগিতা করছে, কিন্তু ওদের উপর কারো একটু ভালবাসা আছে, একথা কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু অধ্যাপকের মতো চেঁচিয়ে লাভটা কি......বরং বিপদেই পড়তে হবে......

লাঁসিয়ে মনে মনে ভাবলেন : মার্থা ঠিক আমার মতো ভাবে। মার্শালও এমনি ভাবেন—ভাবে ফ্রান্সের সব মানুষ। দ্যুমা একটু ভোঁতা লোক, স্থূল। নিভেলের সবটাতেই একটু বাড়াবাড়ি।.......

আগে যা ছিল বাজে, আজকাল লাঁসিয়ে তাতেই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন। মোরিলোকে সঙ্গে দেখা হইতেই প্রথম তাকে জিজ্ঞেস করেন, কি স্তালিনগ্রাদের কি খবর?.......তিনি জানেন, বহুদূরে এক বিরাট যুদ্ধ চলছে, আর তারই ফলাফলের উপর নির্ভর করছে অনেক কিছু, হয়তো রোস আইনের ভাগ্যও। তিনি জার্মানদের কাজ করেছেন, সন্ত্রাসবাদীদের করেন নিন্দে, ইংরেজরা হাভার আর রুয়ের উপর বোমা ফেলতে তিনি তাদের উপর চটে গেছেন ; তবুও তিনি খানিকটা খুশি হয়েছেন—জার্মানরা বিপদে পড়েছে। রুশরা ধ্বংস হয়ে যাবেই। ওরা ক্ষ্যাপা, আত্মহত্যা করছে, কিন্তু জার্মানদের তাতে সুবিধে হবে না......দ্বিপের বিমান হানা শুধু সর-জমিনে তদন্ত মাত্র, দ্যুমাই একমাত্র তাকে সত্যিকার অবতরণ বলে মনে করতে পারে। ওরা এত তাড়াহুড়ো করবে কেন? রুশরা এখনো যুদ্ধ চালাচ্ছে....দুই কি তিন বছরের মধ্যে মিত্রশক্তি হয়তো সত্যিই অবতরণ করবে। জার্মান খবরের কাগজগুলো যাই-ই বলুক, আমেরিকা এক মহান শক্তি।......

প্রাতরাশের সময় তিনি মহাযুদ্ধের ঝড়ের কথা ভুলে গেলেন। মার্থা আর তিনি খেতে লাগলেন। তিনি বললেন, কি অদ্ভুত মার্থা, এই সর্বনাশের মধ্যে যে সরল স্বাভাবিক আনন্দটুকু পাব, তা ভাবতেও পারিনি......

একদিন প্রাতরাশের সময় তিনি খবরের কাগজ খুলেই চেঁচিয়ে উঠলেন।

এক বিস্ময় তার মুখে চোখেঃ তার জামাই খবরের কাগজের কলমে থেকে তার দিকে যেন তাকিয়ে আছে। তিনি পড়লেন, বার্তিকে জ্যুরের কাছে কে হত্যা করেছে। এ হয়তো ঈর্ষার ব্যাপার, নিহত ব্যক্তির টাকার থলে, ঘড়ী চুরি যায়নি। হত্যার আধ ঘন্টা আগে বেলে হোতেসের কর্ত্রী নিহত ব্যক্তিকে একটি লম্বা, সুশ্রী মেয়ের সঙ্গে দেখেছিলেন। মেয়েটির গায়ে ছিল ধূসর রঙের বর্ষাতি……

আমি ওর জন্যে দুঃখিত। কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ণ আমি নই, তবু তোমাকে সত্যি কথা বলতে কি মার্থা, উচিত ফলই সে পেয়েছে। সে যে-কথা আমার মেয়ের সম্বন্ধে বলেছিল, তা বলবার তার অধিকার ছিল না। ওর নিশ্চয়ই ডজন খানেক উপপত্নী ছিল। তার ফল তো এই হোলো।

লঁাসিয়ে কাগজ পড়তে লাগলেন। পুলিশ মঁস্থিয়ে বার্তির ব্যক্তিগত জীবনের সন্ধান লইতেছে, কি কারণে জানুয়ারী মাসে মাদাম বার্তি পারী ছাড়িয়া গিয়াছেন তাহাও তাহারা সন্ধান করিতেছে……লঁাসিয়ে বসে রইলেন, বহুক্ষণ, তারপর হঠাৎ মার্থার কাছে উঠে গিয়ে কানে কানে বললেন,

যদি মাদো তাকে খুন করে থাকে? কি ভয়ানক……

মরিস, কি বলছ!……ওকে কেউ সন্দেহই করছে না…আর তুমি কিনা একথা বলতে পারলে?…

মার্থা, তুমি মাদোকে জাননা। সে অবিকল মার্সলিনের মতোই হয়েছে… যখন অমন মেয়েরা প্রেমে পড়ে, তারা সব কিছু করতে পারে…আর মাদো তো বার্তিকে পাগলের মতো ভালবাসতো, আমাকে একটা কথা না বলে সে চলে গেল…

কিছুক্ষণ পরে তিনি শান্ত হলেন ঃ

মোরিলো ঠিকই বলেছে—আমার স্নায়ুই বিকল হয়ে গেছে; কত উদ্ভট কল্পনা করি…কি ভাবি জান?…যাকগে, ও আমাকে অপমান করলেও আমি ওর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময় যাব, একটা তোড়ার ফরমায়েস দিয়ে রাখতে হয়। আমার তো মনে হয় চন্দ্রমল্লিই মানাবে……

অন্ত্যেষ্টির সময় লাঁসিয়ে কাঁদলেন। তাঁর মনে পড়লো বার্তি আর মাদো এসেছিল মার্সলিনের অন্ত্যেষ্টির সময়। আমি জোসেফকে ভালই বাসতাম। ওর উপযুক্ত অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়াই হয়েছে। অনেক রাজনৈতিক শত্রু ওর আছে, কিন্তু কেউ তো অস্বীকার করতে পারবে না যে, ও একটা মস্ত লোক ছিল। মন্ত্রীরা, শ্রমিকরা শিল্পপতিদের সংঘ, শার্কে— সবাই ফুলের তোড়া পাঠিয়েছে......জার্মানদের বুদ্ধি আছে.......সামরিক কর্মচারীরা এসেছে ভদ্র সাদাসিধে পোষাকে...... ..

লাঁসিয়ে তাঁর জামাইয়ের কথা ভুলে গেছেন এমন সময় খবরের কাগজ নিয়ে এল এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ। খবরটি এই ঃ পুলিশ জানিতে পারিয়াছে যে মঁস্তিয়ে বার্তিকে যে স্ত্রীলোকটি খুন করে সে ফাঁস তিয়েরও প্রতিরোধ যোদ্ধাদের দলের লোক। আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা কর্তৃপক্ষের সহিত দেখা করিয়াছিলেন, তাঁহারা জোর দিয়াই একথা বলিয়াছেন যে বিজয়ী কর্তৃপক্ষের সহিত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছে, কিন্তু মুষ্টিমেয় একদল দুষ্কৃতকারী কেবল জার্মান সৈনিকদের উপর নহে, ফরাসী প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তিদিগের উপর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালাইতেছে। এই অজ্ঞাত দুষ্কৃতকারীদের ধরাইয়া দিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহাদের কার্যের বিবরণ কয়েকবার সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিতও হইয়াছে।

লাঁসিয়ে অবাক্ হয়ে গেলেন। এমন কথা তো তিনি শোনেননি। কমিউনিষ্টরা নিশ্চয়ই ক্ষেপে গেছে! বার্তির সঙ্গে মতের অমিল যে-কারো হতে পারতো। এই তো আমি নিজেই একটু চটে গিছলাম, ও যে শার্কের ডান হাত তাও বলেছিলাম, কিন্তু তর্ক-বিতর্ক করা এক কথা, কিন্তু একজন ভাল লোককে খুন করা তো অন্যায়, 'ঘোর' অন্যায়। আমার তো সন্দেহই হচ্ছে, লেজাঁর মতো লোকেরাই এসব পারে....কিন্তু জার্মানরা অমন মোটা পুরস্কার ঘোষণা করে বসলো কেন?...তার মানে বার্তিকে দিয়ে তাদের যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল, বার্তি ছিল তাদের কাছে একান্ত

প্রয়োজনীয়। আর মাদো কিনা এমন লোককে ছেড়ে চলে গেল...ওরা তো আমাকে এসে জেরা করতে পারে, এমন চমৎকার মানুষকে আমার মেয়ে ছেড়ে চলে গেল কেন। কিন্তু এই বর্বরগুলোকে কি করে বোঝাব যে হৃদয়ের দাবীর তো কোনো তুলনা মেলে না। মাদো যে মার্সলিনের পথেই চলে...ওরা আমাকে এই ব্যাপারে জড়িয়ে ফেলতে পারে। আরো কারণ আছে। বেচারী আলপের্তের ছায়া রোস-আইনে থেকে যাই-যাই করেও মেলায়নি। ওর সঙ্গে আমিই বা কারবার করতে গিয়েছিলাম কেন? জীবনে বহু কাজই করেছি উচ্ছৃঙ্খল, উদ্দাম হয়ে উঠেছি, এখন বুড়ো বয়সে তার ফলভোগ করতে হচ্ছে।...

মার্থা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলে, কিছুই খাচ্ছ না যে?

লাঁসিয়ে রেগে উঠলেন, ছুঁড়ে ফেললেন কাঁটা-চামচ।

তুমি তো খালি খাবার কথা ভাব। আমার যে কি বিপদ তা তুমি কি বুঝবে......

আবার চুপ করে গেলেন লাঁসিয়ে। মার্থা তো আর মার্সলিন নয়।... কারো সঙ্গে যে পরামর্শ করবেন এমন লোকও নেই। নিভেল হয়তো বলবে, তা এতো পরিষ্কার, আপনি ইহুদী আর সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষের লোক, আপনার বাড়িতে তারা আলপের্তের স্বাস্থ্য পান করেছে সেদিন। ত্যুমা হয়তো বলবেন, তাকে যে খুন করেছে ভালই তো হয়েছে...সবাই যেন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বসে আছে, কিছুমাত্র আর বাকি নেই। সময় সময় তো এটা যে ফ্রান্স একথাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না......

যখন একখানা জার্মানদের গাড়ি করবেইয়ের কিছুদূরে এসে থামলো, লাঁসিয়ে জানালায় দাঁড়িয়েছিলেন; তিনি ফিস্‌ফিসিয়ে ডাকলেন:

মার্থা!......

মার্থা ছুটে এল তাঁর কাছে।

কি ব্যাপার?

জার্মানদের গাড়িখানা আবার চলতে লাগলো, ল'াসিয়ে বললেন।

না কিছুনা...ও তোমার মনের ভুল...আমি তো ডাকিনি মার্থা......

এই উদ্বেগ থেকে মুক্ত হবার পথ তিনি খুঁজতে লাগলেন, তারপর ভাবলেন বাতির মৃত্যুতে তিনি তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে লিখবেন এক প্রবন্ধ। চিঠি ছাড়া বহুদিন কিছু লেখেননি, প্রবন্ধ লেখার কথা ভাবতেই যেন এক যন্ত্রণা এসে দেখা দিল; কিন্তু একবার শুরু করে দিতেই তিনি ডুবে গেলেন কাজে। শেষ ক'টা ছত্র পড়ে তো তিনি নিজেই খুশি হয়ে উঠলেন ঃ

তিনি তো আমার শুধু জামাতা আর বন্ধুই ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক মহান নাগরিক।

যে দুষ্কৃতকারী তাঁর এই মহান মানুষটির বিরুদ্ধে হস্তোত্তলন করেছে, তার জন্যে সবার মনে দেখা দিক ঘৃণা। সে হয়তো শার্লতে কর্দ্যে হবার স্বপ্নে তখন বিভোর! ওকে মিডিয়ার সঙ্গে তুলনা করাই বুঝি সঙ্গত, ওভিডনা মিডিয়ার মুখে এই কথাটা বলিয়েছিলেন, আমি যা দেখি তাতো সুন্দর, কিন্তু কাজ যে আমার কদর্য—কুৎসিৎ। দুষ্কৃতকারিণী মার্শালের ফ্রান্সকে দেখেছে, সে সাহসী বীর জোসেফ বাতিকে দেখেছে, কিন্তু বিদেশীদের প্ররোচনায় সে হোলো দুষ্কৃতকারিণী। এক মহাপাপ অনুষ্ঠিত হোলো।

ল'াসিয়ে মার্থাকে লেখাটা পড়ে শোনালেন।

মার্থা বললে, লেখাটা চমৎকার হয়েছে। কিন্তু কাকে পাঠাবে? তার কি কোনো আত্মীয়-স্বজন আছে।

খবরের কাগজে পাঠাব।

কেন, এসব করবে? তার চেয়ে চুপ করে থাক....হয়তো এতে ওরা তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে.......

ল'াসিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন,

একজন ফরাসীদেশের মানুষ এই দেশেরই আর একজন মানুষের মৃত্যুতে

শোক জানাবে—তাতে বাধা দেয় কার সাধ্য! তাছাড়া সে আমার জামাই......

তিনি লেখাটা খবরের কাগজে পাঠিয়ে দিলেন। সন্ধ্যেয় মোরিলোকে তিনি ফোন করলেন, তিনি যেন খবর পেয়েই চলে আসেন।

ডাক্তার যখন তাকে পরীক্ষা করতে চাইলেন তিনি বললেন,

আমি তোমাকে অন্য ব্যাপারে ডেকেছি। দোহাই তোমার, হেসো না। এ আমার কাছে জীবন-মৃত্যুর ব্যাপার। আমি বাতির মৃত্যুর উপর এক শোকোচ্ছ্বাস লিখেছি। আমি যা ভাবি, সে কথা লিখতে পারিনি, কিন্তু কি করবো? জার্মানদের ওর সম্বন্ধে উঁচু ধারণাই ছিল, আর মাদো ওকে ছেড়ে চলে গেছে। আমার অবস্থাটা বুঝতেই পার—একেবারে বিপজ্জনক। রয় যে কোনো মুহূর্তে আলপের্তের কথা তুলে বসবে। আমাকে তাই এটা করতে হোলো। অন্য দলে তোমার বোধ হয় চেনাশুনা আছে? তুমি তো লণ্ডন ষ্টেশন ধর, ওদের বলে দিও—আমার ইচ্ছে ছিল না—আমি বাধ্য হয়ে এ কাজ করেছি।....

মোরিলো বিদ্রূপভরে হেসে উঠলেন,

আমি লণ্ডন বেতার শুনি বলে এমন তো নয় যে লণ্ডন আমার কথা শোনে। কাকে বলতে বলছ? মাদোকে? কিন্তু মাদো যে একেবারে উবে গেছে···

তুমি আবার ঠাট্টা শুরু করেছ?

তোমার স্নায়ুর ব্যাপার......একটু বিশুদ্ধ হাওয়া লাগাও—পরিশ্রম কর...

বেতারের খবর শুনেছ নাকি? নতুন খবর আছে? স্তালিনগ্রাদে কি রকম চলছে?

কোনো পরিবর্তন নেই। জার্মানদের পক্ষে খবরটা খারাপই। এসব ব্যাপার হয় একবারেই শেষ হয়ে যায়, নয় তো কিছুতেই হয় না। যে পরিকল্পনা ছিল সেটা বাতিল হয়ে যায়......

জার্মানদের সময় খারাপ যাচ্ছে এ খবরে লাঁসিয়ের কেমন অস্বস্তি লাগলো, এখন তো ওদের সঙ্গে আমি বাঁধা। মোরিলো তো খালি লোককে জালিয়েই

আনন্দ পায়। পারী-সোয়ারখানা তুলে নিয়ে—ল'াসিয়ে এবার চেঁচিয়ে উঠলেন, স্বর তাঁর উত্তেজনায় ভাঙা।

কি যা-তা বকছ ডাক্তার। স্তালিনগ্রাদ দখল হয়ে গেছে। নিজে পড়ে দেখ না। তুমি যে কেন এসব বাজে খবর কান পেতে শোনো, ভেবে পাই না……

বন্ধু, ধীরে, ধীরে, অত জোরে নয়।……তুমি লিখেছ, চেঁচাচ্ছ, কিন্তু সবই তোমার দেহকোষের ব্যাপার……

এগারো

অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় রাত কাটছে তার। লাক তো হাসে আর বলে, প্রতিরোধ সংগ্রামে একজন বালজাক নেই—এ বড়ই আফশোষ! তাহলে একশোখানা সম্পূর্ণ নভেল লেখা যেত ……আজকের রাতটা কাটাতে এসেছে সে এই বাড়িতে। কর্তা জীবজন্তুর চামড়ায় খড় পুরে বিলাসীদের বৈঠকখানার শোভা বাড়াতে সাহায্য করেন। চারদিকেই অদ্ভুত চোখের সার, একটা প্যানথার ওৎ পেতে বসে আছে, লাফিয়ে ঘাড়ে পড়লো বলে; একটা ভালুক-ছানা হাসছে; একটা পেঁচা দার্শনিকের মতো ভাবছে। মাদাম দাফির পোষা পমেরেনিয়ান কুকুরটার খোলে খড় পোড়া হয়েছিল কিন্তু যুদ্ধের জন্য আর নেওয়া হয়নি। এইখানেই পড়ে আছে। এই অদ্ভুত জীবজন্তুর চোখের সার লাককে যেন পাহারা দিচ্ছে বলে মনে হলো, কিন্তু সে নিজেই যে পাহারাদার।

মাদো যখন এল, পরিবেশ দেখে সে ঘাবড়ে গেল। লাক হেসে বললে,

ফ্রান্স, ভয় পেওনা, ওরা কামড়ায় না। যদি একটা গেষ্টাপোর খোলে খড় পুরে রাখতো, তাহলে ভয় পাবার কথা ছিল বটে……

আর সবার মতোই লাক এখন মাদোকে ফ্রান্স বলে ডাকে। সেও ভুলে

গেছে লাক করে ছিল ইঞ্জিনিয়ার লেঁজা। লাকের দলে সে কাজ করছে প্রায় একবছর। এই দীর্ঘ অভিযানে বার্তির হত্যা কাণ্ডতো একটা ঘটনা মাত্র ; তাদের কাজ হোলো সামরিক উৎপাদনে বাধা দেওয়া, ধ্বংস করা। বার্তির খবরে যোলোজন নিহত হয়, তাদের মধ্যে পাঁচজন ছিল লাকের সাথী, সহকর্মী। এর ফলে তাদের সমস্ত কাজ কয়েক সপ্তাহের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। সেই ফিরস্তির পালা কেটে গেছে। জুলে আর নিকো ছিল চমৎকার ছেলে। আর সব চেয়ে বড় কথা বার্তি মারা গেছে।

লাক বললে, খবরের কাগজ দেখেছ? ওরা আমাদের ইশ্‌তাহার পড়েছে। আর ঈর্ষা, প্রণয়ের দ্বন্দ্বের কথা বলে না। এর ফল ফলেছে বিরাট—ওরা এখন বুঝতে পারছে যে আমরা একটা শক্তি, ফ্রান্স, তুমি এখান থেকে চলে যাও। হোটেলউলি তোমাকে দেখেছে। তোমার পিছনে ওরা লোক লেলিয়ে দেবে। জেক তোমাকে কাল এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে।

কোথায়?

অন্য এলাকায়। হয়তো সেখানে গিয়ে পল আর জোসেতের সঙ্গে তোমার দেখাও হবে।

মাদোর দুঃখ হলো, পারী তাকে ছাড়তে হবে। তার সমস্ত জীবন এখানে কেন্দ্রীভূত, এখানে বাঁধা পড়ে আছে। তার শৈশব, নিঃসঙ্গতা, অন্তরালের জীবন—সবতো এই শহরেই কেটে গেছে। ......কিন্তু নিজের আত্ম-সংযম আছে তার, লাক কিন্তু সেকথা বুঝলো না।

ওখানকার খবর কি?

সে মাদোর স্বরে অনুমানে বুঝলো, সে কি বলতে চায়।

টিকে আছে, প্রতিরোধ করছে। সত্যি, অদ্ভুত নয়? ভেবে দেখ—জার্মান সেনাবাহিনীর সেরা সেরা পল্টন, ইতালী, রুমানিয়ান পল্টন—তাও প্রায় পাঁচ লাখ হবে ; তাছাড়া আছে ইউরোপের কল-কারখানাগুলো।....এক ফোঁটা একটু জমি......সোবিয়েতের মানুষ সেখানে তাদের প্রতিরোধ করছে।......

এ ঘটনা চিরদিনের জন্য অমর হয়ে থাকবে মানুষের মনে। রাশিয়ার দিগন্তের বিস্তারের উপর নয়, এক ফালি একটু জমির উপর এই আঘাত! দুমাস তো হয়ে গেল! কাল জার্মানরা বেতারে ঘোষণা করেছে; বলেছে, এ এক ভয়ঙ্কর মৃত্যু-তাণ্ডব। হাঁ, মৃত্যু-তাণ্ডবে তারা শেষ হয়ে গেছে, অন্তিম এসেছে ঘনিয়ে। আজ ভোরে পথে দুজন লোক কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল। ওরা মজুর নয়, সরকারী উপরওলা হবে, অথবা বাড়িওলা। ওরা একে অপরের কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করলে, তারপর একজন বললে, স্তালিনগ্রাদ এখনো টিকে আছে হে! ভাব দেখি, ওদের মতো মানুষও বুঝতে শিখছে। সারা পৃথিবী তাকিয়ে আছে...আনা বলে জার্মানদের আর চেনা যায় না। একটা বিরাট পরিবর্তন যে ঘনিয়ে আসছে, শুধু তা' অনুভব করতে পারা যায়...

গত এক বছরে মাদো আর লেজঁা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, বন্ধুত্বের খাঁটি বন্ধনে তারা বদ্ধ। লেজঁাকে যারা শুষ্ক মতবাদে বিশ্বাসী বলে জানে তাদের কাছে এ বন্ধুত্ব এক হেঁয়ালী। তারা তো বলে লেজঁা জীবনে দুটি কথা জানে, হয় 'হাঁ', নয়তো 'না', হয় কালো, নয়তো লাল। কিন্তু লেজঁা তো তেমন লোক নয়। সে জীবনের সব দিকটাই দেখেছে। কিন্তু সে এমন এক যুগে আছে যেখানে একটা মাত্র উদ্দেশ্যের জন্যই মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়। মহাযুদ্ধের আগে থেকেই শুরু হয়ে গেছে যুদ্ধ, মানুষ যত বুঝদার হবে, ততই সেও বুঝবে আত্ম-সংযমের মূল্য। হয়তো এই জন্যেই সে মাদোকে চিনতে পেরেছিল, যখন মাদো ছিল করবেইয়ের খাম-খেয়ালি মেয়ে। সে কথা বেশি না বললেও সে তাকে চিনে... মাদোর সাথীরাও তাকে সাহসী, বুদ্ধিমতী বলে প্রশংসা করে। লাক জানে তার চেয়েও সে বেশি! কি মূল্য দিয়েছে মাদো; হঠাৎ জীবন তাকে মাড়িয়ে দলে-পিষে দিয়ে চলে গেছে; ব্যক্তিগত জীবন সে ছেড়ে এসেছে, ছেড়ে এসেছে ভবিষ্যৎ সুখ, শুধু বজায় আছে অতীতের আত্মসম্মানটুকু। বতি ষোলজনের বিরুদ্ধে খবর দেয়। তাদের বিচার আর প্রাণদণ্ডের পর প্রশ্ন উঠলো এই জার্মান তাঁবেদারকে (তার সাথীরা ঐ নামই দিয়েছিল বার্তিকে) শাস্তি দিতে হবে!

লাক তাতে এই কথাটাই যোগ করে দিলে, ও তাঁবেদার বলে ওকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে না, ও প্ররোচনাকারী। ফ্রান্স বার্তিকে হত্যা করবার ভার স্বেচ্ছায় তুলে নিলে নিজের হাতে। লাক মাদোর কাছে রইলো, ওকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করলো; 'না, তুমি এ ভার নিও না। আমাদের যোদ্ধার অভাব নেই তারাই একাজ পারবে।' হয়তো তার ভয় হয়েছিল, মাদো পালাতে পারবে না, হয়তো এই নিরস্ত করার পিছনে ছিল আর কিছু ঃ যাই হোক, মাদো বার্তির স্ত্রী তো .....কিন্তু মাদো পেড়াপিড়ি শুরু করলে, অন্যে কেউ জীবন বিপন্ন করবে কেন? আমার পক্ষে কাজটা সোজাই হবে। আর আমি করতেও চাই। ওর এক সেক্রেটারী ছিল। নাম তার য়েভনে। সরল মেয়ে, চুল সে কোঁকড়াতো; আমার কাছ থেকে পড়তে চেয়ে নিয়ে যেত ফ্যাসানের মাসিক আর সাপ্তাহিক; সে স্বপ্ন দেখতো গার্বা বা কোন চিত্র-তারকার সঙ্গে তার দেখা হবে। আর ও কিনা ওকেও এর মধ্যে জড়ালে! লাক, তোমার কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, একাজ আমি করবই। এ আমার অধিকার—দাবী। এখুনি বিদায় নিতে হবে। লাক রাতটা এখানেই কাটাবে। ফ্রান্স যাবে ভাসারের বাড়িতে, সেখানে জেক আসবে পরদিন। তারপরে—দক্ষিণ অঞ্চল...এখন তো ঘনিয়ে আসছে তারই বিবাদ—দুজনেই বিষণ্ণ। এক বছরে কি করে এমন সম্পর্ক গড়ে উঠলো—কি সে জিনিস যা ওদের মিলিয়ে দিল?

ফ্রান্স জিজ্ঞেস করলে, যুদ্ধের পরে কি সব ঠিক হয়ে যাবে? ভবিষ্যতের গর্ভে সে উঁকি মেরে দেখতে চায়, জানতে চায় আর সবাই সুখ আর শান্তি পাবে কিনা। মিলেৎকে ওরা গুলী করে মেরেছে। রোবার্ট ভুলবে না তার প্রেমের কথা। কিন্তু ঐ কিশোররা—ঐ লাকের ছেলে পল? কি হবে ওদের?... ..না, পল তো এখন অন্তরালে...মিমি আছে,—লাকের ক্ষুদে মেয়ে-তার এখন ন' বছর বয়েস......

বহুক্ষণ লেজাঁ নীরবে ধূম পান করলো।

পেঁচা আর চিতাবাঘের চোখ জল জল করছে, আর পোষা পমেরেনিয়ানটা যেন অসন্তুষ্ট লোকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য প্রস্তুত।

লাক বললে, গত মঙ্গলবার আমার সঙ্গে একজনের দেখা হয়। সে ইঞ্জিনিয়ার। যুদ্ধের আগে সে ছিল ক্রোয়া-দ্য-ফিউতে। তার কাছে টমি গানের কথা বললাম। ওদের হাতে বহু রয়েছে—মিত্রশক্তি প্যারাসুটে করে নামিয়ে দিয়ে গেছে। ওরা সেগুলি লুকিয়ে রেখেছে। দেখতো কি আফশোস... আমাদের হয়তো এক আধ ডজন দিলেও দিতে পারে। যখন ভবিষ্যতের কথা বলছিলে, ঐ লোকটীকে আমার মনে পড়লো। বন্ধুর মতোই কথাবার্তা হয়। সে কাল হয়তো গ্রেফতার হতে পারে, কিন্তু বিশ্বাস সে ভাঙবে না, খাঁটি মানুষ যাকে বলে সে তাই। তিন বছর আগে যখন আমি জেলে যাই, তখন এমনি কোনো লোক সেখানে থাকলে চেঁচিয়ে বলতোঃ কমিউনিষ্টদের গুলী করে মারা হয় না কেন? ......কে জানে তিন বছর পরে ওর কি পরিবর্তন হবে? ...এখন ওরা বলছে ফ্রান্সের সংস্কার চাই, সব কিছু পচে-গলে গেছে; কমিউনিষ্টরা সাহসী। স্তালিনগ্রাদের প্রশংসাও করছে। এইতো ইঞ্জিনিয়ারটি আমাকে বললে, স্তালিনগ্রাদে ওরা আমাদের জন্যও যুদ্ধ করছে..... কিন্তু পরে কি হবে—জেতবার পর? একজন হয়তো নতুন করে ভাবতে শিখবে, নতুন জন্ম নেবে। কিন্তু গোটা শ্রেণীর কি হবে? না, তা তো হয় না। সব সময়েই সে ফ্রান্সের কথা বলছিল—তার যেন বাড়িই শুধু আছে—নেই পরিবার, নেই জনগণ......'

মাদো বললে, বিলাঁকোর্তের এক বাড়িতে সে দিন গেলাম লাক; বাড়িটা বোমায় ভেঙে-চুরে গেছে, ওরা মানুষগুলোর অন্য জায়গায় থাকবার ব্যবস্থা করে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা রাজি হয়নি। বাড়িতো নেই, শুধু খাড়া হয়ে আছে দেওয়ালগুলি; ওরা নিচের তলায় ঠাঁই নিয়েছে। জানালাগুলি দিয়েছে কোন রকমে কাঠ দিয়ে বন্ধ করে। বর্ষা আসছে; ঠাণ্ডা, কিন্তু বাড়ির বাসিন্দে একটি মেয়ে বললে, যাই-ই-হোক, তবু আমাদের নিজের বাড়ি।...দেখ

কখনো কখনো ভবিষ্যতের কথা আমি ভাবি, ভয় পাই....এখন তো ঝড়ের ভিতর দিয়ে কাটাচ্ছি। ছাদ উড়ে গেছে, জানালা খসে গেছে, মানুষ যেন এখন পথে পথে কাটাচ্ছে। ওরা বলে, বিজয়ের পর আমরা আবার গড়ব।' কিন্তু হয়তো ওরা পারবে না, জোড়াতালি দেবে, এক টুকরো ইট নিয়ে ফাটল বুজিয়ে দেবে ; ছন্নছাড়া, অন্ধকার, তবুও নিজের বাড়ি—পুরাণো বাড়ি......

লাক্ বললে, ফ্রান্স, মানুষ কি কখনো এক সঙ্গে বদলায় ? একটা বিপ্লব আসবে তবে তো। আজই আসুক আর কালই আসুক—আসবেই। এমন কি বিপ্লবের পরও সব কিছুই একদিনে বদলাবে না—মানুষের তো কথাই নেই। যারা স্বপ্নবাদী তারাই বিশ্বাস করে রাতারাতি সব হয়ে যাবে ; তাদের কাছে শুরু আর শেষ দুই-ই-তো সুদূরে। কখন চূড়ায় ওঠা কষ্টসাধ্য হয়ে হয়ে দাঁড়ায় জানো ? নিচু থেকে যখন চূড়ার দিকে তাকাও তখন নয়—গোড়ায় তো নয়ই—কিন্তু যখন এলে মাঝপথে, যখন পথের হদিশ তোমার আয়ত্তে। ছুটে নেমে আসতেও তখন পার কিন্তু তুমি উপরে উঠছ তো উঠছই······ বিপদভরা পথ—আছে পাথরের চাঁই, কাদা, রক্ত! কিন্তু তবু এ তো এক সড়ক······

আমি নিজের কথা ভাবি না লাক। কিন্তু ছেলেমেয়েরা···তোমার মিমিকে দেখতে পাবে ?···

ফ্রান্স আমার মনে আছে, যখন তুমি আসতে লুকোচুরি খেলতে আমার মিমির সঙ্গে! মিমি মারা গেছে। এপ্রিল মাসে। জোসেৎ জানে না। তাকে বোলো না···জোসেৎকে যখন লুকোতে হোলো, ও এক বন্ধুর কাছে রেখে গেল তাকে। বন্ধুটি গ্রেফ্তার হয়, মিমি তো তখন পথে নামলো। একজন রক্ষক তাকে পায়···আমি জোসেৎকে বলেছি, মিমি সুইটজারল্যাণ্ডে আছে, যুদ্ধের প্রথম দিকে ওকে লুসানে পাঠিয়ে দেব ভেবেছিলাম। জোসেতের এক মাসী আছে সেখানে। জোসেৎকে সত্যকথা বলতে পারিনি। এমনিই ওর শরীর খারাপ। মিমি ছিল তার সব, প্রতি চিঠিতে সে ওর কথা লেখে।

আমিও সব সময়ে ওর কথা ভাবি....কাল জোসেৎকে চিঠি লিখেছি এই বলে যে, খবর পেয়েছি মিমি বেশ বড় হয়েছে......

সে উঠে মাদোর কাছে এগিয়ে গেল। চারদিকে সবুজ, লাল, কালো রঙের চোখের সার তার মধ্যে মাদো দেখলে আর এক জোড়া চোখ—মানুষের সে চোখ।

ফ্রান্স, তোমার যাবার সময় হয়েছে। ভাসারের বাড়ি তো অনেক দিন······

মাদো তাকে জড়িয়ে ধরলো, তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো। পথ নিষ্প্রদীপ,—প্রথম শীতের কুয়াশা। হয়তো ভালোই হয়েছে—জার্মানরা নেই; দৈনন্দিন জীবনের যে মামুলি অথচ ভয়ংকর ধারা বয়ে চলেছে—তাও নেই। কখনো কখনো মাদোর মনে হয় জাহাজডুবি-হওয়া যাত্রী তারা, কাঠের টুক্‌রো ধরে ভাসছে—চারদিকে সমুদ্র। কিন্তু তাতো নয়। তার সাথীরা—এই মুহূর্তে ইশ্‌তাহার ছাপাচ্ছে, ট্রেন উড়িয়ে দিচ্ছে, শত পীড়নেও দিচ্ছে না স্বীকৃতি। আর আছে স্তালিনগ্রাদ। একই আদর্শে, একই উদ্দেশ্যের সমর্থন করছে তারা—আগে তারা কখনো এমনি ভাবে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেনি। আর এই এক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েও তারা একা—কুয়াশা যেন ঘিরে আছে তাদের, বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। কে জানত লাক সব সময়ে ভাবে তার মিমির কথা?.......

তাহলে পারীর জীবনের এই সমাপ্তি? এবার নতুন শহর, নতুন মানুষ সে দেখবে। অনুমান করে লাভ কি, কল্পনার এখন অবকাশ নেই—সবাই সৈনিকের জীবন যাপন করছে। সার্জিকে যদি এখন মোড়ে দেখি, আমরা নিঃসন্দেহে বুঝব পরস্পরকে। আর ভাবাবেগের কথা নয়, তর্ক নয়। ওকে বলবো, আজ তোমার পক্ষের খবর কি সার্জি?···পরশু জেক্‌ বলছিল, প্রতিটা বাড়ি রক্ষা কররার লড়াই চলছে স্তালিনগ্রাদে।

ওরা জানালা বন্ধ করে দেবে না, কাঠ ফেলে দিয়ে কাঁচ বসাবে, নতুন বাড়ি তৈরী করবে, কিন্তু মিমি তো তখন থাকবে না।......

ভাসার খোনা গলায় বললেন, এই রকম আবহাওয়ায় ঠাণ্ডা খুব

তাড়াতাড়ি লাগে। আমি যত কম পারি বাইরে যাই। আমার আবার বাত আছে......

সে-রাতে বহু গ্রেফ্‌তার হোলো। জেক্ চিলে কোঠার জানালা গলে পালালে। নিক, স্থরাভজ, রোবার্ট হোলো গ্রেফ্‌তার। সারা রাত ধরে লেজাঁ বিছানায় গড়াগড়ি দিলে—অদ্ভুত স্বপ্ন সে দেখলো, অদ্ভুত, অদ্ভুত! মিমি যেন একটা বল ছুঁড়ে দিলে; সে ছুটলো সেই বলের খোঁজে, কিন্তু পেল না, আর একবার বন্য শ্বাপদরা ছুটে এল, তাড়া করে এল—জ্বলজ্বলে তাদের চোখ, তারা এসে জুতো শুঁকলে, তারপর চেঁচিয়ে উঠলে।

বারো

আগের দিন সন্ধ্যেয় আনা একজন উপরওলা সামরিক কর্মচারীর সঙ্গে ঘুরেছে। ব্রেষ্ট থেকে সবে এসেছে কর্মচারীটি। সে তাকে বললে, ২১৮নং রাইফেল রেজিমেণ্টকে হঠাৎ রাশিয়ায় পাঠানো হয়েছে। লেফটেনাণ্ট শেলিং তা'কে স্তালিনগ্রাদে পাঠানো হবে শুনে আত্মহত্যা করেছে। মেজর লোকজন জড়ো করে বললেন, লেফটেনাণ্ট শেলিং-এর আত্মহত্যার জন্য দায়ী তার দুরারোগ্য ব্যাধি। কিন্তু সবাই সত্যিকার কারণ জানতো। তাই তারা বললে, দুরারোগ্য ব্যাধির আরামের দাওয়াই এবার খাব...... আনা মনে মনে ভাবলে, আমি জেক্‌কে একথা বলব, সে ফ্রাঁস আবোর-এ লিখতে পারবে...উপরওলাটি তাকে বললে, তোমার মতো জার্মান মেয়ে আমি আর একটিও দেখিনি—তুমি পারীর হালচাল জানো...আনা যখন গিলেৎ-এ ফিরছিল, এক মাতাল তাকে বললে, খুদে ইদুর, গর্তে পালাচ্ছ?

বেলা দশটায় জেকের সঙ্গে তার দেখা হবার কথা। বাড়ির কাছে এসেও সে সন্দেহের কোনো চিহ্নই পেল না, ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে সে

উঠে এল সাততলায়; দরজায় এসে পৌছিলে, কান পেতে শুনলো; তার মনে হোলো, জেক্ যেন কার সঙ্গে কথা কইছে। চার বার সে দোরে টোকা দিলে—এই-ই সংকেত। পুলিশ যখন তাকে ধরলো, একটা কথা তার মনে ঝলক দিয়ে গেল, ইঁদুর কলে ধরা পড়েছে, সে হাসলো।

একজন পুলিশ বললে, রোসো বাপু, শীগ্ গিরই কাঁদবে।

আনা বহুদিন থেকেই এই মুহূর্তটির প্রতীক্ষা করছিল, তাই এ সম্বন্ধে ভয়ও ছিল তার কম। তার নীরব নিশ্চল ভাব গেষ্টাপোদের ক্ষেপিয়ে তুললো। জেরার শুরুতে মিলেৎ তার উচ্চারণভঙ্গী দেখে অবাক হয়ে গেল, সে চেঁচিয়ে উঠলো,

তুমি মিথ্যে কথা বলছ! তুমি আলসেশিয়ান নও, তুমি জার্মান।

আনা উত্তর দিলে, এক সময়ে আমি জার্মান ছিলাম বটে, আবার মরলে জার্মান বলেই পরিচিত হব, তখন তোমাদেরও অস্তিত্ব থাকবে না। এখন আমি ফরাসী, রুশ, স্পেনবাসী, কিন্তু জার্মান আমি নই—জার্মান বলে নিজের পরিচয় আমি দিতে চাই না।

কর্ণেলকে শিলার বললে, এমন কথা আমি কখনো শুনিনি। এমন ডাইনিও আমি কখনো দেখিনি। ওর মুখ দেবদূতের মতো, হাত ব্যাগে রয়েছে প্রেমপত্র, আমার মতোই ও জার্মান ভাষা বলে। ও ঠিক অন্যের হাতের পুতুলটি নয়, ও একজন উঁচুদরের গোয়েন্দা।

ওরা রাতে ওকে জেরা করলো, ওকে বরফের মতো ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে রাখলে, প্রায় অন্ধ করে দিলে, স্তন পুড়িয়ে দিলে স্যাঁকা দিয়ে। কিন্তু তবুও আনা চুপ। ধৈর্য হারিয়ে শিলার এবার চেঁচিয়ে উঠলো,

মাথাটা কেটে ফেলব এই চাও নাকি!

আনার উত্তর এল, হঁ্যা।

নিজের পরিচয় সে দিলে না: হয়তো ওর বাবা এখনো জীবিত... সুভাজ (স্পেনবাসী জোস গোমেজের নাম) পারীর শ্রমিক নিক, ছাত্র

রো'বার্ট যে যাদোকে দলে আনে, তারা সবাই আনার সঙ্গে একই ফাঁদে ধরা পড়লো। সিলের তাদের পরস্পরকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিলে। কেউ একটা খবর দিলে না। আনার উপর যখন অত্যাচার করা হচ্ছিল, সে হয় চুপ করে ছিল, অথবা কি করে স্পেনে লড়েছিল তারই কথা অসংলগ্নভাবে বলে যাচ্ছিল, নাৎসীদের প্রতি তার ঘৃণাও তখন ব্যক্ত হচ্ছিল। যখন সে বুঝতে পারলো তার প্রতিরোধ শক্তি কমে আসছে তখন সে টেনে টেনে বলতে লাগলো! স্তা-লি-ন গ্রাদ! স্তা-লিন-গ্রাদ!

এবার ওরা তাকে ছেড়ে আর একজনকে ধরলো। কর্ণেল বার্লিনে জানালেন—তিনি কি বন্দী জার্মান মেয়েটিকে জার্মানীতে পাঠাবেন, অথবা এসব ক্ষেত্রে না হয় তাই হবে?

আস্তে আস্তে চেতনা ফিরে এল আমার, কি ঘটেছিল সে কথা সে ভাবতে লাগলো (তার গতিবিধির উপর কি নজর রাখা হয়েছিল, অথবা কেউ কি তাকে ধরিয়ে দিল? জেক কি পালাতে পেরেছে?)—সব কিছুই তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে তার মনে ছেলেবেলার স্মৃতির সঙ্গে। এ যেন বছর আর মুখের সারের মিছিল। হয়তো জেরার সময়েই তার মনে হয়েছিল, সে নিজের পরিচয় দেবে না, তাহলে তারা তার বাবাকে অকথ্য নির্যাতন করে মেরে ফেলবে—আর সেই দৃঢ়তা থেকেই দেখা দিয়েছিল বিগত দিনের স্মৃতি। মার মাথায় রুমাল বাঁধা, মনেক্কার ঝুড়ি নিয়ে চলেছেন; বাবা, ধর্মোপদেশ দিচ্ছেন, মাঝে মাঝে নাক রগড়াচ্ছেন, সিল্কের রুমাল থেকে নস্যি ঝেড়ে ফেলছেন....বাবা-মার কথা থেকে এবার সাথীদের কথা তার মনে পড়লো। আমি ট্যাঙ্কের খবরটা বার করতে পারি নি, অথচ জেক আমাকে বিশেষ করে বলেছিল, আমি যেন খবরটা জেনে নেবার চেষ্টা করি। যদি জেক্ গ্রেফতার হয়ে থাকে? সব কাজের ভারই এখন তার উপর....গ্রীষ্মকাল থেকেই ও রোগা হ'য়ে যাচ্ছে—আল্‌সার নাকি হয়েছে পেটে, এখন ওরা যে জীবন কাটাচ্ছে তাতে খাবার

সম্বন্ধে নিয়ম পালন করা চলে না।....ওরা স্থ্যাভের আসল নাম জেনেছে, স্পেনে জানাতে পারে। ওর পরিবার আছে সেখানে। সে একখানা ফটো দেখিয়েছিল—ভারি সুন্দর একটি ছেলে...আবার তার সেই ছোট্ট শহরের ছবি ভেসে এল চোখের সুমুখে। এখানে তার জন্ম হয়েছিল। স্কোয়ারে পুরাণো সেই ঝরণাটায় এক পরীর মুখ থেকে ঝরে পড়ছে রুপোলি জলের ধারা, ছুটো লাইম গাছ; ফলের দোকান, গ্রীষ্মে চেরি, খেজুর, জাম সেখানে বিক্রি হোত; মনোহারী দোকানও ছিল—আনা দোকানের শো-কেসের দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তাকিয়ে থাকতো। কি দেখতো সে? রঙিন কার্ড, চামড়ার ব্যাগ, পেন্সিলের কেস। শহরের চারদিকে সবুজ টীলা। একটা টীলার উপরে কেক আর পেষ্ট্রির দোকান, একটা দূরবীণ ছিল সেখানে—তারই সাহায্যে দূরের রাইনের রেখা আঙুর বাগিচা আর পুরানো দিনের ছুর্গের এক ধ্বংসাবশেষ দেখা যেত।

হাইনরিখের সঙ্গে ঐ টীলার উপর সে বহুদিন উঠেছে। হাইনরিখ চোখে খুব কমই দেখতো, কিন্তু নিজের উপর তার পুরোপুরি বিশ্বাস। কিন্তু চশমা খুলে ফেললে ওকে ভারি অসহায় দেখাত। একেবারে ছেলেমানুষটি যেন। দূরের নদীর রেখার দিকে চেয়ে থাকতো হাইনরিখ। প্রথম মহাযুদ্ধ যে বছর শুরু হয়, সেই বছরেই ওর জন্ম। যুদ্ধের কথা শুনেছে ওর পড়ার বই আর বাবা-মা যা বলতেন তা থেকে শুনে। তার বাবা প্রায়ই বলতেন, সেবার আমরা হেরেছি, আবার আমাদের লড়তে হবে... সে বহুবার হাইনরিখকে উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞেস করেছে, আবার কি লড়তে হবে—তোমাকেও? সে উত্তর দিয়েছে হ্যাঁ, তবে ফরাসী নয়, নাৎসীদের বিরুদ্ধে। সে বুঝতে পারেনি তবু মাথা নেড়েছে—তার সব চেয়ে ভয় হয়েছে, হাইনরিখ হয়তো তাকে বাজে মেয়েই ভাবলো। তার বয়স তখন আঠারো বছর....হাইনরিখ তার চশমা খুলে হঠাৎ একদিন জিজ্ঞেস ক'রে বসলো, তুমি কি হাইনেকে ভালবাস? তাঁর একটি কবিতা আছে। সে কবিতা

এমন এক কাহিনী নিয়ে লেখা যা পুরাণো হলেও চির নতুন....শুনবে সে কবিতা ঃ

ভেবেছিলাম চলে যাব শীগগিরই
কিন্তু তবু তো আছি—
ভাবছি তোমার সঙ্গে
আমার দেখা হবে কি হবে না......

দু'মাস পরে ওদের বিয়ে হোলো। এক বছর ওরা এক সঙ্গে কাটালো তারপর ক্ষমতা পেল নাৎসারা।...স্কোয়ারের পরীর মুখওলা ঝরণার ধারে তরুণরা গান গাইলে সারা রাত ধরে। তাদের মধ্যে ছিল আনার খেলার সাথীরা। সে তাদের দেখেনি, সে ছিল হামবুর্গে। হাইনারিখ বললে, এবার এসেছে··আড়ালে লুকোবার পালা। সে কি বললে, তখন আনা বুঝতে পারেনি, তবে এইটুকু বুঝেছিল ঃ তার সুখের দিন শেষ হয়ে গেছে।

তার বাবা ধর্ম যাজক, তবু আনার মনে হয়েছে, তিনি বুঝি ভগবানে বিশ্বাস করেন না। তাঁকে একদিন আনা একথা বলেছিল। তিনি উত্তর দিলেন, বাইবেল আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবে। তাঁর মতে ভগবান মহান শাস্ত্রকার, তিনি বহুদিন গত হয়েছেন, কিন্তু তিনি মানুষকে জীবন যাত্রার নিয়ম কানুন দিয়ে গেছেন। হয়তো সেই জন্যেই হাইনরিখকে তার মা যখন আশ্রয় দেন, তিনি আপত্তি করেননি। যদিও তাঁর মতে কমিউনিষ্টরা জার্মানীর শত্রু। তিনি ইহুদিদেরও ঘৃণাভরে অর্ধ-বিশ্বাসী বলতেন।

...

উনিশ শো পঁয়ত্রিশ সাল.......এখন তো বুঝতে পারি হাইনরিখ কি জীবন কাটাছিল। তখন বুঝেছি বলে ভাবতাম, কিন্তু বুঝতে হলে যে তার ভিতর দিয়ে শুদ্ধি হয়ে আসতে হবে। যখন প্রথম প্রেমে পড়েছিলাম, তখনকার দিন যেন ফিরে পেলাম।···আবার যেন তেমনি করেই পরিচয় হোলো।

আনা কখনো কখনো নিজেকে ভৎর্সনা করত: কি ভাবপ্রবণ মেয়ে আমি, একেবারে খাঁটি জার্মান। তার ভয় হোত, এই ভাবপ্রবণতাই হয়তো লড়াইয়ে বাধা জন্মাবে! কিন্তু এখন আর সেদিন নেই। সে এখন আত্মস্থ।

এক এক সময়ে সে কাঁদেও। তখন যে হাইনরিখ বা তার ছেলেবেলার কথা ভাবে না, ভাবে না আসন্ন মৃত্যুর কথা। সে স্রোত সে এতদিন লুকিয়ে রেখেছিল নিজের মনের গভীরে, সেই কোমলতার স্রোতে সে ভাসিয়ে দেয় নিজেকে।—

হঠাৎ স্পেনের দৃশ্য ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে, লালচে আর গোলাপী পাহাড়, ঠুটো পাহাড়—গ্রীষ্মের গরম, উজ্জল হলদে নদীর রেখা—এব্রো সে নদীর নাম। সমাপ্তির ঠিক আগের কথা; শেষবারের মতো অর্ধমৃত স্পেন জেগে উঠতে চেয়েছিল, ভাঙতে চেয়েছিল শত্রুর ব্যূহ। সারা দিন রাত ধরে ফ্যাসিষ্টরা বোমা ফেললো নদীর তীরে। কিন্তু তবু টিঁকে রইল মানুষ। তারা তখন জানে, আর আশা নেই। আনার মনে পড়লো, কেমন করে এক চাষী এসে তাকে ধরে বসলো, তাকে পল্টনে ভরতি করে নিতে হবে। কেউ বুঝতে পারলেনা, কেন সে একথা বলছে। দু'বছর ধরে সে তার বাড়িতে কাটিয়ে দিলে, এখন যখন যুদ্ধে হার হয়ে গেছে, তখন এসেছে পল্টনে যোগ দিতে। কিন্তু চাষী বুঝিয়ে বললে: আমার গাঁয়ে পাদ্রী হচ্ছেন কর্তা, তাই কেউ লড়তে যায়নি। এখন তো সবাই বলতে লেগেছে ফ্যাসিষ্টরা জিতছে....তাদের এবার জানিয়ে দেব আমার গাঁয়েও লোক আছে বাপু....সে এব্রোর পাড়ে মারা গেল......

যখন সে স্পেনে, বাবা চিঠি লিখে জানাতেন, তিনি বেঁচে আছেন, আর মেয়েকে আগের মতোই ভালবাসেন; কিন্তু তারপর থেকে তার কোনো খোঁজ-খবর নেই, হয়তো মারাই গেছেন, হয়তো বা নাৎসীও হতে পারেন—আশ্চর্য কি! সবাই তো ওখানে এখন পাগল ....

চারজনের বিচার হোলো: জোস গোমেজ (সুভাজ) ইভে ম্যুনিয়ে

(রোবার্ত) জাঁ ভালেঁ (নিক) আর মারী নিয়েলহাউস—যে বলেছিল সে কোলমার-এর বাসিন্দে। বিচারকের দল আদালত ঘরে আসবার আগে নিক কোনো রকমে তার সাথীদের জানিয়ে দিয়েছিল: জেকে কোন উপায়ে পালিয়ে গেছে। বাইয়ের খবরও ভাল—স্তালিনগ্রাদ এখনও টিকে আছে···এমন সাদা মাটা ভাবে বললে খবর, আনা শান্ত হল। আবার তাহলে তারা এক সঙ্গে জড়ো হতে পারলো—এই আদালত ঘরে···আগে তো কখনো পরস্পরের সঙ্গে বেশি কথা হয়নি; বলবার ফুরসৎও ছিল না। শুধু মাঝে সুভাজ-এর সঙ্গে সে স্পেনের স্মৃতির রোমন্থন করেছে; সুভাজ-এর মন ছুঁয়ে গেছে তার কথা; এখনো তাহলে আনা ভোলেনি স্পানিস শব্দগুলি। সে বলেছে, আর কি সেখানে যেতে পারব না? উত্তর দিয়েছে আনা: 'হাঁ, পারবে বইকি। আমিও পারব। আমরা যাব পের্তো দেল সল-এ, খুব গরম লাগবে, গোলমালের স্রোত বইবে চারদিকে, আর বইবে আনন্দের ঢেউ···একদিন রবার্ট তাকে বললে: নিজের জন্য আমি কিছুই চাইনা। কিন্তু লুসি আছে। তাকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে।'...নিক্ স্বীকার করলে, তার বয়েস মোটে উনিশ; সে তুচ্ছ ঘটনার কথা বলতে ভালবাসে। সে বললে, সে পুলিশগুলোকে নিয়ে কেমন তামাসা করত, কি করে সে ধরতো মাছ—এক একটা মাছ—এই এতো বড়'···নিজেদের ওরা জানেনা, চেনেনা, কিন্তু তবু ওরা ব্যক্তিগত আনন্দ ও দুঃখ থেকে অনেক বড় বন্ধনে ধরা পড়েছিল, তাইতো তারা মিলেছে এক সঙ্গে। তারা জানে, কিছু তাদের ভাঙতে পারেনি, পারবেও না। তারা বিচারপতিদের দিকে তাকালে কঠোর দৃষ্টিতে—তারাই তখন যেন বিজেতা।

রায় যখন দেওয়া হোলো, তারা অচল-অটল রইল; শুনলো এই তো তারা আশা করেছিল। নিক সুভাজ-এর কানে কানে কি বললে: ওরা নিজেদের খুব ভারিক্কী বলে ভাবছে, আজ থেকে এক বছর পরে ওদের আমি দেখতে চাই'...আদালত ঘর থেকে ওদের যখন বার করে

আনা হোলো, রোবার্ত মুহূর্তের জন্য এসে পড়লো আনার পাশে। আনা তার হাতকড়া-আঁটা হাত তুলে বললে, বিদায় রোবার্ত, আমি তোমাকে জড়িয়ে ধরতে তো আর পারব না..........

আনা, শোন···তোমাকে আমি একজন ফরাসী মানুষ হিসাবে, কমিউনিষ্ট হিসাবে, বলছি—তুমি যে আমাদের সাথী—এতো ভালই হয়েছে। আর আছে স্বভাজ, আর স্তালিনগ্রাদের রুশরা, আনা, বিদায়।

আনা আর অন্ধকার ডিগ্‌রীতে বসে যেন শুনতে পেত তার এই কথা-গুলি, পরেও তো সে বুঝি শুনতে পেয়েছিল—সেই যখন ওরা এল ওকে নিয়ে যেতে। তার শেষ মুহূর্তগুলিকে আলোয় আলো করে দিয়ে গেল কথাগুলি। সে ভাবলে, আমরা গাইতাম 'আন্তর্জাতিক সঙ্গীত, কিন্তু এই কথা ক'টা তো তারই সামিল...ভোলগা থেকে যেন ভেসে আসছে কথা··· বাবা বাইবেলের স্বর্গের কথা বলতেন, যেন সবুজ, এক বাগিচা। কিন্তু সে স্বর্গ হারিয়ে গেছে, আমি পেয়েছি আর এক স্বর্গ...চোখ বাঁধতে দিতে সে রাজি হোল না, কিন্তু ওরা তবু বেঁধে দিলে—অফিসারটি ভাবলে, আনা তার দিকে বেপরোয়া ভাবে তাকিয়ে আছে। কিন্তু সে তাকিয়ে রইলো বৃষ্টি-ধোয়া স্কোয়ারের দিকে দীর্ঘ গাছের দিকে—আর সে যে স্বর্গ পেয়েছিল তার দিকে।

তেরো

লড়াইয়ের আগে ক্রিষ্টাইন ষ্টাউব একটা দোকানের জন্য বাড়িতে বসে নানা জিনিস বোনার কাজ করত, বাপের খপরদারী করবার ভারও ছিল তার উপর। তার বাবা ছিলেন সরকারী কর্মচারী, তখন তিনি পক্ষাঘাতে পঙ্গু। তার বয়েস ছত্রিশ বছর হয়ে গেছে। তাই বিয়ের চিন্তাও আর করে না, তবে সে যে কুশ্রী একথাও বলা যায় না। দশ বছর আগে জিমার

বলে এক কেরাণীর সঙ্গে সে প্রেমে পড়েছিল। সে তাকে নিয়ে যেত সিনেমায় আর পেসিট্রর দোকানে। তার বাবা যখন তার পাণিপ্রার্থীর কথা শুনলেন, তিনি তো খেপে গেলেন; জানিয়ে দিলেন, সে তার কর্তব্যে অবহেলা করছে। এমন একটা ব্যাপারের আগে তার ভাল করে সবকিছু খতিয়ে দেখা উচিত; তিনি অবশ্য তাকে বাধা দিতে পারেন না, তিনি অসুস্থ, বৃদ্ধ, কিন্তু তিনি তাকে এক কানাকড়িও দেবেন না। ক্রিষ্টাইন জিমারের সঙ্গে দেখা করলো; তার চোখ কেঁদে কেঁদে ফুলে উঠেছে। সে বললে, গুস্তাভ, আমি সব কিছুর জন্যেই তৈরী। এই মুহূর্তেই আমি বিয়ে করে ফেলতে চাই……কিন্তু বাবা বিরুদ্ধে। বাড়িটা তার নামে, আমি যদিও ভালই রোজগার করি, কিন্তু তাছাড়া তো আমার আর সম্বল নেই……গুস্তাব উত্তর দিলে, আমি জড়বাদী নই। তোমার পণের টাকা না থাকলেও আমি তোমাকে ভালবাসি।……সে এবার চলে গেল, তার বাড়তি খাটানি আছে আপিসে। ক্রিষ্টাইন আর তাকে দেখেনি। তার বুকখানা শুকিয়ে কঠিন হয়ে গেছে, এ তো এক টুকরো রুটি, কাটা হয়েছিল, কিন্তু খাওয়া হয়নি। মাঝে মাঝে সে কেঁদেছে—বাবা যখন মারা যাবেন, তখন তো আমি একা থাকব। কখনো বা অস্পষ্ট অসংলগ্ন স্বপ্ন দেখেছে—উনি যখন মারা যাবেন, আমি বাড়িটা বিক্রি করে ফেলব, তারপর করব বিয়ে। চল্লিশ বছরেও স্বামী মিলবে।

অবশেষে তার বাবা মারা গেল; কিন্তু সেটা ঘটলো উনিশ শো বিয়াল্লিশের মার্চ মাসে। বাড়ি বিক্রি করা তখন অসম্ভব—ইংরেজদের বিমান হানার পরে রেলওয়ের এলাকা খালি হয়ে গেল তার বিয়ের স্বপ্নও ছাড়তে হোলো—তখন বিশ বছরের সুন্দরীরাও প্রেমিক পাচ্ছেনা; আর টর্ক পাখী-আঁকা ড্রেসিং-গাউন, ফুল আঁকা টেবিল-ক্লথের আর তখন খদ্দের মেলে না। ক্রিষ্টাইন এবার রাশিয়ায় থেকে নিয়ে আসা মেয়েদের ব্যারাক তদারক করবার ভার নিলে। হের্ কারকফ তাকে বললেন, দেখ, এরা কোনো দোষ করেনি। আমরা

এদের শুধু এই জন্যেই আটক রেখেছি যে, ওদের অভ্যাস আমাদের থেকে আলাদা। তুমি একটু কড়া হবে, কিন্তু মনে রেখো রুশরা ছেলেমানুষেরই শামিল।.........

ক্রিষ্টাইনের স্বভাবটা খারাপ নয়। যখন প্রথমে সে নীল চোখওয়ালী ভারিয়ার মুখে থাপপড় কষালে, তার বিবেক তাকে দংশন করেছিল: হয়তো কাজটা খারাপই হয়ে থাকবে? কিন্তু একটু ভাবতেই সে শান্ত হ'য়ে গেল। হের্ কারকফ বলেছেন, রুশরা ছোট ছেলেমেয়ের সামিল, তাদের তো শাস্তি দেয়াই উচিত। আমি যখন বেড়ালের লেজ ধরে টেনেছি বা কিছু ভেঙেছি, বাবা তো আমাকে বেশ জোরেই চড় মারতেন। সে প্রায়ই যে, তরুণী আর সুশ্রী মেয়েদের শাস্তি দিত, একথা সে বুঝতো না। কাস্নার শিবিরের ডাক্তার, ষোলো বছরের সুরোচকা সম্বন্ধে তিনি বলতেন: ও যেন মোরিলোর ছবি···একদিন ক্রিষ্টাইন সুরোচকাকে তল্লাস করে দু-টুকরো সাবান পেলে। কোথায় পেলে? সুরোচকা নীরব। ক্রিষ্টাইন চুরির অপবাদ দিয়ে তাকে থাপ্পড় মারলো। ওরা বাচ্চা! ক্রিষ্টাইন ভাবলে, যাদের সে তত্ত্বাবধান করে, তাদের সে ভালবাসতে সুরু করেছে। খবরের কাগজে যে রকম খারাপ ওদের বলা হয়, তা ঠিক নয়, তাছাড়া কি চমৎকার ওরা গান গায়!

ওরা উপবাসী, অতিরিক্ত খাটুনি খাটে, তবু এই দুর্ভাগা জীবনকে এক মুহূর্ত ভুলে থাকবার জন্যে মাঝে মাঝে গান গায়, গানে ঝরে পড়ে গৃহের কামনা, মা'র কামনা, প্রিয়ার কামনা। ক্রিষ্টাইন জানে সে ব্যারাকে ঢুকলেই গান বন্ধ হয়ে যাবে। সে তাই চোরের মতো জানালার কাছে গিয়ে শোনে। নিজেকে সে কল্পনা করে এক অন্ধকার বদ্ধ ঘরে—ওষুধের শিশিগুলো ছড়িয়ে আছে, পিসীর বিবর্ণ ফটো, আরাম কেদারায় রুগ্ন বৃদ্ধ আর কোথায় কোন সুদূরে সুশ্রী গুস্তাভ আর একটি মেয়েকে জড়িয়ে ধরেছে, তাদের চারদিক জেসমিনের সুগন্ধ···ক্রিষ্টাইন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে! হা ভগবান, আমি কি দুঃখী!···

মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল গান গায় গ্যোলোচ্কা। বহুদিন আগে তার পিকিউইক সঙ্ঘের বন্ধুরা বলত, এস, এস, হাসিখুসি মেয়ে, গান গাও! সে ছিল তখন সুখী, কিন্তু সে তখন গাইত দুঃখময় প্রেমের গান। এখানে কিন্তু সে গাইতে ভালবাসে আনন্দের চঞ্চল গান। ক্রিষ্টাইন এতে বিরক্ত হয়, ছুঁড়িটার এত ফূর্তি কেন? তার স্বর মিষ্টি, কিন্তু যত গান গায় সব অশ্লীল, তাতে এমন কিছু নেই যা মনকে উন্নত করে দেবে... কিন্তু তবু ক্রিষ্টাইন শোনে, মাঝে মাঝে পা দিয়ে তালও ঠোকে। যখন গুষ্টাভের সঙ্গে নাচতে যেত তখন অমনি করতো।

গ্যালোচ্কা তার কমিউনিষ্ট যুব-সঙ্ঘের সভ্যদের খুঁজে পায়নি কিয়েভে, সে ভেবেছিল, যখন ঠাণ্ডাটা কমবে আমাদের সৈন্যেরা এসে দেখা দে'বে' কিন্তু সেই ভয়াবহ গ্রীষ্ম এল, জার্মানরা তখন ভোলগা পর্যন্ত এসে গেছে। ষ্টেসেঙ্কোর সঙ্গে একদিন তার পথে দেখা। তাঁর দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপ করেই তিনি বললেন, কিগো এখনো আছো? ভালিয়া শীগ্গিরই আসবে, আর তিন মাসের বেশি আমাদের লাল ভায়ারা টিকে থাকতে পারছেন না...... সমস্ত কিয়েভ তখন হতবাক্, গেষ্টাপো আর পুলিশ ঘোরাফেরা করছে, কেউ অসাবধানে একটা কথা বলে ফেললে তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, আর তার পাত্তাও মিলছে না। প্রাচীরপত্র পড়েছে সর্বত্র, তরুণ-তরুণীদের জার্মানীতে যাবার জন্য ডাকছে—তারা গৃহের আরাম পাবে, পাবে খাদ্য আর ভাল পোষাক। বসন্তে কয়েক শোকে ফুসলে নিয়ে গেল জার্মানরা। কাস্না গ্যোলোচ্কার সঙ্গে পড়ত দশম শ্রেণীতে, সে সই করে এল। বললে, বিদেশ কিরকম আমি দেখতে চাই। গ্যালোচ্কা তাকে ফেরাতে চেষ্টা করলে। বিদেশ? এতো বিদেশ নয়, এ যে যাবজ্জীবন ক্রীতদাস হওয়া ...ধর, ওরা যদি তোমাকে গুলি-বারুদ তৈরি করতে দেয়? তোমার ভাই আছে পল্টনে, তার মানে তুমি তো তাকে খুন করবে—তাই না? কাস্না জবাব দিলে, তুমি বুদ্ধিমান হবার চেষ্টা করছ গ্যোলোচ্কা। কিন্তু

যা-ই বলো, আমি বিদেশ যাবই, নতুন পোষাক আমার চাই। জার্মানরা যখন দেখলে মাত্র কয়েকজন স্বেচ্ছায় নাম লেখলে, এবার তারা জোর জুলুম করতে লাগলো। গ্যোলোচ্কা তাদের হাতে পড়লো।

একটু-আধটু রুশ ভাষা বলতে পারে এমনি একজন ননকমব্যাটাণ্ট চেয়ে চেয়ে দেখছিল মেয়েদের দিকে, তারা কাঁদছে। সে তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললে, জার্মানরা ভাল, জার্মানরা খুন করে না। গ্যোলোচ্কা শুনে হেসে উঠলো, তারপর বলে ফেললো, ওগো বুড়ি ঠাকুমা, তোমার দাঁতগুলো মস্ত বড়। নন-কমব্যাটাণ্ট বুঝতে পারলে না, কিন্তু গ্যোলোচ্কার হাসিতে সে বিরক্ত হল। সে গালাগাল দিতে দিতে গাড়ির কাছ থেকে সরে গেল। যে সব মেয়েরা গ্যোলোচ্কার চারপাশে দাঁড়িয়েছিল, তারা হেসে উঠলো। গ্যোলোচ্কার হাসি যেন তাদের সংক্রামিত করেছে। ওরা ভাবতেও পারলো না যে, এ হাসি জোর করে টেনে আনা। কিন্তু গ্যোলোচ্কা আগেই ভেবে রেখেছিল ঃ মনে মনে সংকল্প করেছিল—এখন আমাদের মনের ফূর্তি জীইয়ে রাখতে হবে—এতে আমাদের মনের শক্তি বাড়বে, আর জার্মান-গুলোও ক্ষেপে যাবে""তাই সেই 'হাসিখুসি' মেয়ের আবার হলো আবির্ভাব।

খুব ভোরে ওদের একটা সহরের ভিতর দিয়ে কারখানায় নিয়ে যাওয়া হোলো। ছোট শহর, ভারি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। নাপিতের দোকানের দরজায় পিতলের ফলকগুলি ঝক্ঝক্ করছে, চীনা-মাটির মুখ ধোবার পাত্র আর রান্নার সরঞ্জাম দোকানের শো-কেসে ঝলমলিয়ে উঠছে। ছেলেমেয়েদের পরণে পরিচ্ছন্ন পোষাক, তারা ছুটে চলে না, ধীরে ধীরে তারা চলেছে স্কুলে। সসেজ আর কষাইয়ের দোকানে কালো কুত্তাগুলো শিকলে বাঁধা রয়েছে। তারা চুপ করে বসে আছে—তাদের মণিবানী কখন খাবার দেবে সেইজন্যে। বাজারে মেয়েরা বিক্রি করছে ফুল—ঋতুর শেষ আষ্টারের গোছা। গ্যোলোচ্কার সব দেখে শুনে মনে পড়লো ক্রেশচাতিকের ধ্বংসাবশেষের

কথা। লিওনিয়া খুড়ো আর যাদের ফাঁসি ঝোলানো হয়েছিল তাদের মুখ ভেসে উঠলো। এখনো সে চোখ চেয়ে দে'খছে শিশুদের ঠেলা গাড়ি, বেণী রিবন দিয়ে বাঁধা, খেলনার দোকান, পরিচ্ছন্ন লন······কি অবাক লাগে, ওদের মত লোকেরও আছে স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ; একজন গেষ্টাপোর স্ত্রী বাজার করে, কেনে আপেল আর পিয়ার, নিজের সন্তানের নাকের পোঁটা মুছে দেয়······ওরা যদি আঁচড়াত-কামড়াত তা'হলেই তো মানাত ভাল !······

গ্যোলোচ্কা স্কুলে জার্মান ভাষা শিখেছিল ; সে তাই শীগ্গিরই ক্রিষ্টাইনের গালাগালের মানে বুঝে ফেললে ; কারখানার ফোরম্যানের হুম্কী আর আর ব্যারাকে ফেরবার পথে শহরের বাসিন্দেরা কি মন্তব্য করে তাও তার এখন জানা। তারা বলে ইস্ কি নোংরা।···কার্ল তো লিখেছে, রুশরা নিগ্রোদের চেয়েও ঘৃণ্য···খাদা নাক···গাট্টাগোট্টা, ওদের বন্দী শিবিরে রাখাইত ভাল······আমি বাপু ওদের একটাকে এনে আমার বাড়ীতে ঠাঁই দিতে রাজি নই।···কিন্তু ফ্রাউ জেনিক একটা রুশ মেয়ে রেখেছেন, তিনি তার কাজে খুব খুশি...গ্যোলোচ্কা হেসে ভারিয়াকে বললে, দেখ দেখ—নাক, মুখ, চিবুক সব যেন ওদের হরফগুলোর মতোই বাঁকাচোরা ···ভারিয়াও হেসে উঠলো।

স্থপ ওদের খাবার, খিদের জ্বালা সবসময়েই লেগে থাকে, পেট জ্বলে যায়। মেহনতিও খুব। ওদের লোহার টুকরো, সিমেন্টের বস্তা কাঁধে নিয়ে চলতে হয়, ফার্ণেস সাফ করতে হয়। ক্রিষ্টিনা তার ছেলেমেয়েদের ভাল-ভাবে লালন পালন করবার জন্যে আবার রোজ এক একজনকে ধরে শাস্তি দেয়, তাতে রাতের খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়, সে ফেটিগ খাটে—কাজের পরে বোমার খাত খোঁড়ে—আর কাজ না হলে থাপ্পড় মারে। গ্যোলোচ্কাকে শুধু সে শাস্তি দেয় নি, হয়তো তার গলার স্বর ভালবাসে—তাই হয়তো আমার 'নাইটিঙ্গেল' বলে ডাকে। সে ডাঃ কাস্নারকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, বা ভয়ই পায়। সে যখনই কোন মেয়েকে শাস্তি দেয়, গ্যোলোচ্কা এমন কটমট

করে তাকায় যে যে ক্রিষ্টাইণের মনে হয়, নাইটিঙ্গেলটা তার চোখ ঠুকরে উপড়ে নিতে পারে।

ক্রিষ্টাইণ মেয়েদের জার্মানদের রুশ-ভাষায় বার করা খবরের কাগজ পড়তে দেয়। এই খবরের কাগজ থেকে কিছুই জানা সম্ভব নয়। এ কাগজ পড়ে মনে হয়, জার্মানরা সর্বত্র জয়ী হচ্ছে, কিন্তু তবুও চলেছে যুদ্ধ—চলেছে। গ্যোলোচ্কার মতো যাদের মনের জোর আছে তারা পড়ে একটা কথাও বিশ্বাস করে না। তাদের বিশ্বাস, জার্মানরা শীতে নিকেশ যাবে, তারা আবার ফিরবে তাদের বাড়ীতে; কিন্তু যারা দুর্বল, যুদ্ধঅঞ্চল থেকে দূরে এই শহরের শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা—দোকানের জানলায় রকমারি জিনিষপত্র আর আত্মতুষ্ট, হৃষ্টপুষ্ট জার্মান স্ত্রীলোক দেখে আর বলে, না, আমাদের মানুষরা ওদের হারাতে পারবে না!...গ্যোলোচ্কা এবার কল্পনার রাশ আলগা করে দেয়; জার্মানরা রোস্তভের কাছে হেরেছে, ফ্রান্সে নেমেছে মিত্রশক্তি; গুজব শোনা যাচ্ছে হিটলারকে কে খুন করেছে........গ্যোলোচ্কা জানে যে, হতাশ হলে তাদের চলবে না।

যে কারখানায় তারা কাজ করে সেখানে ক'জন ফরাসী যুদ্ধবন্দী আছে। প্রথমে মেয়েরা আলাদা হয়ে থাকত। কি ভাবে ঐ ফরাসীরা কে জানে! হয়তো একটু বেশি দেমাকী; তাছাড়া কথা বলতে গেলেই বা কি—ওদের ভাষা তো বুঝবে না। ফরাসীরা মেয়েদের দিকে বন্ধুভাবে তাকিয়ে হাসে, জার্মান ভাষায় কথা কয়। তারা সবাই কামেরাদেন, (একথাটা সবাই বোঝে) একথা বলে, রুটি, পনীর, চকোলেট বিলোয়—বাড়ি থেকে আসে এসব উপহার।

গ্যোলোচ্কার একজন আমুদে ফরাসী যুবকের সঙ্গে খুব ভাব জমে গেছে। সে ওকে বলেছে, সে এক ডাক্তারের ছেলে, নিজে ছিল পদার্থ-বিজ্ঞানের ছাত্র। তারা এক অদ্ভুত খিচুড়ি ভাষায় কথা বলে, জার্মান, রুশ আর ফরাসী ভাষা তাতে মেশানো। টুকরো-টুকরা আলাপ, কিন্তু

তাতেই একে অন্যের মনের কথা জেনে ফেলেছে। গ্যোলোচ্‌কা পারীর স্পষ্ট ছবি ফুটিয়ে তোলে কথায়, মনে হয় যেন সে ওখানে ছিল। বিরাট বাগিচা, পথ বেরিয়েছে তারই পাশ দিয়ে, পথের পাশে পাশে টেবিল পাতা, সেখানে বসে মানুষ কাফি পান করতে পারে। বাদাম গাছের সারও আছে, ঠিক কিয়েভ-এর মতো। পিয়ের তখন সবে পরীক্ষা পাশ ক'রেছে। সে আর তার সহপাঠিরা বেড়াচ্ছিল পথে, গান গাইছিল, চেঁচাচ্ছিল—ভারি ফূর্তির ব্যাপার.........আর পিয়ের শুনেছে, কিয়েভ শ্যামল, কিয়েভ পার্বত্য শহর ; ভ্‌লাদিমির পাহাড় থেকে যখন নিপারের দিকে তাকাও, তখন এত সুন্দর দেখায় যে, তখন মরে যেতে ইচ্ছে হয়। গ্যোলোচ্‌কা প্রায়ই অপেরায় যেত। সে ভালবাসত 'ইস্কাবনের বিবি' (পুশকিনের একটি গল্প, অপেরায় অভিনীত) আর কারমেন (মেরিমীর গল্প অপেরায় অভিনীত)...সে শুনে খুশিই হোলো, পিয়ের পড়েছে 'পিকউইক পেপার্স'। শুধু একটা তার আফশোষ রইল, সে যে হাসিখুশি মেয়ে—এ পরিচয় সে দিতে পারল না পিয়েরের কাছে।... কিন্তু সে পিয়েরকে বললে ভালিয়া রায়া আর বোরিয়ার কথা। 'হাঁ, আমার দেশে প্রতিরোধ-যোদ্ধার অভাব নেই। ওরা কিয়েভ-এও ফ্রিৎসদের ধরে ধরে খুন করতে শুরু করেছে।......পিয়ের তাকে বললে, ফ্রান্সেও প্রতিরোধ-যোদ্ধা ছিল, লড়েছেও তারা বেশ ; কিন্তু শুরুতে বড় বেশি বিশ্বাসঘাতক দেখা দিয়েছিল, তারা পারী আর মেজিনো লাইন শত্রুর হাতে সঁপে দিলে। আর সবার সঙ্গে সেও বন্দী হল। লাল ফৌজের কথাও সে জিজ্ঞেস করলে। গ্যোলোচ্‌কা গর্বভরে উত্তর দিলে : সে তো এক চমৎকার সেনা-বাহিনী। জার্মানরা তো মস্কৌ বা লেনিনগ্রাদ দখল করে নিতে পারেনি, কিয়েভ শীগ্‌গিরই মুক্ত করা হবে।......ইশতেহারে যা পড়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি সে করলে ; অবশ্য তার পরেই এল সেই ভয়ানক গ্রীষ্মকাল—কিন্তু যখন সে পিয়েরের দিকে তাকাত, মনে হোত সবকিছু বদলে গেছে, সত্যিসত্যিই সে বিশ্বাস করত রুশরা এগুচ্ছে।......পিয়ের তাকে যতটা পারে

তাতো নয়ই। ওরা চমৎকার লোক, কিন্তু বড় উড়ন্ত। ওদের একটা কথা আমি বিশ্বাস করি না..... খবরের কাগজে তো লিখেছে, স্তালিনগ্রাদ কবে দখল হয়ে গেছে—সেই আগষ্ট মাসে . ...।

এই সময়ে এল ক্রিষ্টাইন। গ্যোলোচ্কা তার কাছে গিয়ে মৃদুস্বরে বললে, স্তালিনগ্রাদ দখলের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি.........

গ্যোলোচ্কার মুখে হাসি, ক্রিষ্টাইন রেগে গিয়ে গ্যোলোচ্কাকে মেরে বসলো। বার বার মারতে লাগলো.....সত্যিই বিশ্বাস করা যায় না, যে হাতে রেশমের কাপড়ের উপর বোনে প্রজাপতি, সে-ই হাত এত শক্ত! গ্যোলোচ্কা মাটিতে পড়ে গেল। আর ক্রিষ্টাইন, যে কাজে এসেছিল তা ভুলে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি ক্রিষ্টাইন পোষাক ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। কিন্তু ঘুম তো আসে না—গ্যালোচ্কার হাসি-হাসি মুখখানা ভেসে উঠলো চোখের সামনে। কি ঔদ্ধত্য মেয়েটার! তেমন মার দেওয়াও হোলো না।....... ভেবে দেখ দিকি, লড়াই যখন শেষ হবে, ওর মতো বেশ্যার বিয়েও হবে। ওর আছে কি? ওতো শুধু গান গাইতে পারে, গানগুলো আবার অশ্লীল ......কিন্তু আমাকে কেউ বিয়ে করতে চাইবেনা, আমি যদি বাড়িটা বিক্রি করে টাকা জোগাড় করি, তাহলেও না। তাছাড়া, এ লড়াই কি আর থামবে? সারা ইউরোপ আমরা দখল করে বসে আছি, তবু এখনো শেষ হচ্ছে না লড়াই; এই তো অটোর তলব পড়লো, ওর বয়েস তো এখন উনচল্লিশ।.......গত তিন মাস ধরে তো খবরের কাগজে অন্য কোনো খবর নেই—শুধু স্তালিনগ্রাদ আর স্তালিনগ্রাদ। কেন ওরা দখল করতে পারছেনা? আর ঐ ছেনাল মেয়েটা হাসছে . ...অটো বললে, কোলোন তো এখন ধ্বংস স্তূপ। ওরা এখানেও আবার উড়ে আসতে পারে, বাড়িগুলোয় আগুন ধরিয়ে দিতে পারে......তাহলে তো সব সুখের আশাই চলে যাবে! ক্রিষ্টাইন জোরে কেঁদে উঠলো। পাশের ঘরে থাকে আর এক ব্যারাকের

সাহায্য করে; তাকে রুটি, সসেজ, মেধাই দেয়। এমনভাবে তাকায় তার দিকে, যাতে সে আনন্দ পায়—সত্যিই পায়। ভাণ তো নয়, তারপরে তার হাসি বন্ধ হয়ে যায়। গম্ভীর হ'য়ে ওঠে গ্যোলোচ্‌কা, লজ্জায় লাল হয়ে উঠে মুখখানা ঘুরিয়ে নেয়। কখনো বা সবুজ গাছ দেখা যায় আবর্জনার ভিতরে, কারখানার উঠোনে দেখা দেয় গাছ। উনিশ শো বেয়াল্লিশের সেই অভিশপ্ত হেমন্তে এমনি করেই ওদের ভালবাসা জন্ম নেয়। কখনো তারা নিজেদের মনের কামনা ব্যক্ত করেনি পরস্পরকে, কিন্তু তারা যা কিছু বলে সহজ আর সংক্ষিপ্তভাবে, তাই-ই আলাদা অর্থ নিয়ে দেখা দেয়, তার মানেও আলাদা, তার অর্থ তারাই শুধু বোঝে।

একদিন পিয়ের গ্যোলোচ্‌কাকে বললে,

রোজের একজন জার্মান ওখানে কাজ করছে। যখন সবাই চলে যায়, ও বেতার খুলে লণ্ডন কেন্দ্র ধরে। জার্মানরা ঠেলাটা বুঝতে পারছে, একেবারে ঘা পড়েছে আসল জায়গায়—এখনো তোমাদের সেই শহর দখল করতে পারেনি—

কোন শহর?

স্তালিনগ্রাদ।

সন্ধ্যের দিকে মেয়েদের ডেকে বললে গ্যালোচ্‌কা:

জার্মানদের অবস্থা এখন টলমল। স্তালিনগ্রাদ ওরা দখল করতে পারেনি ··

মারুসা খোঁচা দিয়ে বললে, কেন খবরের কাগজে তো বলেছে দখল করেছে। তার ছাপার অক্ষরের উপর অগাধ বিশ্বাস, সে বিশ্বাস করতে চায়না যে ঐ কাগজগুলো জার্মানরা বার করেছে। গ্যোলোচ্‌কাকে সে জিজ্ঞেস করলে, এ খবর তুমি কোথায় পেলে?

ফরাসী ঐ লোকটি আমাকে বলেছে।

মারুসার মুখে বিদ্রূপের হাসি।

লোকে যা বলে তাই বিশ্বাস করে বোসো না, আর ফরাসীরা যা বলে

তত্ত্বাবধানকারিণী। নাম তার এমা। তার স্বামী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ছুটিতে বাড়ি ফিরেছে। পার্টিসনটা পাতলা, তাদের ফিস্‌ফিসানি, অস্ফুট চিৎকার শব্দ ভেসে আসছে। কিন্তু ক্রিষ্টাইন কাঁদছে তো কাঁদছেই। ওপাশের শব্দ থেমে গেল, কিন্তু ক্রিষ্টাইনের ফোঁপানি থামলো না। দেয়ালে কে যেন জোরে টোকা দিলে। এমার স্বামীই হবে। সে চটে গেছে, আমি কেঁদে তাকে ঘুমোতে দিচ্ছি না। ঠিকই, ও যুদ্ধে আছে তিন বছর এই তো স্ত্রীর কাছে ফিরেছে......আমার কাছে কেউ তো আসবে না .. ক্রিষ্টাইন আরো জোরে কেঁদে উঠতে চাইল, কিন্তু তখনি তার উদ্দাম কান্না সে চেপে রাখলে।

ভীত মেয়েরা এসে ভিড় করেছে গ্যোলোচ্‌কার চারপাশে।

ভারিয়া জিজ্ঞেস করলে, কেমন আছ?

খুব খারাপ নয়, তবে একটু লেগেছে। ও রোগা হলে কি হবে, ওর হাত যেন লোহার মতো শক্ত।.........

হঠাৎ গ্যোলোচ্‌কা হেসে উঠলো,

কি, এবার বুঝতে পারছ তো মারুসা? ওরা স্তালিনগ্রাদ দখল করতে পারেনি। তাইতো ও ক্ষেপে গেল।......

ওখানে বেশ মুস্কিলে পড়েছে, তা তো স্পষ্ট বোঝা গেল।......

সে বিজয়ের স্বপ্ন দেখলো—হ্যাঁ স্বপ্ন দেখলো গ্যোলোচ্‌কা। সব নীরব, একেবারে নীরব, পাখীরা গাইছে গান। ভোর হয়েছে। একটা বিরাট নগরে এসে দাঁড়াল গ্যোলোচ্‌কা। বাড়ীর দেওয়ালে দেওয়ালে লাল ঝাণ্ডা উড়ছে। কিন্তু এতো কিয়েভ্‌ নয়...হয়তো মস্কৌ হবে?...স্কোয়ারটি যেন তারার মতো।

লাল ফৌজের সেনারা মার্চ করে চলেছে। বরিয়া না! সে এখন একজন হোমরা-চোমরা কর্মচারী; অনেক সামরিক তকমা আঁটা তার বুকে...পিয়ের দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে। সে হাসছে, সে ওকে

'গ্যোলোচ্‌কা' বলে ডাকতে চায়, কিন্তু 'গালিয়োস্কা' বলে উচ্চারণ করে—ভারি অদ্ভুত শোনায়—ভারি অদ্ভুত

জেগে উঠে ভারিয়া দেখলো—গ্যোলোচ্‌কা তখনো ঘুমে বিভোর ; মুখখানা তার ফোলা, কিন্তু সেই মুখে ফুটে উঠেছে হাসি। ভারিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আপন মনে বললে, আহা, আমি যদি অমন সুখের স্বপ্ন দেখতে পেতাম।......

চৌদ্দ

পাঁচপাঁচি ছোট শহর—গ্রামও বলা যায়। ক'খানা দোতলা বাড়ি আছে, তিনটে যৌথ খামার আছে আশেপাশে। তারই জন্যে শহর গড়ে উঠেছে—জেলার এটি সদর। মুরগী সেভচেস্কো ষ্ট্রীটে চরে বেড়ায়, ডাকে....গ্রীষ্মে রূপোলি গুঁড়োর মতো ধূলো, বসন্তে অসম্ভব কাদা, শেষ হেমন্তেও তাই। কিন্তু শহরে যা থাকবার সবই আছে। একটি জেলা সোবিয়েৎ রয়েছে, সেখানে স্তেয়েতা বপন অভিযানের সংখ্যা সংগ্রহ করে, ভ্রাম্যমান থিয়েটার দল এসে অভিনয় করে যায়। জেলা-পার্টির সম্পাদক গ্রিৎসকো বলেন, এ শহর তো বড় হয়ে উঠলো বলে, এখানে তৈরী হবে এক বাগিচা, সেখানে গবেষণা চলবে। একটা স্কুলও আছে, স্কুলে আছেন শিক্ষয়িত্রী। ক্লাভদিয়া ভাসিলিয়েভ্‌না পড়েন দর্শনের ইতিহাস, আর কিয়েভ থেকে চিঠি আসার আশায় বসে থাকেন। সাদা ছোট ছোট বাড়ি, টক দুধের গন্ধ বেরুচ্ছে, কাগজ মোড়া বোতলের দুধ ; বাড়ির ভিতরে কুমড়ো সেদ্ধ খাচ্ছে মানুষ, পরিবারের পুরানো দিনের স্মৃতি মন্থন করছে, চলছে পৃথিবীর রাজনীতির চর্চা। কিশোর অগ্রগামীর দল লাল গলাবন্ধ পরে চলেছে। বাজারে পাঁচমিশেলি ভিড়। সেখানে প্যাক প্যাক করে ডাকছে হাঁস।

তাদের নিয়তির জন্যে তারা রেগে উঠছে। নম্র ষাঁড় চিবুচ্ছে খড়, এখানে সব জিনিষই কিনতে পাবে, এমন কি প্লাসটিকের ছাইদানিও। একটা কারখানা আছে, আর আছে কুমোরদের সমবায় প্রতিষ্ঠান। ক'জন ইহুদীও আছে এখানে, তাদের মধ্যে থুত্থুড়ে বুড়ো শেনারসন, পঞ্চাশ বছরেরও বেশিদিন ধরে এখানকার বাসিন্দেদের জন্যে পোষাক তৈরী করছে; ট্রাক্টর-চালিয়ে গুস্তাভ, যাতে সবাই তার পদকগুলি দেখতে পায়, তাই সে প্রচণ্ড শীতেও ভেড়ার চামড়ার কোট পরে না। গুস্তাভের বুড়ী ঠাকুরমাও আছেন, তার এক অভ্যেস দাঁড়িয়ে গেছে। তিনি কথায় কথায় বলেন, ভগবান দিয়েছেন, আবার তিনিই কেড়ে নিচ্ছেন।

এবার জার্মানরা এল, সব কিছু বদলে গেল। জিলা-কমিটির সম্পাদক প্রতিরোধ-যোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দিতে জঙ্গলে চলে গেলেন। গুস্তাভ আর সবার মতোই ফৌজে ঢুকলো। সাদা বাড়ীগুলো ভরে উঠলো লাল ফৌজের সৈন্যে। এরা নিজেদের পল্টন থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়েছে—তাদের আত্মীয় বলেই শহরের বাসিন্দেরা পরিচয় দিলে। জার্মানরা শহরের ইহুদীদের ধরে চালান দিলে পাশের শহরে, সেখানে তাদের গুলী করে মেরে ফেলা হল। ক্লাভাদিয়া ভাসিলিয়েভ্নাকেও ওরা চালান দিলে, সে জার্মান উপরওলাকে হেগেল পড়েছে বলে চটিয়ে দিয়েছিল। মানুষ নিজেকে যত পারছে আড়ালে রাখছে, এমন কি মুরগীগুলোও ভয় পেয়ে গেছে। তারাও শেভচেস্কো স্ট্রীটে উঁকি মারতে ভয় পায়। শোনা যায়, প্রতিরোধ-যোদ্ধারা নাকি আশেপাশের বনে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু শহরের কাছে ঘেঁসে না। তবুও জার্মানরা সার্জেন্ট রেকমানের তাঁবে তিরিশজন ফৌজ মোতায়েন রেখেছে, কাঁটা তার দিয়ে ঘিরেছে শহর, তাকে সুরক্ষিত করেছে। প্রথমে জার্মানদের তো ভালই চলছিল, সুসময় তখন তাদের, ডিম ভাজা আর মুরগী ভাজা খাচ্ছে প্লেটে প্লেটে, কমিউনিষ্টদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। এবার এলেন একজন ছোটখাটো নেতা, তিনি এসে হুকুম জারী করলেন, চাষীদের

কাছ থেকে তারা কিছু নিতে পারবে না। জার্মানীর খাদ্যের দরকার, তা'ছাড়া চাষীরাও তখন শিখে গেছে কি করে তাদের সঞ্চিত খাদ্য সামলে রাখতে হয়, তবু যাদের কাছ থেকে বার করা গেল, তাদের গ্রেফ্তার করা হ'ল। প্রতিরোধ-যোদ্ধাদেরও সাহস বাড়তে লাগলো, তারা মোটর-ট্রাক আক্রমণ করতে লাগলো। রাতে জার্মানরা রাইফেল চালিয়ে বাসিন্দেদের ভয় দেখায়, নিজেদের সাহস বাড়ায়। সার্জেন্ট রেকমান তার দলের লোককে বলে—যুদ্ধ তো শীগ্‌গিরই শেষ হয়ে যাবে—শুধু স্তালিনগ্রাদ পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া বাকি ; আর বাকি বাকু দখল।

হেমন্ত এল তার মৃদুতা নিয়ে। সেদিন রোববার, দিনটাও চমৎকার। রেকমান হাঁপিয়ে উঠেছে, হাই তুলছে। অবসর সময়ে কি করবে সে কখনো ভেবে ঠিক করতে পারে না। যুদ্ধের আগে কাজের পরে সে যেত বিয়ার-হলে, সেখানে তর্ক-বিতর্ক করে গলা ভেঙে যেত। তর্কের বিষয় ছিল, মঙ্গলগ্রহে মানুষ আছে কিনা, আর কোথায় ভাল বিয়ার পাওয়া যায়—উলফের পানশালায়, না হাইনৎ-এ। তারপর ঝঁকড়া চুলওয়ালী গার্ডাকে নিয়ে যেত সিনেমায়, পর্দার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতো, আবার মেয়েটাকে টেপাটিপিও করত। কখনো বা যেত আর্কেড-এ, সেখানে হরেক রকমের স্ফূর্তির আকর্ষণ। সে নিজের তাকদ পরখ করতো, বল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতো, কিন্তু যখন টাকা খরচ করতে ইচ্ছে করত না, বা বাইরে যেতে চাইত না, সে বসে বসে বিষম হাই তুলতো, বিড়ালের থাবার নখ কেটে দিত, বা ইলাসট্রিয়েট্রির পুরানো সংখ্যা খুঁজে বার করে, সুন্দরীদের ছবিতে জুড়ে দিত বড় বড় গোঁফ। এই হতাচ্ছাড়া জায়গায় করবার কি আছে?…তার মনে পড়লো, পাচটা ডিম দিয়ে যখন সে ছোট-হাজরী খেয়েছে, তার সঙ্গে এক প্লেট সর। এখন পুরো এক-বেলাও খাওয়া জোটে না।….সে লিজার কাছে যাবে সন্ধ্যেয়। সবগুলো রুশের মতোই লিজাও বুনো—ওর সঙ্গে কথাই বলবে না। কিন্তু সে বিশ্রি

দেখতে নয়?...কিন্তু সন্ধ্যে হতে এখনো বহু দেরী—সামনে তার এখন দীর্ঘ, একঘেয়ে দিন।

কিন্তু ভাগ্য তার পক্ষে। গ্রাসার হচ্ছে করিৎকর্মা মানুষ। সে খুঁজতে বেরিয়েছিল চাষীরা কোথায় আলু লুকিয়ে রেখেছে, খুঁজতে গিয়ে দর্জি শেনারসন আর তার স্ত্রীকে পেল একটা ভাঙাচুরো বাড়ির সেলারে (ভূগর্ভের ঘর, যেখানে মদ রাখা হয়)। বাড়িটা ছিল স্কুলের কাছে। পাশপোর্ট থেকে দেখা যায়, শেনারসনের বয়েস ছিয়াশী বছর, কিন্তু এখনো সে শক্ত-সমর্থ আছে—লম্বা, গাঁট্ট-গোট্টা চেহারা, সাদা লম্বা তার দাড়ি। তার স্ত্রী খুদে মেয়েমানুষটি, পাতলা চুলের গোছা, পিছনে আঁচড়ে রাখে,—দেখতে ঠিক যেন মমির মতো দেখায়। জার্মানরা তো অবাক হয়ে গেল, এই বুড়ো বুড়িকে কারা এনে এখানে লুকিয়ে রাখলে, কারাই বা এক বছর ধরে খাওয়ালে! দর্জির দুটি নাতি জার্মানরা আসার আগেই পল্টনে ছিল। রেকমান বুড়োকে জেরা করতে চাইল, কিন্তু বুড়োর উত্তর সবই খাপছাড়া। বোধ হয় মাথাই তার খারাপ হয়ে গেছে......সে এদের সদর ঘাঁটিতে পাঠাতে পারে না। তাই সে এই একঘেয়ে ফৌজি জীবনে একটু বৈচিত্র্য আমদানী করবে ঠিক করলো। এতে স্থানীয় লোকদেরও শিক্ষা হবে—এদের ভিতরেই কোনো পাজি এই দুটো ইহুদীকে খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। আচ্ছা, এবার দেখুক মজা.........

যখন সৈন্যেরা অধিবাসীদের মাঠে এনে জড়ো করলো, রেকমান বললে,

আমি তোমাদের এক মুহূর্তের মধ্যেই দেখাব, কি করে আমরা তোমাদের দেশ থেকে পরগাছা উপড়ে ফেলছি।

শেনারসন তার স্ত্রীকে হাত ধরে নিয়ে এল। তার চোখে ছেলে-মানুষের বিভ্রান্তি—সব কিছুই তার মাথায় তালগোল পাকিয়ে গেছে।

রেকমান চেঁচিয়ে উঠলো, ওগো ভাল মানুষরা শোন গো, আমি সাদি করতে যাচ্ছি, তোমরা নাচছো না কেন?... ..

বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জনতা, বিষণ্ণ নীরবতায় তারা স্তব্ধ ; কয়েকটি স্ত্রীলোক কেঁদে উঠলো।

শেনারসন তার স্ত্রীকে বললে,

এস রাচেল, শীগ্‌গিরই সব শেষ হয়ে যাবে..........

প্রথমে রেকমান গুলী করে মারলো বুড়িকে। যখন সে আবার তাগ্ করলে, শেনারসন তাকে থামিয়ে দিলে ঃ একটু সবুর কর! সার্জেন্ট খুশি—বুড়ো তাহলে দয়া ভিক্ষা করবে! ওকে মুরগীর ডাক ডাকিয়ে ছাড়বো, সেদিন সেই লোকটাকে তো তাই করেছিলাম। শেনারসন নীচু হয়ে তার মৃতা স্ত্রীর চোখের পাতা বুজিয়ে দিলে, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে কি বললে ; এ তো মৃতের আত্মার জন্য প্রার্থনা। যখন প্রার্থনা শেষ হল, সে বোতাম খুলে ফেললে শার্টের, তারপর বুকের দিকে দেখিয়ে বললে, 'এইখানে'। এতে রেকমান চটে গেল, সে ভাবলে, বুড়োকে যন্ত্রণা দেবে। সে তার কাঁধে গুলী ছুঁড়লো। শেনারসন লুটিয়ে পড়লো মাটিতে, আবার সে উঠে পড়ে নিজের বুকের মাঝখানটা দেখিয়ে দিলে। রেকমান তাকে এবার গুলী করলো পায়ে। বুড়ো পড়ে গেল, জার্মানটা তার কাছে গিয়ে তার বুকের উপর পা চাপিয়ে দিলে। জনতা চিৎকার করে উঠলো ঃ ওকে অমন করে যন্ত্রণা দিচ্ছে কেন? গুস্তাভের বুড়ি ঠাকুরমা ছুটে গিয়ে রেকমানকে এক ডজন ডিম দিতে চাইলে।

হেরড, ওকে খুন করে ফেল, যন্ত্রণা দিও না।

রেকমান ডিম নিয়ে শেনারসনকে গুলি করে মেরে ফেললো। তারপরে সে এত খেল যে আর নড়তে পারে না। এবার গেল লিজার কাছে, ঢেঁকুর তুলে লিজাকে সে জড়িয়ে ধরতে চাইল। সে তার বাহু থেকে ছিটকে পড়লো ঃ বর্বর কোথাকার! রেকমান চেঁচিয়ে উঠলো, কি তুই আসবি না? আমি তোকে জার্মানীতে চালান দেব······লিজা তার মুখখানা

আচড়ে-কামড়ে দিলে। সে গালাগাল দিলেঃ বেড়াল কোথাকার। আমি তোর থাবা কেটে ফেলব!……কিন্তু সেই মুহূর্তে শোনা গেল প্লেসারের চিৎকার ঃ

ডাকাত-ডাকাত!

মেশিনগান বসানো হয়েছে, সেখানে দুজন জার্মান আগলে আছে। তারা গুলী চালাতে লাগলো; কিন্তু দেরী হয়ে গেছে,—প্রতিরোধ-যোদ্ধার দল দক্ষিণ দিক থেকে গ্রামে ছুটে এসেছে। বহুক্ষণ রেকমান প্রতিরোধ যোদ্ধাদের রিভলভার হাতে ঠেকিয়ে লাগলো, একজনকে সে মেরেও ফেললো। তারপর তলপেটে একটা গুলী লেগে সে লুটিয়ে পড়লো। যুদ্ধ আধঘণ্টাখানেক চললো, তিরিশ জন জার্মানের মধ্যে দুজন শুধু পালিয়ে গেল। তারা গিয়ে সদর ঘাঁটিতে খবর দিলে, প্রতিরোধ-যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল তিনশো, তাদের নেতা একজন মঙ্গোল, সে দেখতে 'কিম্ভূতকিমাকার'। সেই মঙ্গোল হচ্ছে কিয়েভ সহরের বোরিস। পিকউইক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা। সে-ই রেকমানকে হত্যা করলো, লিজা তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বললে, 'তুমি আমাকে বাঁচালে, ঐ ইতরটার হাত থেকে বাঁচালে!'

গ্রামের মোড়লরা এসে প্রতিরোধ-যোদ্ধাদের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়লো ঃ আমরা চাইনি…ওরা আমাদের বাধ্য করেছে……কয়েক ঘণ্টা প্রতিরোধ-সংগ্রামীরা রইল গ্রামে, বাসিন্দেরা তাদের খাদ্য আর পানীয় দিলে, জার্মানদের কাছ থেকে যে খাদ্য লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, তার থেকেও ওদের দেওয়া হল। গুস্তাভের ঠাকুরমা ওদের বারবার জিজ্ঞেস করলেন।

আমার নাতিকে তোমরা দেখেছ? সে আছে ট্যাঙ্ক-ফৌজে……

কয়েকটি স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে দেখছিল, তাদের হাত চিবুকের ওপর রয়েছে। তারা বললে, ওরা তোমাদের ধরে ফেলবে…ওদের বহু লোক…

লিজা স্ত্রিজেভকে বললে তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। স্ত্রিজেভ হেসে বললে,

তুমি তো কাঁদবে লিজা……

না, কখনো না।

কিন্তু সেখানে গিয়ে কি করবে? আমাদের তো কোরাসের দল নেই…

লড়ব। আমাকে বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না? খুব ভাল তাগ্‌ আমার। আমি ভোরোশিলভ ব্যাজ পেয়েছিলাম।

স্ত্রিজেভ বললে, তোমাকে দেখে তো তা মনে হয় না।

যাহোক সে তাকে সঙ্গে নিলে।

ভাগ্য ভালই বলতে হবে, চারজন শুধু মরেছে, কিন্তু আঠাশটা ফ্রিৎস গেছে নিকেশ হয়ে, আবার অস্ত্রশস্ত্রও বহু পাওয়া গেছে। এখন খাদ্য সম্বন্ধেও ভাবনা কিছুটা কমলো, সামনে তো দুরন্ত শীত।

বোরিশ চলতে চলতে কিয়েভা-এর কথা ভাবছিল: গাঁয়ের এক বুড়ি তাকে তার মার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। কোথায়, মা কোথায়? শাসা কিয়েভে ছিল, সে তাকে বলেছে জিনার কথা, কিন্তু মা হয়তো বাস্তত্যাগীদের ভিড়ে মিশে চলে গেছেন……কি করে একা আছেন? বুড়ো হয়ে গেছেন…জিনা খাটি মেয়ে—আমাদের দলের সঙ্গে কাজ করছে……রায়া কোথায়, ভালিয়া আর গ্যোলোচ্‌কাই বা কোথায় গেল? এখন তো বুঝতে পারি কত সুখের জীবন ছিল তখন! যখন তোস্যা আমাকে প্রত্যাখ্যান করলো তখন তো তাকে ট্রাজেডী বলেই ধরে নিয়েছিলাম…মানুষই এমনি ভাবে তৈরি….যখন সব শান্ত থাকে, তখন সে মনে করে ঝড় বইছে, কিন্তু যখন সত্যই ঝড় বয়, এমন ভাব দেখায়, যেন কিছুই হয়নি। একটা ফ্রিৎসকে মার, টমিগান যোগাড় কর, আলুর সঞ্চয় খুঁজে বার কর…না, না, এই তো সব নয়—এছাড়াও অন্য কিছু আছে, কিন্তু আমি তো তাকে বোঝাতে পারছিনা, তাকে বিশ্লেষণ করতে পারছিনা।…

স্ত্রিজেভের একখানা মানচিত্র আছে, স্কুলের ভূচিত্রাবলী থেকে

সেখানা ছিড়ে নেওয়া। সে বার বার সেখানা দেখে আর ভ্রূ কোঁচকায়ঃ ভোলগা এখনো দূরে—বহুদূরে !

সে জিজ্ঞেস করল, জখার শেষ বিজ্ঞপ্তি দেখেছ ?

হাঁ, স্তালিনগ্রাদ্‌ আর তুপাস অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিমে আছে ওরা। জার্মানরা স্তালিনগ্রাদের কথা কিছুই বলেনা।

বোরিস বললে, সেখানে জোর যুদ্ধ চলছে, হয় তো সব কিছুই ওখানে স্থির হয়ে যাচ্ছে.......

সে স্তালিনগ্রাদের কথা মনে করতে চেষ্টা করলো কিন্তু পারলোনা। কখনো বড় যুদ্ধে সে লড়েনি। যুদ্ধের শুরুতেই তার পল্টন ঘেরাও হয়ে যায়। সে চলে যায় বনে, সেখানে আর সবার সঙ্গে দেখা।...তাও তো বহুদিন হয়ে গেল। আর কদিন পরেই আঠারো মাস পুরবে। তারা এরই মধ্যে বনে ঘুরে বেড়িয়েছে আর খুন করেছে ফ্রিৎসদের। এই শেষ অভিযানের জন্য তৈরি হচ্ছিল তিন সপ্তাহ ধরে। তিরিশটি জার্মান তো তুচ্ছ ব্যাপার। স্তালিনগ্রাদে চলছে আসল লড়াই। সেখানে আমাদের নিজেদের ভাগ্য, লেনিনগ্রাদের ভাগ্য, সারা ইওরোপের ভাগ্য নির্ণীত হচ্ছে...

মানচিত্রের দিকে সে তাকাল। কি বিরাট দেশ—সবখানি মানচিত্রে দেখানোও শক্ত। গর্বভরেই সে ভাবল, অবাক্‌ হয়ে তাকিয়ে রইল—হাঁ বিরাট দেশই বটে......কিন্তু তার থেকেও চমকে দেবার মতো জিনিষ আছেঃ এখানে আমরা মুষ্টিমেয় মানুষ, আর ওখানে দূরে, বহুদূরে রয়েছে স্তালিনগ্রাদ—এক বিরাট লড়াই চলছে সেখানে—কিন্তু তাহলেও আমাদের অনুভূতি রয়েছে এক। ওরা আর আমরা একরকমই ভাবছি। এখন যদি স্ত্রিজেভ, গ্রুসকো কি আমাকে বলা হয় যে, স্তালিনগ্রাদের একটা বাড়ি রক্ষা করবার জন্য আমাদের এখনি মরতে হবে—আমরা একটুও না ভেবে ছুটে যাব। এরই মানে যে মাতৃভূমি,

তাতে তো সন্দেহ নেই—মানচিত্রে তো তাই সব সবখানি দেখানো যায় না—কিন্তু তা থাকে আমাদের বুকে ।

স্ত্রিজেভ হাসলো,

কি হে, কি ভাবতে বসলে বোরিস ? এককাণা কড়ি দাম হবে ভাবনার তো ?

সে যে কবিতা লেখে একথা আর গোপন করে রাখে না। কখনো বা কবিতা পড়ে শোনায় সাথীদের। স্ত্রিজেভ বলে, বাজে পদ্য। কিন্তু পড়ে যাও......একদিন তো সে কবিতার বিরুদ্ধে এক ভীষণ বিষোদ্গার করে বসলো: কে এই সোজা করে না বলার ব্যাপারটা আবিষ্কার করলে বল তো ? এযে মেসিন গানের প্যাঁচালো শব্দের মতো। এই তো তুমি প্রথমে লিখলে 'টমি গান' ওরা যদি টমি গান না এনে সাধারণ রাইফেল নিয়ে আসে ?...এখানে পদ্যটা রেখে যাও, আমি পরে পড়ে দেখব।......সে ওর কয়েকটা কবিতা নকল করে রাখলে, কিন্তু বোরিসকে তা জানালে না, শুধু ঘোঁত ঘোঁত করে বললে, হাঁ চমৎকার হয়েছে, তবে খুব একটা মানে-টানে নেই। তুমি তো ভাল লড়িয়ে, কিন্তু বড় ভাববিলাসী—হাঁ, এটা একেবারে খাঁটি সত্যি.........

গ্রুসকো কিন্তু একেবারে সোজাসুজি স্বীকার করলে, আমার ভাল লাগে, সে লিজাকেও সে কথা বললে,

লোকে বলে প্রকৃতি অন্ধ। কিন্তু তা তো সত্যি নয়। রোভ্নোয় আমি একটা ময়ূর দেখেছিলাম, ওর মতো ঝলমলে আর কিছু দেখিনি, কিন্তু যখন ও কিচির মিচির করে ডেকে উঠলো, তখন তো আমার স্নায়ুগুলো অস্থির হয়ে উঠলো। অবশ্য আমাকে তুমি খুব স্পর্শাতুর বলে মনে কোরো না, একটা চক দিয়ে শব্দ করে দাগ কাটলেও আমার কানে কিছু হয় না। কিন্তু একটি নাইটিঙেলের কথাই ধর......পাখীর ভিতরে ওতো একেবারে সাধারণ; ওকে তোমার চোখেই পড়বে না। কিন্তু বোরিসের শক্তি

আছে, তুমি তাকে বাজে বলতে পার, উড়িয়ে দিতেও পার, কিন্তু ক্ষমতা স্বীকার করতেই হবে। যখন সে আবৃত্তি করে, একটা মেয়ে তার চেহারার কথা বিশ্রী ভুলে যায়।.......

লিজা বিদ্রুপ করে বললে, আমার তো ওকে বিশ্রী মনে হয় না। বরং... ওর চোখ দুটো তো অসাধারণ, অমন সচরাচর দেখা যায় না......

গ্রসকো হাসলো :

হল তো! তাহলে তোমাকেও মজিয়েছে!

লিজা বোরিসকে বললে,

ওরা বলে তুমি ভাব-বিলাসী—তা কি সত্যি?

বোরিস মুখিয়ে উঠলো,

বাজে কথা। দেখ না কি ভাবে খাচ্ছি...না, না, সত্যিই আমি তা নই। আমি ভাব-বিলাসী নই। ভাব-বিলাসীরা সবকিছু আলাদা ভাবে চায়—অন্যে যেমনটি চায় তারা তা চায় না। আমি কি তেমনি লোক—আমি কি তাই চাই নাকি।...জীবন বদলে গেছে, একথা সত্যি, কিন্তু সে তো একা আমার জন্য নয়। তোমার, স্ত্রিজেভ-এর—সবার জীবনধারাই তো বদলেছে। যদি জানতেই চাও তো বলি, আমি অন্য স্বপ্ন দেখি—সহজ সরল সে স্বপ্ন, বুঝি বা একটু বেশি গদ্যময়। আগে তো কখনো ভাবিনি ট্রেণ উড়িয়ে দেব, কিন্তু এখন তো দিচ্ছি। কিয়েভ-এ আমার ছিল একটি বান্ধবী। খুব মনোযোগী মেয়ে, পড়ছিল কাব্য, কিন্তু এখন তো শুনি সে লুকিয়ে আছে, আর ইশ্‌তেহার টাইপ করছে। তা এখানে ভাব-বিলাসের জায়গা কোথায় বল তো?..... চাঁদের সঙ্গে কখনো প্রেমে পড়তে চাইনি, কখনো দ্বন্দ্ব যুদ্ধে লড়িনি, বাঘ মারিনি......একটা জার্মান সার্জেণ্টকে শুধু নিকেশ করেছিলাম......কিন্তু সে তো আর কথা নয়। সব চেয়ে লাগছে কোথায় জান, আমরা কিছুই করতে পারছিনা। স্তালিনগ্রাদে ওরা যেমন করছে, তেমনি ঐ একটা

জিনিস নিয়েই আমাদের বাঁচা দরকার।....সবসময়ে আমি ভাবি, কি ভীষণ লড়াই চলছে ওখানে। ......হাঁ, আমি কি বলি শোন, স্তালিনগ্রাদ শুধু দেশরক্ষার লড়াই বা যুগকে বাঁচাবার লড়াই নয়, মানুষের দাবী রক্ষার লড়াই···আমি গিয়ে গ্রুসকোকে জিজ্ঞেস করব, মস্কৌ থেকে কি খবর বলছে....

এক সপ্তাহ পরে ওরা বন থেকে বেরুবার সময় ওরা ধরা পড়লো। ওঁৎ পেতে ছিল জার্মানরা। তারা সংখ্যায় একশোর কম হবে না। বোরিস চেঁচিয়ে উঠলো।

তোমরা পালাও, আমি ওদের ঠেকিয়ে রাখব...

আহত হয়েও ও গুলী চালিয়ে গেল। তারপর যখন জার্মানরা সাহস করে তার দিকে এগিয়ে গেল, তখন আর তার নিঃশ্বাস পড়ছেনা। একটা জার্মান তার পা দিয়ে ওর মাথাটা নেড়ে-চেড়ে বললে, হাঁ কড়া জান বটে লোকটার, তাই না! যাক, শাস্তি ও পেয়েছে। ডাকাতটা আমাদের ছ-ছটা মানুষকে ঘায়েল করলো!

যখন স্ত্রিজেভ শুনলো বোরিস মারা গেছে, সে কিছু বললে না, শুধু ভ্রূ কুঁচকে নিজের ট্রেঞ্চে চলে গেল। গ্রুসকো এল সেখানে। স্ত্রিজেভ তাড়তাড়ি একখানা নোটবই পকেটে পুরে ফেললো,—সে পড়ছিল বোরিসের লেখা কবিতা।

গ্রুসকো জিজ্ঞেস করলে, কি করছ?

কিছুনা...শাসাকে ডাকতে হবে, জুতোর ডগাটায় নতুন তাপ্পি দিতে হবে, একেবারে গেছে।

কিন্তু লিজা কাঁদলে, তার একটুও লজ্জা নেই। সে যে মেয়ে, কাঁদতে সে পারে.....

পনেরো

সেই গ্রীষ্মে ডাঃ পেসকভ দিমিত্রি আলেক্‌সিয়েভিচকে লিখেছিলেনঃ আমি এক দিনের জন্য আতকারস্ক-এ আটকে পড়েছিলাম, হাঁ আপনার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতেও গিয়েছিলাম। বারবারা ইলিনিটনার উদ্বেগের অন্ত নেই, কিন্তু চেহারা তাঁর খারাপ হয়নি। নাতাশাকে দেখে তো চেনাই যায় না—এই তো ক'দিন আগে ছিল এককোঁটা মেয়ে, কিন্তু এখনতো ছবির মতো সুন্দর—লোকে কথায় তো তাই বলে। দুর্ভাগ্য তাকেও ভেঙে চুরমার করে দিতে পারেনা, যৌবন সেখানে জানাচ্ছেই নিজের বিজয়ের কথা।

নাতাশার সম্পর্কে পেশকভ যা লিখলেন তা খুবই ঠিক। তার চেহারা খুবই ভাল হয়েছে। যুদ্ধের আগে, ভাসিয়া ছাড়া আর সবার কাছে সে ছিল সাধারণ হাসিখুসী একটি মেয়ে, এখন তো পথের লোকের দৃষ্টিও টানে, পথ চলতে গেলে, সবাই তাকে তাকিয়ে দেখে। একটু রোগা হয়েছে সে তাতে একটু লম্বাও দেখায়; তার চোখে নতুন ভাব-ব্যঞ্জনা—দুঃখ আর আনন্দ সেখানে মিশে আছে।

কিন্তু ডাঃ পেসকভ বারবারা ইলিনিচনার কথা যা লিখেছিলেন, তা সত্যি নয়। তিনি ক্রাইলভের উদ্বেগ বাড়াতে চাননি। বারবারা ইলিনিচনা গত বসন্ত কাল থেকেই ভুগছেন পেটে ভীষণ ব্যথা, খেতে পারেননা, বড় রোগা হয়ে গেছেন। কি তাঁর হয়েছে ডাক্তাররা বলছেন না, কিন্তু তাদের মুখ দেখে নাতাশা বুঝতে পারে, মার অসুখটা বেশ বেশী। কিন্তু বারবারা ইলিনিচনা হাঁসপাতালে যাবেন না। নাতাশাই তার সেবা করছে।

গ্রীষ্মটা সবার পক্ষেই খারাপ, নাতাশার পক্ষে তো আরো। খুদে ভাসিয়া আমাশায় ভুগছে; ক'দিন ধরে তো নাতাশা তার জীবনের

আশঙ্কাই করছে। আর কত কাজ—হরবখৎই আসছে সদ্য আহতের দল ডোন রণাঙ্গন থেকে। বাররারা ইলিনিচনা অভিযোগ করেন না, তিনি বলেন, আজ ভালই আছি। কিন্তু নাতাসা বোঝে তার মা দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছেন। জুন মাসে নিনা জর্জিয়েভনার চিঠি এল। তিনি লিখছেন, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ক্যামেরাম্যান রোমোভ এখানে এসেছে। সে আমাকে বললে, এপ্রিল মাসে ভাসিয়াকে দেখেছে, তার ভুল হয়নি, কারণ যুদ্ধের আগে সে কয়েকবার তাকে মিনস্কে দেখেছিল। জানিনা, তাকে বিশ্বাস করবো কি করবো না। বড় চিন্তায় আছি। যদি সত্যই হয়, ভাসিয়া তোমাকে বা আমাকে চিঠি লিখছে না কেন? রোমেভ তার যুদ্ধক্ষেত্রের ডাকঘরের নম্বর দিয়েছে। নম্বরটা হচ্ছে ১৮৬১৪ কে।

নাতাসা মাকে নিনা জর্জিয়েভ্নার চিঠির কথা বলেনি, হাবেভাবেও জানায়নি। বড় শক্ত কাজ। সে তো চেঁচিয়ে উঠে বলতে চায়—ভাসিয়াকে পাওয়া গেছে! কিন্তু নিনা জর্জিয়েভ্নার মতো সেও জানে, রোমভ ভুল করতেও পারে—সব কিছুই যেন অসম্ভব ঠেকছে। সত্যি ভাসিয়া চিঠি লিখছে না কেন?...কিন্তু যদি সে আবেষ্টনী থেকে সবে এপ্রিলে বেরিয়ে থাকে, তার চিঠি আসার এখনো সময় যায়নি। মাত্র তো দুমাস হয়েছে, আর চিঠি তো মস্কো থেকে ঠিকানা বদলে তবে এখানে আসবে।

সে রোমভকে চিঠি লিখলে। তাকে অনুনয় করে জানাল, সে যেন বিশদভাবে ভাসিয়ার সঙ্গে দেখা হবার কথা জানায়। কখনো এমন মুহূর্ত আসে, যখন তার বিশ্বাস হয় ভাসিয়া বেঁচে আছে, তাকে সে আবার দেখতে পাবে। তেমনি লাজুক, তেমনি প্রিয় ভাসিয়া—ঠিক মিনস্ক-এ যেমনটি ছিল। সে তার ছেলেকে বলবে, জানো, বড় ভাসকাকে খুঁজে পাওয়া গেছে। সে শীগ্‌গিরই আসবে। কি বলছি, বুঝতে পারছ?.......... কিন্তু তার পর মুহূর্তেই সে নিজেকে ভৎর্সনা করেছে; গুজব বিশ্বাস

করে লাভ কি? চিঠি থেকে তো বোঝা যায়, নিনা জর্জিয়েভ্না বিশ্বাস করতে পারেন নি। ....নাতাশার সমস্ত জুলাই মাসটা এমনি আশা আর আশঙ্কার ভিতরে কাটলো। জল-হাওয়াও অসহ্য হয়ে উঠেছে। রোজই আবার বিজ্ঞপ্তিতে নতুন জায়গার নাম দেখা দিচ্ছে—যুদ্ধক্ষেত্র সরে এসেছে ভোলগার কাছে। সমস্ত শহরে একটা চাপা উদ্বেগের ভাব; মানুষ দেখছে পিছনের জীবনের শান্তি আস্তে আস্তে ধসে পড়ছে—এতো বিপন্ন শান্তি, ধসে তো পড়বেই। কেউ বা এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে, ভাগ্যকে গাল দিচ্ছে: কেউ বা মুখ গম্ভীর করে বলছে, ওরা বাধা পাবেই, যেমন মস্কোর কাছে পেয়েছিল। আমাদের কাজ করে যেতে হবে, ...যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যে সব সৈনিক আহত হয়ে ফিরে আসছে, তারা বলছে জার্মান ট্যাঙ্ক, মটার আর পশ্চাৎ-অপসারণের কথা।

অবশেষে রোমভের কাছ থেকে এল উত্তর: আমি ভাসিয়াকে সামরিক কর্মচারিদের গাড়িতে যেতে দেখেছিলাম। তাকে আমি ডাকলাম, কিন্তু সে শুনতে পায়নি। যদি সে না হয় তাহলে তার সঙ্গে মিল কিন্তু অদ্ভুত। আমি অবশ্য একেবারে নিশ্চয় করে বলতে পারি না, যেহেতু ভাসিয়ার গাড়িটা তখন খুব জোরেই ছুটছিল। আমি ভাসিয়ার মাকে বলেছি, ঠিকই আমি তাকে দেখেছি—তাঁকে খানিকটা চাঙা করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল, ওঁর শরীর খুবই খারাপ, বড়ই উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছেন....... ..

চিঠি পড়ে নাতাশা তার ঘরে চলে গেল, বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তার মনে হল, সে ভাসিয়াকে আবার হারিয়েছে। তারপরে সে উঠে হাসপাতালে গেল। সেখানে শুনলো, রোস্তভের পতনের কথা। জার্মান অভিযান চলছে।

তিন মাসের বেশী কেটে গেল। আহতরা আসছে স্তালিনগ্রাদ থেকে। তারা সেই শহরের যুদ্ধের বর্ণনা দিলে: আমরা পভলভের বাড়িটা রক্ষা করছিলাম......গ্রীষ্মে যে আতঙ্ক ছিল এখন আর তা নেই। সবাই

এখন কঠোর, মনে হয় যেন পাথর বনে গেছে। এক ভীষণ যুদ্ধ চলছে আর তার শেষ নেই বলেই যেন মনে হচ্ছে। দিমিত্রি আলোকত্রিয়েভিক ডন অঞ্চলের কোথাও আছেন; তাঁর চিঠি ক্রমেই সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে। যেন চিঠি লেখাই ভুলে গেছেন তিনি। লিখছেন, ভাল আছি। সবই ভালো। তোমাকে আর মাকে জানাচ্ছি আলিঙ্গন। চিঠি লেখারও সময় নেই—নাতাশা ভাবলো আপন মনে।

এখন পর্যন্ত সে ভেবে আসছে, ভার্সিয়ার বেঁচে থাকার কথা সে বিশ্বাস করবে করাই তো তার উচিত সে ফিরে আসবে। খবরের কাগজে লিখেছে—আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। গল্প আর কবিতা তাই নিয়ে লেখা হচ্ছে। কিন্তু এবার তো সে একে ভাবলো ভীরুতা। হঁা, এ আশা মনে পুষে রাখাও তো ভীরুতা। তার চার পাশে কত স্ত্রীলোক রয়েছে, তারা হারিয়েছে তাদের স্ত্রী বা পুত্র। ভার্সিয়াকে হারানো তো তাই স্বাভাবিক বলেই তার মনে হল। যুদ্ধের আগে, বই পড়ে সে জীবনের বিচার করত, সে ভাবতো, দুঃখ যদি সকলের হয় তো সহ্য করা যায় সহজে, কিন্তু এখন তো সে জানে অন্যের দুঃখ নিজের দুঃখে সান্ত্বনা বয়ে আনেনা, বরং আরো বাড়িয়ে তোলে।

কি করে নিজের অনুভূতি চেপে রাখতে হয় সে তা জানে। কোথায় গেল সেই নাতাশা, যার সম্বন্ধে দিমিত্রি আলোকত্রিয়েভিক বলতেন, ওর মনের কথা লেখা আছে মুখে? আহতদের আনন্দ দেবার জন্য একটা জলসার বন্দোবস্ত হল। মস্কো থেকে একজন গায়ক এসেছেন, তিনি গাইলেন হাসির গান। নাতাশা সবার সঙ্গেই যোগ দিয়ে হাসলো। তার মতো এমন হাসিখুসি সুন্দর মেয়ের দিকে তাকিয়ে তখন মনে করা শক্ত যে, এই মুহূর্তে সে চলে যেতে চায় তার ঘরে, গিয়ে কাঁদতে চায় প্রাণ খুলে—ঐ গায়ক তো ভাসিয়ার সেই গানই গাইছে। যেদিন তারা ভার্সিয়ার গড়া বাড়ী দেখতে বেরিয়েছিল, সেই ভোরে ভাসিয়া গেয়েছিল ঐ গান·········

আবার এল নতুন নতুন আহত সৈনিক দল। সাবানেয়েভ একটা শক্ত অস্ত্রোপচার করলেন; একটা গোলার টুকরো কণ্ঠনালী ছড়ে দিয়েছিল, সেই টুকরোটা তিনি তুলে ফেললেন। সেটা শেষ হবার পরে নাতাশা সার্জেণ্ট কুটসিনের বিছানার পাশে বস্‌লেন, তার একখানা বাহু বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে বললে, ফ্রিৎসগুলো উল্টো দিকের বাড়িটায় ছিল। এতো চুপ চাপ তখন চারদিক, ওদের কথা পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল...... আমরা কথা বলিনি, টু-শব্দটি করিনি। আমাদের খাবার নিয়ে আসতো; কিন্তু খাবার ছুঁতে পারি নি। ....শুধু আমরা তিনজন মাত্র বাকি তখন......ন'দিন টিঁকে ছিলাম.........নাতাশা তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করলো: অত করে বোলোনা, শক্তি যে ফুরিয়ে যাবে—কাল আবার বলবেখন। ...এক মুহূর্ত থেমে আবার সৈনিক বলতে লাগলো: ওরা মটার চালাতে শুরু করলে...। য়েগোরোভ চেঁচিয়ে কি বললে, কিন্তু আমি শুনি নি। সে চেঁচিয়ে আবার জানালে, তার বন্দুকটা আর চলছে না, কোথায় খারাপ হয়ে গেছে। জার্মানরা গুঁড়ি মেরে এগিয়ে এল আবার, আমি একটা লেবু তুলে নিলাম হাতে........

নাতাশা বাড়ী চলে এল। আবহাওয়া বিষণ্ণ, একঘেয়ে। মিহি-গুড়িতে ঝরছে বৃষ্টি, মাঝে মাঝে ঝরছে তুষার। সে একটা পতাকায় 'পঁচিশ' লেখা আছে দেখতে পেল। ছুটি আসছে.....কি অদ্ভুত; একটা লাল তারিখ ঘনিয়ে আসছে, অথচ এমনি অবস্থায় তা খাপ তো খায় না। এখন উৎসবের সমারোহও অসাধ্য। স্তালিনগ্রাদের মানুষ দিচ্ছে একখানা বাড়ি বা রাস্তার জন্য তাদের জীবন, একটা ভাঙা বাড়ী রাখতেও চেষ্টা করছে, বিলিয়ে দিচ্ছে জীবন। এযে উপলব্ধি করাও শক্ত.......ঐ যে সার্জেণ্টটি ওতো বীর, কিন্তু কেউ তা জানে না......না, আমরা উৎসব করবো, জার্মানদের ঘৃণা করি শুধু তা দেখবার জন্যেই উৎসব করব। এই হচ্ছে পঞ্চবিংশতিতম সমাবর্তন উৎসব, তারপর হবে পঞ্চাশৎতমো, একশততম।

আহতদের জন্যে একটা জলসার বন্দোবস্ত করতে হবে........কিন্তু এ যে দুঃসহ, দুঃসহ !......

বারবারা ইলিনিচনা বললেন, নাতাশেঙ্কা, আমার গাটা ঢেকে দাও তো, বড় ঠাণ্ডা লাগছে.......নাতাশা মার হাত ধরলে, যেন সে আস্তে আস্তে চাপড়াবে, কিন্তু সে তার নাড়ি দেখলে। দ্রুত চলছে নাড়ি, ক্ষীণ নিয়মিত নয়......হয়তো পিতোর ভাসিলিয়েভিচকে ডাকাই ভালো? কিন্তু ওঁকে একা কি করে ফেলে যাব ?

মা, আজও কি শরীরটা খুব খারাপ লাগছে ?......

না, নাতাশেঙ্কা, বড় ঠাণ্ডা লাগছিল, এখন তো বেশ গরম বোধ হচ্ছে।........

একটু চা খাবে ? নয় তো একটু সুরুয়া ?......

বারবার ইলিনিচনা মাথা নাড়লেন। তিনি ঝিমুতে লাগলেন। নাতাশা আবার তার নাড়ি দেখলে ঃ একটু ভাল.......তার শ্বাস প্রশ্বাস এখন নিয়মিত।

যাই ছুটে গিয়ে পিতর ভাসিলিয়েভিচকে ডেকে আনি......

যখন সে ফিরলো, বারবারা ইলিনিচনা তখন মারা গেছেন। তার মাথাটা ঝুলে পড়েছে বিছানার একধারে। কম্বলটা লোটাচ্ছে মাটিতে। হয়তো অন্তিম মুহূর্তে ওঠার চেষ্টা করেছিলেন।

পরে নাতাশা নিজেকে ভৎর্সনা করেছে, কেন সে বাড়ি ছেড়ে গেল। আবার তার এও মনে হল, কি যেন বাকি রইল......ডাক্তার বললেন, আর কিছু করবার নেই। চেষ্টা যা করবার করা হয়েছে। এমন অনেক রোগী আছে, যাদের কাছে ভেষজ বিজ্ঞানও হার মানে......

নাতাশা সব সময়ে বাপের পরামর্শ নিয়ে চলেছে। দিমিত্রি আলোকত্রিয়েভিচ তার বন্ধু, শিক্ষক, তার চিন্তা তার অনুভূতি আর কাজের বিচারক। এবার নাতাশা বুঝতে পারলো, মার প্রতি তার ভালবাসা ছিল অন্য জাতের, এ যেন এক রহস্যময় আবছা আঁকড়ে ধরে থাকা কিছু একে বোঝানো যায় না।

তাই তো মনে হচ্ছে, আমিও যেন মরে গেছি……তার সামনে ভেসে উঠতে লাগলো মা, তার শৈশবের মার ছবি, সব সময়ে ব্যস্ত, শান্ত, সন্তানের কুশল কামনায় ব্যগ্র মা—মা-মণি। তিনি বাবা আর আমাকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে চাননি, তাই তো তিলে তিলে নিজেকে ক্ষইয়ে দিলেন।

বাবাকে চিঠি লেখা দরকার। কিন্তু তাঁকে কি করে একথা বলব? নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে উঠলো—তার বাবা—জীবন তাঁর পরিপূর্ণ, আছে শক্তি, কিন্তু এখন তো তাকে ছেলেমানুষ বলেই তার মনে হচ্ছে। ওঁকে আস্তে আস্তে তৈরী করে নিতে হবে। কিন্তু উনি তো শুধু উদ্বিগ্নই হবেন, পরের চিঠিখানা না আসা পর্যন্ত এ উদ্বেগ ওঁর থাকবেই……তারপর আবার পরের চিঠি……এমনি করেই চলবে… ওঁর কাছে একথা চেপে রাখা? না, তার সে অধিকার নেই। ভাসিয়ার মৃত্যু যদি কেউ তার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে-সে কি তাকে ক্ষমা করতে পারবে? ……সত্য যা তা বলতে হবে। কিন্তু কেন?

আবার সে তার অতীত স্মৃতির ভিতরে ডুবে গেল। ওরা মার একখানা মস্ত বড় ছবি মস্কোতে ফেলে এসেছে। এক সময়ে তিনি খুব সুন্দরী ছিলেন, তিনি প্রায়ই লাজুক হাসি হেসে বলতেন, তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হবার আগে, আমার কাছে বহু প্রার্থী এসে হাজির হয়েছিল…….নাতাশার মনে পড়লো, মা একবার টাইফয়েডে শয্যাশায়ী হন। নাতাশার তখন ছ'বছর বয়েস। তার বাবা বসে থাকতেন বিছানার পাশে, মাকে হাতের উপর চুমু খেয়ে বারবার বলতেন, ভারেঙ্কা, আমার প্রিয়া! ……তখনকার নাতাশা তো আজ আর নেই…আতাকারস্ক-এ যখন তারা আসে, মা বললেন হতাশ হয়ো না, এখানেও মানুষ কাজ করতে পারে…….প্রতিদিন তিনি সন্ধ্যের সময় ছুটতেন রেল ষ্টেশনে, সৈনিকদের চা তৈরি করে দিতেন। তাদের কলারের পিছনের কাপড় সেলাই করে দিতেন, শুনতেন ওদের

দীর্ঘ গল্প। তিনি সব সময়েই অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু একটা গল্পও বাদ যেত না!......তিনি কি ছিলেন তা তো কেউ জানে না......! তিনি ছিলেন খাঁটি মানুষ......

প্রিয় বাপি আমার,

এক দুর্ভাগ্য এসে দেখা দিয়েছে আমাদের জীবনে। জানি, তোমার মনে কত শক্তি, তাই সোজাসুজি লিখছি। তোমার কাছ থেকে সত্যি যা তা লুকাবার শক্তি আমার নেই। মা চলে গেছেন। তিনি আমাকে নিষেধ করেছিলেন আমি যেন তার অসুখের কথা তোমাকে না লিখি। তিনি বসন্তকালে অসুস্থ হয়ে পড়েন, প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম, এটা একটা প্রচণ্ড রকমের গ্যাসট্রাইটিস। আগষ্ট মাস যেতে অধ্যাপক শেগলভ পরীক্ষা করে অসুখটা ঠিক করলেন: পাকস্থলীতে হয়েছিল ক্যানসার। রেডিয়াম চিকিৎসার পর কিছুটা উপশম হয়, কিন্তু আমরা জানতাম এটা সাময়িক। অধ্যাপক শেগলভ আর সাবানিয়েভ দুজনেই ছিলেন অস্ত্রোপ্রচারের বিরুদ্ধে! তারা বললেন, এতে শুধু অনাবশ্যক কষ্টই দেওয়া হবে, তাঁর বুকের অবস্থা যে রকম তাতে তাই তিনি এ ধকল সইতে পারবেন না। মা কিন্তু অদ্ভুত সাহস দেখালেন; তিনি একটু আরাম হয়েই ষ্টেশনে তার কাজ শুরু করে দিলেন। আমি তাকে বাধা দিতে চেষ্টা করে ছিলাম, কিন্তু এ কাজে তাঁর ছিল এত আনন্দ যে, আমি বাধা দেবার চেষ্টা আর করিনি। অধ্যাপক শেগলেভ নিজে তোমার কাছে চিঠি লিখবেন, আমি শুধু তাঁর নাম করে বলতে পারি, যতদূর চেষ্টা করবার তা করা হয়েছিল। শেষদিন পর্যন্ত মার মনে ছিল শক্তি, সব কিছুতেই তাঁর কৌতূহল ছিল, তোমার চিঠির আশায় থাকতেন, আহত মানুষরা কি বলে আমার কাছে তা শুনতেন। গত মাসে তিনি শয্যাশায়ী হন, তখন তিনি ভারি দুর্বল। প্রতিদিন তিনি আমাকে দিয়ে প্রাভদা আর ভেজদায় স্তালিন-গ্রাদের কথা কি লিখেছে পড়িয়ে শুনে নিতেন, তাঁর মরবার আগের দিন তিনি

বলেছিলেন, আমার তো মনে হয় এবার অন্য রকম হবে,......তিনি দোসরা নভেম্বর, রাত এগারোটার সময় মারা গেছেন। কাল অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া হয়ে গেল। কবরের কাছে ছিল একটা বার্ট বার্চ। বসন্তকালে আমি ওখানে ফুলের চারা লাগিয়ে দেব। বাপি, ওখানে যখন দাঁড়িয়ে ছিলাম, আমার মনে হচ্ছিল, তুমি আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছ। বাবা, এ দুঃখ সইতে হবে তোমাকে—এ আমার অনুরোধ। এতো এক ভয়ানক সময়! আমার কথা ভেবনা। আমি কাজ করছি, মন খুশি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের বিজয় কাছে ঘনিয়ে আসছে! তোমার নাতি ভাল আছে, ফনফনিয়ে বাড়ছে, ওতো এখনো কি দুঃসময়ে আমরা বাস করছি, তা জানে না। কিন্তু শীগ্‌গিরই বুঝতে পারবে, আর বাপি, তুমি মনে রেখো, খুদে ভাসিয়া আর আমার তোমাকে চাই। তোমাকে চুমু খাচ্ছি, আলিঙ্গন জানাচ্ছি। তোমার সঙ্গে সঙ্গে তো আছি আমি—সব সময়ে, প্রতি মূহূর্তে! আবার দেখা না হওয়া পর্যন্ত বিদায়—বাপি—বিদায়।

তোমার—নাতাশা।

হাসপাতালে নাতাশা সাবানেয়েভকে বললে,

আজকের সন্ধ্যের যতটা সম্ভব আমরা উৎসব করব। পঁচিশ বছর তো চলে গেল! আমি জেলা পার্টি কমিটির কাছে গিয়ে এখানে সিনেমা দেখাবার বন্দোবস্ত করব। যদি 'মস্কোর কাছে শত্রুর পরাজয়' ছবিটা দেখানো যায়—কেমন হয় বলতো? তারপরে কিছু না হয় হাসি তামাসার ছবি থাকবে......

সাবানেয়েভ নার্স কোরসেবাকে বললে,

আমি সব সময়েই বলি, আমাদের মেয়েদের দেখে অবাক লাগে, আর আর ওরাই আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়......কিন্তু নাতাশার দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে যাই আরো বেশি—কোথা থেকে ও এত শক্তি পেল তাই ভাবি?

শুধু খুদে ভাসিয়ার কাছে নাতাশা নিজের মনের দুয়ার খুলে দেয়, খোলাখুলি ভাবে নিজেকে প্রকাশ করে :

আমরা তো দুটি অনাথস্—ভাস্কা, তুই আর আমি। কিন্তু তবু আমাদের বাঁচতে তো হবে। হাঁ, নিশ্চয়ই বাঁচতে হবে। যখন তুই বড় হবি তখন বুঝতে পারবি……এখন যে কিছু বুঝিস না, এতো ভালো। তুই চুপটি করে শুয়ে আছিস, তোর মা যে কাঁদছেরে……

ষোলো

দীর্ঘ নিদ্রাহীন রাত কেটে গেছে, আর ভালিয়া ভেবেছে, বহু ভেবেছে। নিজেকে দেখে তার হাসি পেয়েছে : সব কিছুই আমি জানতে চাই। সত্যিই সে নিজেকে জানতে আর বুঝতে শুরু করেছে। আগের ভালিয়ার দিকে তাকিয়ে সে বুঝেছে, যেমন করে সে বাঁচতে চেয়েছিল, তেমনি করে সে তো বাঁচতে পারেনি—চিত্রাভিনেত্রী হবার স্বপ্ন তার ছেলেমানষি খেয়াল মাত্র—বিপথেই তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো—সে যে শিল্পের দিকে ঝুঁকে-ছিল, সে তো তার ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু ছিল না তাই ; তার অনুভূতি প্রকাশের কোনো পথ না পেয়ে তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল কল্পলোকে। কিন্তু যখন সাজির সঙ্গে দেখা হোলো, সব কিছু বদলে গেল তার ; তার অতীতের স্বপ্ন সম্বন্ধে সে-অনুভূতি আর রইলো না, কেমন যেন মিইয়ে গেল। সে তখন রায়া বা গ্যোলোচ্কার মতো যে কোনো আফিসে কাজ করতে পারত, আর সুখীও হোত। সে তার জীবন-ধারা বদলাতে পারলো না, যুদ্ধের দুমাস মাত্র আগে সে হোল সাজির স্ত্রী। সাজিকে সে বলবার সময় পেল না যে, সে চায় সন্তান—কত উগ্রতার কামনা!

কেন সে গেল বিমান তৈরীর কারখানায়? সে বুঝেছিল বইকি, যে সময় এখন খারাপ পড়েছে, বিমান এখনকার সিনেমার চেয়ে অনেক

বেশি দরকারী। কিন্তু শুধু এই চেতনাই তো ভালিয়াকে লেদের কলে টেনে নিয়ে গেল না টেনে নিয়ে যেতে পারলনা। তার মার কথায় সে ছিল 'ঘুমন্ত মেয়ে' সে কল্পনার জগতে বাস করত। সার্জি অবাক হয়নি, সে যুদ্ধ নিয়ে এমন মেতে উঠেছিল, তার কাছে এটা স্বাভাবিক বলেই মনে হোলো। সে অবাক হোত, যদি সে শুনতো, ভালিয়া একটা পুরো সপ্তাহ খবরের কাগজ না পড়ে বা বেতার না শুনে কাটিয়েছে। ভালিয়া কখনো কখনো বিজ্ঞপ্তির শব্দগুলো বারবার আবৃত্তি করত, কখনো বা যুদ্ধের গোটা গানেটা কি বুঝতে চেষ্টা করত, কখনো বা যুদ্ধের গতি অনুসরণ করতে গিয়ে থেমে যেত, থৈই হারিয়ে কোনও রণক্ষেত্রের পরিবর্তন, শিল্প সজ্জা বা 'ডুবুরী'র মানে বুঝতে পারত না। সার্জি তো এসব লিখত তাকে চিঠিতে।

আর সবার মতোই ভালিয়া এই সংকটে নাড়া খেয়েছিল, কিন্তু কি সব চলছে ভাবতে গিয়ে তার ব্যক্তিগত ভাগ্যের কথায় সে ফিরে এল। যখন আর সবাই জীবন থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তখন সে পেল তার জীবন...... সে কারখানায় কাজ নিলে। কেননা, এ তার আগের জীবন থেকে অনেক দূরে—সে অতীত থেকে এমনি করে বিচ্ছিন্ন হতে চাইল। কাজ শক্ত, কিন্তু তাতে সে খুশি হোলো শারীরিক ক্লান্তি তো মনের জল্পনাকে বাধা দেয় (ভালিয়া নিজেই আপন মনে বলে, এই তো ভাল! এমনি করেই আমি নিজেকে ধরে রাখব, সংযত করে রাখব)।

সার্জির কাছ থেকে বিদায় নেবার পর, সে তো বেঁচে নেই, সে বাঁচার প্রতীক্ষায় রয়েছে! প্রথমে ছিল দুঃখ আর আনন্দের মুহূর্তগুলি, তারপরে প্রায় একবছর ধরে ধৈর্য ধরে থাকা; আর এখন তো নিরাশা। এতে কাজের ঘড়ি হয়নি, তার ভিতরের এই অদল বদল কারখানার সঙ্গীরা লক্ষ্য করেনি। কিন্তু এখন সে কিছুতে মন বসাতে পারে না, অতীতের একখানা সুসংলগ্ন ছবি আজও তার পক্ষে অসম্ভব। সার্জিকে সে চিঠি লেখে তাতে অনুরাগ থাকে, কিন্তু তার সঙ্গে থাকে সবখান।

আগে ভালিয়া দেখেনি জীবনকে, মানুষের সে তারতম্য জানত না ; সে তখন ছিল বিশেষ ব্যক্তিদের মধ্যে বেঁচে, আর তারা ছিল তারই কল্পনা দিয়ে গড়া। যখন সে প্রতিরোধ-যোদ্ধাদের বীরত্বের কথা পড়ে তার মনে হয় বাবার কথাই সে পড়ছে। হয়তো তিনিও এখন ট্রেন উড়িয়ে দিয়েছেন অমনি করে।.......কিয়েভ-এ তার বন্ধুদের ভাগ্যে কি হল তার জানা নেই ; কিন্তু যখন কেউ কিয়েভ-এর কথা বলে, সে বড়ই মুসড়ে পড়ে। তার সামনে ভেসে ওঠে পরিত্যক্ত বাগিচা, খাড়া ঢিলা, হঠাৎ দেখা দেয় কুয়াশাভরা আবছা শহর—কালো, আর সবুজে মেশানো তার দৃশ্যাবলী।

সে নাতাশার চিঠি পেল। সে খবর দিয়েছে, একটি ছেলে হয়েছে তার। কিন্তু এখনো ভালিয়ার খবর নেই, সে সারারাত ধরে কাঁদলো—ভাসিয়া আর আর নাতাশার জন্য তার দুঃখ আর তার ভয়—সাজির কি কিছু হলো নাকি ? ...নিনা জর্জিয়েভনা চিঠি লিখেছেন, ভালিয়া এসে যেন তার সঙ্গে থাকে। এখানেও কাজ তুমি পাবে, তুমি আমি একসঙ্গে থাকলে অনেক সহজ হয়ে যাবে মনটা .... কিন্তু সে যায়নি, তার ভয় সার্জির যার সঙ্গে তার জীবন আরো দুঃসহ হয়ে উঠবে—সে হয়তো তার কামনার রাশ আলগা করে দেবে। এখানে সে একা—যদিও পরিচিত তার বহু। সে বন্ধুর মতো কারখানার সঙ্গীদের সাহায্য করে, তাই তাকে তারা দরদী বলে জানে! কিন্তু সে তার স্বভাবে কেমন গোপনভাব, কুসংস্কারে ছেয়ে গেছে তার মন! সে আপন মনেই বলে ; যদি সবুজ টুপী-পরা কোন মেয়েকে দেখি, তাহলে আজ আসবে চিঠি ; স্তমভ যদি কাল আমাদের বাসায় থাকে তাহলে ভালই হবে...আবার নিজের উপর চটেও যায় ঃ আমি যেন এক বুড়ী, এমনি ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে না যাই ! ...কিন্তু তবু নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভয় সবকিছু ছাপিয়ে ওঠে, সে বই খুলে পড়তে চেষ্টা করে, তারপর, আবার সরিয়ে রাখে ঃ বাস্তবের তুলনায় নভেলের জটিল ঘটনা তুচ্ছ বলেই মনে হয় !

শুধু সার্জির চিঠি তাকে জীইয়ে রাখে, কিন্তু তাও চিঠি আসে বে-নিয়মে।

কখনো বা সে পর পর তিন তিনখানা চিঠি দিলে, কখনো বা কয়েক সপ্তাহ চলে গেল, একখানাও চিঠিও এল না। হঠাৎ তাকে ভালবাসা জানিয়ে একটা ছত্র উঁকি মারলো চিঠির পাতায়, ভালিয়া খুশী হয়ে উঠলো তার আত্মা সজীব হয়ে উঠলো, তারপরে এল পল্টনের শুকনো জীবনের দীর্ঘ বিবরণ, অথবা সংক্ষিপ্ত—আমি ভাল আছি। চিঠি লিখো। অনেক—অনেক চুমু।

সার্জির শেষ চিঠি আসার পড়ে ভালিয়া হঠাৎ বুঝতে পারলো, সে এখন কোথায়। বহুক্ষণ সে বেড়ার স্বমুখে দাঁড়িয়ে রইলো। তার ওপরে ক্রাশনায়া ভেজদ্রার একখানা ছেঁড়া সংখ্যা লটকানো রয়েছে—তার চোখ পড়লো স্তালিনগ্রাদের এক বিবরণের উপর। সে পড়লো ইতিহাসে এর পূর্বে এমন যুদ্ধ কেহ আর দেখে নি। তার মনে হোল, সেখানে এখন নরক, সত্যিকারের নরক গুলজার হয়ে উঠেছে—এক মুহূর্তও সেখানে কেউ বেঁচে থাকতে পারছেনা... সার্জি আছে সেখানে—সেই নরকে...এ সার্জির বীরত্ব আর তার নিজের ভয়—তুয়ে মিশে এক মিশ্র অনুভূতি তাকে ছেয়ে ফেললো। এ এক এমন অন্ধ ভয় যা মানুষকে কাঁদায়, চিৎকার করে কাঁদায়!

ভালিয়া যা অনুভব করেছে, এমনি বহু লোক করছে—কিন্তু তাদের আছে নিদান—কাজে ডুবে যায় তারা, পরিবারের কথা ভাবে, পৃথিবীর নানা ঘটনা নিয়ে আলোচনা করে, বলে চার্চিল মস্কৌ এসেছেন সে কথা—দ্বিতীয় রণাঙ্গনের কথা যুগোশ্লেভিয়ার প্রতিরোধ-যোদ্ধাদের সংগ্রামের কাহিনী আর দৈনন্দিন জীবনযাপনের কষ্ট—দুধ পাওয়া যায় কি যায় না, এক বস্তা আলুর জন্যে অভিযোগ, আসন্ন শীতের জন্য জ্বালানি কাঠের খোঁজ-খবর—যুদ্ধ-সম্বন্ধে বক্তৃতা, অথবা 'রুশ' জনগণ নাটকটির প্রথম অভিনয় রজনীর কথা। কিন্তু ভালিয়া দৈনন্দিন জীবনপ্রবাহ সম্বন্ধে উদাসীন। খাবার ঘরে কি খাবার দেয়, তা সে লক্ষ্য করে না, নতুন পোষাকের স্বপ্ন দেখে না; খুব কমই থিয়েটারে যায়, যখন যায় সে মঞ্চের উপর কি ঘটছে তা দেখবার জন্যে অতি কষ্টে মনকে সে আটকে রাখে। তার সব কিছু ভাবনা, অনুভূতি একটি ব্যাপারে বিভোর

হয়ে আছে ঃ সার্জির কি হোলো? তার ভারসাম্যহীন স্বভাব, তার সমৃদ্ধ কল্পনাশক্তি, তার প্রখর ভাবপ্রবণতা তাকে একদিন টেনে নিয়ে গিয়েছিল শিল্পের ক্ষেত্রে, আজ সে তার ব্যথা বাড়িয়ে তুলছে। যখন সে যুদ্ধক্ষেত্রের গল্প শোনে, এখানে ওখানে কামানের গোলার গর্জন, মর্টার বোমা বিস্ফোরণ চলছে, তার চোখের সুমুখে ভেসে ওঠে চাঁদের জীবনহীন দৃশ্য—এখানে ওখানে জালামুখ আর হ্রদ, কাঁটা তারের বিরাট অরণ্য, পৃথিবী আরকের ধারায় ক্ষয়ে গেছে, বিবর্ণ হয়ে গেছে, বাজ এসে পড়েছে বিভ্রান্ত বধির হতবাক মানুষের উপর। যে দুঃস্বপ্ন এসে রাতে যন্ত্রণা দেয় মা, স্ত্রী আর প্রেমিকাদের, তা তাকে দিনেও হানা দিতে ছাড়ে না। সে লকেট পরে, তাতে সার্জির খুদে ফটো আছে, একখানা সার্টিফিকেট থেকে কেটে-নেওয়া ফটো! সে ওটা পরেছে এই জন্যে যাতে কল্পলোকের মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখগুলি জীবিতকে না আড়াল করে দেয়—এমনও তো সময় আসে, যখন সার্জির মুখ সে মনে করতে পারে না!

অক্টোবরের মাঝামাঝি কারখানার লোকেরা সমাবর্তন উৎসবের জন্য তোড়জোড় করতে লাগলো। তারা জানতো ভালিয়া সিনেমা ইনষ্টিটিউটে পড়ছে, আর নিজেদের মধ্যে তাকে তারা 'অভিনেত্রী' বলেই ডাকে—কখনো বা স্নেহের, কখনো বা বিদ্রূপের। ঝলতিয়াকভ পার্টির কর্মী, সে তাকে বললে, তোমাকে সাহায্য করতে হবে। থিয়েটার থেকে কয়েকজন আসছে, কিন্তু তারা বলেছে, আমাদেরও তাদের সঙ্গে অভিনয় করতে হবে ....প্রথমে ভালিয়া কোনো ভূমিকা নিতে চাইলো না, সে বললে, অনেকদিন ওসব করিনি.. না, আমি পারব না ..তার মনে আছে কুসংস্কার, সে এক ঘণ্টার জন্যেও তার অতীতে ফিরে যেতে চায় না। কিন্তু ঝলতিয়াকভ পেড়াপীড়ি করতে লাগলো, শেষে সে রাজিও হোলো।

যে বড় ব্যারাকটায় কারখানার ভোজনাগার ছিল, সেটা যেন কুয়াশায় ছেয়ে গেল। আলোগুলো ধাঁধিয়ে দিলে চোখ। জায়গা তো ভরতি। মানুষ দরজায়, বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলো, কেউ কেউ বা মঞ্চের উপরে চড়ে

বসলো। ভালিয়াকে তিনটি কবিতা আবৃত্তি করতে হবে—তিনটেই যুদ্ধের। সে তো প্রথমে অস্থির হয়ে উঠলো—ধর, যদি ভুলে যাই লাইনগুলি—যেন সে কখনো মঞ্চের কাছেই ঘেঁসেনি এমনি তার ভয়।

সে ভালই আবৃত্তি করলো, তার ভাবাবেগে ক'বার কবিতায় ছন্দে বাধা দিলে, কিন্তু তাতে ভালই হোল, সাজির প্রতি তার কামনা, ভাবনা, যে ভয়াবহ ছবির সার তার চোখের সুমুখে ভাসছে, তারই অভিব্যক্তি ঝরে পড়লো। সে কথায় এমন এক অর্থ সৃষ্টি করলো যার মানে সে একাই বোঝে। এই ক'টি কথা সে কি চমৎকারই না পড়লো ঃ

নীচে, নীচে তলোয়ার, পাদুকা আর রেকাবের ভিড়ে মেয়েটি তো খুদে, বড় খুদে। কোমর অবধি সেতো প্রিয়ের নাগাল পায়না।

সে নীরব, যেন গ্রীষ্মকালের শস্যের এক গোছা ফুল।

সেই আশ্চর্য তরুণী ঘুরে ঘুরে বেড়াল তার মাঝে...

ছোট্ট মেয়ের সম্বন্ধে কবিতাটি লেখা! সে এক ভয়ংকর যুদ্ধের মাঝখানে পড়ে গেছে। এর মানে তার কাছে দুর্বোধ্য। ভালিয়া ছত্রগুলি আবৃত্তি করলে, মুখে তার অপ্রতিভ হাসি। ও যখন হাসে, তখন ওর মুখখানা কেন যেন ভাল দেখায়। হঠাৎ দর্শকরা তার ভিতরে দেখলে সেই নীল চোখ ছোট মেয়েটিকে, সে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরছে...শেষ হবার বহু পরেও হর্ষধ্বনি উঠতে লাগল। সে দাঁড়িয়ে রইল মঞ্চে, বড় ম্লান মেয়ে, ঠোঁটে তেমনি রহস্যময় হাসি।

একজন সৈনিক দর্শকদের ভিতর দিয়ে পথ করে তার কাছে এগিয়ে এল। সে বললে, যে এই যুদ্ধে রয়েছে, এমন একজন মানুষ আপনার করমর্দন করতে চায়। চমৎকার আপনার বলবার ভঙ্গী। মনকে আঁকড়ে ধরে...

অরলভস্কী অভিনেতা, তার পালা ভালিয়ার পরে। সে হেসে বললে, আমাকে তো আপনি শেষ করে দিলেন। আপনার পরে আমার আর

কিছু বলা বৃথা। সত্যি বলছি, আপনার সত্যিকারের ক্ষমতা আছে। আপনার চর্চা করা উচিত…

অরলভস্কী ব্যগ্র হয়েই বললে। ভালিয়া তাকে মুগ্ধ করে দিয়েছে। সে এমন একজন অভিনেতা, যে বাজে অভিনয় দেখে হাঁপিয়ে উঠেছে, অথচ সে জানে এমন অভিনয় করা যেতে পারে যাতে পাথরের মতো মানুষেরও চোখের জল ঝরানো যায়, তারাও হাত মোচড়াতে-মোচড়াতে দেশের কথা ভেবে মৃত্যু বরণ করতে ছুটে যেতে পারে—অরলভস্কীরও হল ঠিক তাই। সেও অভিনয়কলাকে এমনিই ভালবাসে। ভালিয়া তার কথার উত্তর দিলেনা। ঝলতিয়াকভ গর্ব করে বললে,

উনি তো আমাদের এখানকার অভিনেত্রী। উনি যুদ্ধের আগে অভিনয় শিখতেন…

তরপর ভালিয়াকে সে অভিনন্দন জানিয়ে বললে,

অরলভস্কীর ভাল লেগেছে……

আগে হলে ভালিয়া আনন্দে লাল হয়ে উঠতো, মনে মনে ভাবতো, তা হলে আমার ভিতরেও কিছু শক্তি আছে; আমি অভিনেত্রী হব কিন্তু এখন অরলভস্কীর দিকে তাকিয়ে সে ভাবলে, ওর চোখ দুটি কি বিষণ্ণ; ওর বুকে নিশ্চয়ই আর সবার মতোই ব্যথা আছে…

একজন গায়ক কয়েকটা গান গাইলে। লোকজনের গোলমাল চারদিকে। প্রথম তুষার পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু ভালিয়া হেঁটে বাড়ি ফিরলো—সে যেন বিভোর—আবার তার চোখের সামনে ভেসে এল সবুজদ্যুতিময় জ্যোৎস্না ঢালা প্রান্তর, রাত, মৃত্যু। আস্তে আস্তে সে ডাকলে, সাজি ··কেউ উত্তর দিলেনা। সে তো এখানে নেই—সে আছে স্তালিনগ্রাদে।……

সতেরো

মামুলি একটি দিন, কালকের দিনের মতোই, এক সপ্তাহ আগেও এমনি ছিল। মর্টার গোলা সশব্দে পড়ছে, শেইলিকোর পন্টনের দিকে আটটা ট্যাঙ্ক এল। লেভিন আহতদের অস্ত্রোপচার করছে, বড় বড় বজরা বাঁ পাড় থেকে আসছে ডান পাড়ে। জোনিন দাড়ি কামাচ্ছিল, আরসী নেই, সে বার বার গালে হাত বুলিয়ে দেখছিল দাড়ি কোথাও আছে কিনা, আর আপন মনেই গাল পাড়ছিল। সে যতদূর সম্ভব ছিমছাম হয়ে থাকতে চায়। সার্জিকে অভিনন্দন জানিয়ে তিক্ত হাসি হেসে বললে,

দিনটা আর যাই হোক, ছুটির দিন বলে মনে হচ্ছে না...সে যুদ্ধের আগে উনিশশো-চল্লিশ সালে সমাবর্তন উৎসব কি করে কাটিয়েছিল তাই বলতে লাগলো। সে এক দীর্ঘ গল্প, আর সব কিছু মিলে-মিশে তালগোল পাকানো ব্যাপার। প্রথমে সামরিক কুচকাওয়াজ, তারপরে থিয়েটারের দুখানা টিকেট, কোজোলভস্কীর গান, তারপর ভাইয়ের ওখানে ভোজ, মারুশার সঙ্গসুখ। সার্জি তার কথা শুনছিল না, সে চায় ঘুমুতে। একবার যদি সে ঘুমুতে পারে—একটি বার!...পারীতে মোটর চালকের রাতে হর্ণ বাজানো নিষিদ্ধ। লাঁসিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, অনবরত কাণে ভেঁপুর শব্দ গেলে স্নায়ুর উপর তার ধকল পড়ে আর আয়ুও ক্ষয় হয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এখানেও মানুষের পথে বাঁচা সম্ভব......এর তো শেষ নেই : ডান দিকে আমরা ডান পাড়ে যেতে পারছি না, আবার বাঁ পাড়ে জার্মানরা আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারছে না। তারা দশ মিটার এগিয়ে আসছে, আমরা আবার তাদের ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছি। ক' মিটার তো জায়গা, কিন্তু হতাহতের সংখ্যা বহু। কর্ণেল আবার সৈন্য পাঠাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

পণ্টনের খবরের কাগজ এল, তার শিরোনামা লাল কালীতে ছাপা—পঞ্চবিংশতি শুধু এই কথাটি। যখন তার সাত বছর বয়েস, তখনকার কথা মনে পড়লো। তাকে প্লেটের ঝনঝনানি। মা তাকে জানালার কাছে যেতে দিতেন না, অথচ তার তো তাই-ই ছিল সাধ। বাবা বাড়ি ফিরতেন, বাহুতে তার লাল ফিতে বাঁধা। তিনি বলতেন, অভিনন্দন জানাই, নিনা জানো ক্যাডেটরা আত্মসমর্পণ করেছে......আগষ্টে বোমা পড়বার আগে বহু ছেলেমেয়ে এখানে ছিল। পঁচিশ বছর পরে তারা কি সেকথা মনে রাখবে?...তখন সব কিছু নিশ্চয়ই বদলে যাবে, আমরা ভাল পোষাক পরব, জুতোয় ঝক্‌ঝকে পালিস থাকবে, ওরা আমাদের ঐতিহাসিক ভাষায় বলতে বলবে আজকের কথা। কিন্তু স্যাপারদের গালাগাল তো আর ইস্কুলের ইতিহাসে বলা যাবে না!...পঁচিশ বছর তো অর্ধেক জীবন...বাইরে ওরা ভাবতো, আমরা দুবছর মাত্র টিকে থাকব, বড় জোর পাঁচ বছর—তারপরে ভেঙে পড়ব। হয়তো এখনো ওরা ভাবে, আমরা আর বেশিদিন টিকে থাকতে পারব না। কিন্তু আমরা থাকবই.... সাংঘাতিক যা কিছু তা আগষ্ট মাসে হয়ে গেছে......শুধু যদি আমরা একবার ঘুমে-তে পাই, তাহলে আবার নতুন করে শুরু করতে পারব...... শীগ্‌গিরই ভলগার উপরে বরফ জমতে শুরু করবে......কথায় বলে মানুষ বড় দুর্বল জীব।...হ্বার্থার নিষ্ফল প্রেমে মারা যান। কিন্তু একটা সিন্ধু-ঘোটককে যদি এখানে নিয়ে আসা হয়, সে তো একদিনও বেঁচে থাকবে না।......জোনিন বকে যাচ্ছে, কিন্তু তার কথা শুনছিনা, সে ক্ষুব্ধই হবে......

মারুসা আর্ট থিয়েটারের তো ভক্ত বললেই চলে, কিন্তু আমি চাই মঞ্চে যা ঘটবে, বাস্তব জীবন থেকে তা হবে আলাদা......

জোনিন অসহায় জীব নয়? হাঁ, আমরা দুর্বল, অসহায়, কিন্তু জার্মানরা আমাদের পিষে ফেলতে পারবে না। হয় তো এ কাহিনী থাকবে ইতিহাসে —জারিৎসিনের মতোই থাকবে...আমি স্তালিনের বক্তৃতা শুনেছি উনিশশো আটত্রিশ সালে। তিনি শান্তভাবে বলছিলেন, একটুও তাড়াতাড়ি বলেন

নি. মাঝে মাঝে রসিকতাও করছিলেন। আজও তিনি বলবেন ; না, কাল রাতে তিনি বলেছেন, তাঁর বক্তৃতা আজ আমরা পাব। কাল রাতে তো শোনা অসম্ভব ছিল, জার্মানরা পাড়ির মুখে জোর বোমা ফেলছিল··· হাঁ, তিনি শান্তভাবেই বলবেন। তিনি যে শান্ত থাকতে পারেন এ আমাদের ভাগ্য .....

জোনিন বললে, সার্জি শোনো, তুমি আজ সকালে যখন চলে গেলে, আমাদের সিগন্যালম্যানদের একজন গিয়ে এক দঙ্গল ফ্রিৎস-এর ভিতরে পড়লো। সে তিনজনকে ঘায়েল করে কোনোরকমে পালিয়ে এল। ওকে যা গালাগাল দিতে শুনলাম। আমি ওর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে। সে বললে, আমি আমার সাঁড়াশিটা ওখানে ফেলে এসেছি···কিন্তু ফ্রিৎসদের ভিতরে গিয়ে যে পড়েছিল সেকথা একটি বারও বললে না······

সার্জি হাসলো :

আমি ভাবছিলাম স্তালিনগ্রাদের এই মানুষরা বিশ বছর পরের নভেলে কি রকম করে কথা কইবে। 'ভোলগা···পুরানো বীরের দল....ইতিহাস আছে আমাদের দিকে তাকিয়ে...' এমনি কি হবে সে কথাবার্তা ? কিন্তু ঐ সিগন্যালম্যান যা বললে সত্যিই ঐতিহাসিক : আমার সাঁড়াশিটা ফেলে এসেছি.......

সে তো নিভেল নয়···কেন আমাদের মানুষরা অমন বড় বড় কথা বলতে পারেনা ? আমিই কি পারি ? আমি ফরাসীদের কথা শুনতে ভালবাসি, ওরা ভাবাবেগে এমন বলে যায়—মনে হয় তারা সবাই যেন এক—একজন হ্যুগো—কিন্তু হঠাৎ তাদের কথা শুনে বিব্রত হয়ে পড়ি, সার্টের হাতা ধরে টেনে থামাতে ইচ্ছে করে···মাদো তার নিজের কথা বলেছিল...'আমিও তো একজন মূক জুলিয়েং...' মাদোর কি হোলো ? সে তো ঘর বাঁধেনি —আর তার অস্থিরতা তো তার পরিবেশে যা ঘটছে তা থেকে আসেনি, সে তো এসেছে তার আত্মা থেকে......

কেন আমরা সে সীমান্তরেখা পার হতে পারিনা যেখানে স্বপ্ন আর জীবন আলাদা হয়ে গেছে? আমরা তা চাইন—আমিও না, সেও না। দুটি ছেলেমানুষ যেন আমরা···জানতাম, সবই অসম্ভব মাদো বলেছিল, আমরা দুজনেই আমাদের নিজের জীবনে ফিরে যাব, আলাদা ভাবে কাটাব।

জোনিন তখনো তার স্মৃতি রোমন্থন করছে।

গেসেল দেখলাম। উলানোভা নাচলেন। মরুসার ভাল লাগলো না, কিন্তু আমার কাছে চমৎকার লাগলো। সে যেন এক স্বপ্ন……

সার্জির জল্পনা চলছে—আমি তো মাদোকে কখনো ভুলবোনা। মানুষ ঐ জন্যেই বাঁচে না, কিন্তু বাঁচবার জন্যে তা তো চাই।

জোনিন হাই তুলছে

ঘুম পাচ্ছে আমার…

আমার কি পাচ্ছে না?

সত্যিই, ভারি মজার ব্যাপার না? একদিকে সারা ইউরোপ আর অন্য দিকে এক ফালি জমি—তবু আমরা আঁকড়ে ধরে আছি……

'সারা ইউরোপ' কেন?

ঐ একই কথা, প্রায় তো সব…দেখ, এইটে খাতে পেলাম। আমি নামটা পড়তে পারি—আনাতোল ফ্রাঁস—উপন্যাস একখানা। কোনো ফ্রিৎস হয়তো পড়ছিল……হাঁ, তোমাকে বলছি—সারা ইউরোপই চলে এসেছে।

যখন কোনো রাষ্ট্রদূত একটা বাড়ির উপর তাঁর পতাকা উড়িয়ে দেন, তখন সেই বাড়িটাই তার দেশ—এই তো সর্ববাদিসম্মত প্রথা……এখন ইউরোপ তো এখানে, আমরা এই খাতে পতাকা উড়িয়ে দিতে পারি। হু তা না হলে তুমি কি ভাব, আনাতাল ফ্রাঁস ফ্রিৎসদের বাহিনীতে আছেন?

আমি তাঁর বই পড়িনি। হয়তো মারুসা পড়েছে। আমি থিয়েটারে প্রায়ই যেতাম, কিন্তু বই বেশি পড়িনি। সারাদিন আঁকায় মুখ গুঁজে

রইলে, মাথা ছিঁড়ে পড়ে আর কি, তারপরে তো রাতে কোথাও যেতে চাইবেই। আমার ব্যালে ভারি পছন্দ।.......মারুসা বহু বই পড়েছে, সে তো আমাকে ঠাট্টা করে বলতো, যতো সব উদ্ভট ব্যাপারই আমার ভাল লাগে। সে নিজেও এসব ভালবাসে, কিন্তু এমন ভাণ করে যেন তার এসব ভাল লাগে না। কি জানি কেন সে ভাবে, ডাক্তারী পড়ছে, এসব ওকে মানায় না। কিন্তু দেখতো, হাসিখুশি মেয়ে নয় কি ?

জোনিন সার্জিকে একখানা ফটো দেখালে, মারুসা একটা বেড়াল ছানা নিয়ে বসে আছে। তার চোখ একটু ট্যারা। তাকে দেখে মনে হয়, ছোট্ট মেয়েটি ভারি দুষ্টামিভরা তার মুখখানা। লুগায় লড়াইয়ের আগে তুলেছিলাম...এই শেষ চিঠিখানা পেয়েছি তেসরা অক্টোবর তারিখের— এক মাসের উপর হয়ে গেছে।

সার্জি ভালিয়াকে চিঠি লিখতে বসলো, সে জানাতে চাইল চিঠিতে তার আবেগ, কামনা আর ভালোবাসা, সে তো তা অনুভব করে বুকে, কিন্তু প্রকাশ করতে তো পারলো না। সে নিজের কথা ভাবতে গিয়ে ভয় পেল —আর একমাস, কি দুমাস পরে হয়তো আমি কথা বলতেও ভুলে যাব.......

জোনিন জোরে হাই তুললো।

সার্জি বললে, একটু ঝিমিয়ে নাও। আমি মেজরের সঙ্গে দেখা করব, তাঁরা নিশ্চয়ই বক্তৃতা শুনেছেন।

জোনিন একখানা কাঠের উপর বসে আছে, সে চোখ খুলে ঘুমুচ্ছে, আর এলোমেলো স্বপ্ন দেখছে। মারুসা, একটা বজরা, ইউরোপের নিশান, গিসেল, সাঁড়াশি,.....মারুসা তার মাথাটা টেনে নিচে নিয়ে এল, তারপর বারবার চুমু খেল। নীরবতা—আধ ঘণ্টার বিরতি, বেশিই বা হবে।

খাতের কাছে একটা গোলা ফাটলো। জোনিন পন্টন হাসপাতালে জেগে উঠে ভাবতে চেষ্টা করলো কি হয়েছিল। আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, সার্জি গিছলো মেজরের সঙ্গে দেখা করতে......

স্তালিন কি বক্তৃতা দিয়েছিলেন ?

সার্জি উত্তর দিলে, তুমি কথা কোয়ো না।

তিনি কি বললেন ?

আমাদের দিন আসবে……

জোনিন শুনতে পেলনা, সে আবার চেতনা হারালো।

নার্স কাতিয়া একখানা নোট-বইয়ে নতুন বছর পর্যন্ত সবগুলি তারিখ লিখে রেখেছিল। সে প্রতিদিন রাতে এক-একটা তারিখ কাটতো। এবার সে নোট বই বার করে বেশ খুশি হয়ে সাত তারিখটা কেটে দিলে।

আর চুয়ান্ন দিন আছে।

কিসের ?

বছর শেষ হবার।

লেভিন ম্লান হাসি হাসলো।

তারপরে তো তুমি আবার তিনশো-পঁয়ষট্টিটি নতুন তারিখ লিখবে—তাই না ?

কাতিয়া উত্তর দিলে, বোধ হয় আর লিখবো না। কেমন আছে রোগী ? …..সে জোনিনের দিকে দেখিয়ে দিলে।

সার্জি নিঃশব্দে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইলো। আবার নীরবতা এসেছে… যদি মেজরের কাছে না যেতাম…….কি খেলা—বাজে, বাজে ! ……কিন্তু ফ্রিৎসগুলো সাবাড় হয়ে যাচ্ছে, ওরা একমাস আগে যেমন ছিল, এখন আর তেমনটি নেই…….স্তালিন পরিস্থিতি বুঝতে পেরেছেন, তিনি যদি কিছু বলেন, তা ফলবেই।…কিন্তু কখন ? জোনিনের কাছে সে তো অসময়েই আসবে।……হয়তো তা নাও হতে পারে। লেভিন তো বলেন, আশা একটু-আধটু আছে। ওর স্ত্রী বোধ হয় ইয়ারো শ্লাভল-এ আছেন। আমাদের চেয়েও ওদের খারাপ দিন কাটছে। এ ছবি কল্পনা করাত তো ভয়ানক……

সে ভালিয়াকে আর একখানা চিঠি লিখতে চাইলো, কিন্তু পাড়িতে আবার ডাক পড়লো তার। সে আর তখন ভাবলনা—স্ত্রী আর জোনিনের কথা, যুদ্ধে কি হবে সেকথাও না—কর্তব্যে সে কঠোর।

আঠারো

আমি বলছি বন্ধু, আমার স্নায়ুতন্ত্রের কথা রেখে দাও, এখন রোস আইনের কথা ভাব! রয় তো যে কোনো মুহূর্তে আলপেতের কথা এনে হাজির করতে পারে। জোসেফ মারা যাওয়ার পর নির্ভর করতে পারি এমন লোক তো ওখানে নেই। আমি এমন লোক চাই, জার্মানদের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠতা আছে··· ..

মোরিলো উত্তর দিলেন, সবারই তো ঘনিষ্ঠতা আছে। বিশেষ করে রয় তো··· ···

ল্যাঁসিয়ে নিজেকে মনে মনে ভৎর্সনা করলেন, ওর কাছে আমি একথা বলতে গেলাম কেন? ও তো আমাকে ঠাট্টা করতে পারলেই খুশি হয়।

কিন্তু মোরিলো তাঁকে সাহায্য করলেন, তিনি পিনাউদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। পিনাউদের বাতির মতো বুদ্ধিমত্তা নেই, তার মতো কাজের শক্তিও নেই। কাজে সে আবেগ সঞ্চার করতে পারে না। দশ বছর আগে যখন সবকিছুই শান্ত ছিল, সে বলত, আমি ভূমিকম্পের জন্যও ইনসিওর করতে চাই, কিন্তু আমরা তো জাপানে বাস করছি না··· খুব সাদাসিধে ভাবে থাকে পিনাউদ, অতিথিদের ভোজ দেয় খুব কম, এখানে ওখানে টাকা ছড়ায় না। সে তার বড় মেয়েকে মস্তিয়ে পিসোঁর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। সে লিয়োন্সের একজন ব্যবসায়ী, আর ছোট মেয়ে

আঁরিয়েতের বিয়ে হয়েছে এক তরুণ ব্যবহারজীবীর সঙ্গে। নাম তার ভের্ণেউ। সেই তরুণ ব্যবহারজীবীর ভিতরে প্রতিশ্রুতি আছে বড় হওয়ার। সে জানে রাজনীতি কর—চুক্তি, শেয়ার বাজারের দামের সঙ্গে যুক্ত, লোকসভার দলগুলির কার্যকলাপ সে দেখে, কমিউনিষ্টদের সে ঘৃণা করে, সোশালিষ্টদের বলে বোকা, আর চরম দক্ষিণপন্থীদের সম্বন্ধে বলে, ওরা এমনি শল্যবিদ যে য়্যাপেনডিক্সের সঙ্গে অন্ত্রগুলি অবধি কেটে বাদ দিয়ে দেবে। যখন যুদ্ধ এল, পিনাউদ এককাঁড়ি টাকা শীগ্‌গিরই করে ফেললো। তাতে অবাক হবার কিছু ছিল না। যে কারখানায় রেডিয়েটর তৈরী হচ্ছিল, সেখানে মর্টার তৈরী হওয়া আর আশ্চর্য কি? যখন যুদ্ধ এল দোর-গোড়ায়, তখন মর্টার তো গরম পিঠের মতোই বিক্রি হতে লাগলো। পিনাউদ তো তাই বলে, এটি ওর প্রিয় কথা। প্রথমে ফরাসীরা কিনলো তারপরে জার্মানরা। একথা না বললেও চলে যে, পিনাউদ উনিশ শো চল্লিশের ব্যাপার দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিলো। তার ওজনও তখন কমে যায়, পোষাক তখন গায়ে ঢল ঢল করতো। কিন্তু ব্যবসা হচ্ছে ব্যবসা। যখন দেখলে ব্যবসা ভালই চলছে, তখন নাগরিকের কর্তব্য সম্বন্ধে বিব্রতভাব তার দূর হয়ে গেল—সে ভুলে গেল। এত টাকা সে জীবনে করতে পারেনি। জার্মানদের সঙ্গে তার ব্যবহার অত্যন্ত সংযত। তার হাবভাব তাদের ভালই লাগলো—তার ভিতরে কেমন যেন গম্ভীর আর শোকের ভাব আছে। সে জোরে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলে আর নাক টানে—যেমন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় গিয়ে মানুষ করে তেমনি আর কি।

পিনাউদ শেয়ার বাজারের বেচা-কেনায় ডুবে গেল, একটা বিরাট ছাপাখানার মালিক হল সে, আর একরকম দাম না দিয়েই একজন ইহুদীর একখানা বাড়ী কিনে ফেললে। সে তার স্ত্রীকে বললে, এ বড় দুর্দিন, কিন্তু অভিযোগ করা তো পাপ। আমরা বেঁচে আছি ছেলেমেয়েদের ভরণপোষণ করছি, পলিন আর আঁরিয়েতের ভাল বিয়ে হয়েছে.......

কিন্তু ভের্ণেউ আঁরিয়েতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলে, সবাই সেকথা জানলো, জানলোনা শুধু আঁরিয়েৎ। কিন্তু তার প্রতি ভালবাসা দেখাতে সে কসুর করলে না, বরং সে যা চায় তাই এনে দিলে। পিনাউদ বলে, ওরকম লোক নিজের মাথাটা সব সময়ে জলের উপরে রাখে। তিনবছর আগে ভের্ণেউকে লোকে প্রায় 'লালমার্কা' মানুষ বলে ভাবতো, কিন্তু এখন সে জার্মানদের প্রসাদ দৃষ্টি পেয়েছে। তাদের কাগজে লেখে, দালাল হিসেবে কাজ করতেও তার বাধে না।

নলিনের স্বামী পিসোঁ যুদ্ধের শুরুতেই কারখানা বিক্রি করে দিয়ে জেনেভায় একটা হোটেল কিনে বসলো। চরম মুহূর্ত আসবার কয়েক সপ্তাহ আগে সে তার স্ত্রী আর সন্তানকে নিয়ে চলে গেল সুইজারল্যাণ্ডে। লোকে বলে সে ইংরেজদের ভক্ত। পিনাউদ মনে মনে ভাবে, ভের্ণউর সঙ্গে তার দেখা হলে কি তুমুল কাণ্ডই না হবে! ....কিন্তু পিনাউদ কখনো সীমা ছাড়িয়ে যায়না, সে জার্মানদের সহযোগিতা করে, কিন্তু মিত্রশক্তি লড়াইয়ে জিতলে তার আপত্তি নেই।

যখন মোরিলো পিনাউদকে রোস আইনের বিপদের কথা বললে, পিনাউদ অবাক হোলো না।

জার্মানদের সঙ্গে সহযোগিতা করা যায় বটে, কিন্তু রয়ের মতো শেয়ালদের আমি দেখতে পারিনা। আজকাল ব্যবসার জগতে অনেক ভুঁইফোঁড় এসে জুটেছে......বেশ, আমি লাঁসিয়ের সঙ্গে দেখা করতে রাজি......

পিনাউদ লাঁসিয়ের সহায় হবে জানালো। লাঁসিয়ে বুঝলেন, পিনাউদ রোস আইনকে বাঁচাতে পারে। জার্মানরা তাকে ছুঁতে সাহস করবেনা... পিনাউদ ব্যবসায় টাকা ঢালতে চায়। কিন্তু লাঁসিয়ে নিজেকে অপরিচিতের সঙ্গে জুড়তে রাজি নন—তিনি লিওআর রয়কে নিয়ে অনেক দুর্ভোগ পুইয়েছেন...

কথাবার্তা চলতে লাগলো। লাঁসিয়ের প্রতি পিনাউদের ভাবভঙ্গী যেন

খানিকটা মুরুব্বীর মতো। সে বলেই বসল যে, করবেইয়ের আবহাওয়া বা তাঁর হালকা স্বভাব ব্যবসায়ীর উপযুক্ত নয়;কিন্তু মনে মনে এই 'পাগলা' সম্বন্ধে হাসলেও তার গর্বে যাতে আঘাত না লাগে সে সম্বন্ধে হুঁসিয়ার রইল। তাঁর সঙ্গে এমন ভাবে কথা কইলো যাতে মনে হবে লাঁসিয়েই রোস আইনের প্রতিষ্ঠাতা।

লাঁসিয়ে পিনাউদ আর তাঁর স্ত্রীকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করলেন। কথাবার্তা বেশ অনুকূলভাবেই চলতে লাগল। মরিস মার্থাকে ঠাট্টা করে বললেন, আজকের এই ডিনারটা যেন বাক্‌দান উৎসব। হয়ত শীগ্‌গিরই বিয়েটা হয়ে যাবে। তিনি মোরিলোকেও ডিনারে নিমন্ত্রণ করলেন, কেননা তিনি হচ্ছেন ঘটক। নভেম্বরের বিষণ্ণ দিন, সকাল থেকেই বাড়ীতে বিজলী বাতি জ্বালা হয়েছে। সবাই হাঁচছে আর কাসছে। পিনাউদ মার্থাকে পছন্দ করে ফেললো, তার সরলতা আর গৃহিণীপনা ভাল লাগলো। তারা বেশ প্রাণখোলা আলাপ করলো, যুদ্ধের আগের দিনের কথা নিয়ে আলাপ হোল। কিন্তু লাঁসিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন! মোরিলো বড় দেরী করছে, কোথায় গেল লোকটা? ভেড়ার মাংস বেশী সিদ্ধ হয়ে যাবে, আর তা ঠাট্টা-তামাশার ব্যাপার তো নয়।......

তারা মোরিলোর জন্যে আর বসে থাকতে চাইলেন না, টেবিলে এসে বসলেন সবাই। লাঁসিয়ে রেগে গেলেন। পিনাউদ তার রাগ থামাবার চেষ্টা করলেন:

মোরিলো কি ধাতের লোক জানেনতো। সে হয়তো রোগী দেখতে শহরের আর এক প্রান্তে ছুটেছে; তাও ফি নেবেনা লোকটা। এই রকম লোকের সমাধির উপরে স্মৃতিস্তম্ভ তোলা উচিত। যারা সত্যিকারের কাজ করে তারা তো এ দেশে প্রশংসা পায় না। যারা জোচ্চোর প্যাঁচালো লোক তারাই যত সম্মান পায়। এই যে অন্তিম ঘনিয়ে এল তার একটা কারণ তো এই.......

ল'াসিয়ে উত্তর দিলেন, জার্মানরা আমাদের অনেক শিখিয়েছে। কিন্তু তবুও বিদেশীদের উপর নির্ভর করা বড় শক্ত। ম্যঁসিয়ে পিনাউদ, আপনি কি মনে করেন, এর একদিন শেষ হবে?......

মার্থা মরিসের দিকে ভৎর্সনার চোখে তাকালোঃ কেন ওকথা সে বলছে! পিনাউদকে ভাল বলেই তো মনে হয়, কিন্তু আজকের দিনে কাউকে কি বিশ্বাস আছে? ...ল'াসিয়ে তাঁর স্ত্রীর চোখের চাউনির মানে বুঝতে পারলেন, কিন্তু তিনি যা বলেছেন তার জন্যে তিনি দুঃখিত নন। তাকে পিনাউদের সঙ্গে কাজ করতে হবে, তাই তাঁকে সবকিছুই আগে জেনে নিতে হবে। তিনি পরে যে হকচকিয়ে যাবেন তা আর চান না।

পিনাউদ উত্তর দিলে, শেষে জার্মানরা চলে যাবেই। ওদের বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশ নেই। বেশ ভদ্র ব্যবহারই করছে, কিন্তু আমি ফরাসী, আপনার মনের কথা আমি বুঝি......ভের্নেউ বলে, ওরা যুদ্ধে জিতলে ফ্রান্স ছেড়ে চলে যাবে, অন্য দেশগুলি থেকেও চলে আসবে...... তাদের দরকার মতো তারা শুধু সরকার বসাবে এই সব দেশে......

মার্শাল যতদিন বেঁচে আছেন, তাঁকে কেউ সরাতে সাহস করবে না।

মার্শাল তো নামে কর্তা, জার্মানরা দিয়েতের থেকে লাভালকে বেশী পছন্দ করে, আবার লাভালের থেকে বেশী পছন্দ করে দারল'াকে। এর ভিতরে বেশি-কম আছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, আর বিশ কি ত্রিশ বছর পরে সারা ইউরোপই জার্মান হয়ে যাবে।... ..

মোরিলো এবার ঢুকলেন, নাক ঝাড়ছেন, কাসছেন। মার্থা মার মতো তাকে ভৎর্সনা করলো।

নিজেকে নিজেই শাস্তি দিলেন, এখন গরম-করা খাবার খেতে হবে··· ডাক্তার মোরিলো কিছুক্ষণ ধরে কথা বললেন না। স্যুপ খেলেন, কখনো বা আড়চোখে একবার ল'াসিয়ে আর একবার পিনাউদের দিকে তাকিয়ে

দেখলেন। তারপরে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে জোরে হেসে উঠলেন ঃ এই তাঁর অভ্যাস।

ভের্নেউ আজ আর ঘুমুতে পারবে না। ওর জন্যে আমাকে একটা ঘুমের দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। শোননি তোমরা? ইংরেজ আর মাকিনরা আলজিয়ার্সে এসে নেমেছে।

পিনাউদ তার চাঞ্চল্য দমন করে রাখতে পারলে না। এই তো আশা করা গিয়েছিল, কিন্তু অনেক জিনিষ তো আশা করা যায়, তবু তারা যখন আসে তাক লাগিয়েই দেয়······সে প্রায়ই নিজেকে বুঝিয়েছে যদি মিত্রশক্তি জয়ী হয়, সে তাঁদের প্রথম অভিনন্দন জানাবে। কে সাহস করে তাকে ঘাঁটাবে? সাধুটা কে? পিসোঁর পক্ষে খাপ খাইয়ে না নেওয়া সহজ—সে এখন জেনেভায় আছে।······কিন্তু পিসোও স্বীকার করে তার শ্বশুর একজন খাঁটী ফরাসী.......তবুও পিনাউদের অস্বস্তি; ওরা খোঁজ-খবর নেবে। জিজ্ঞেস করবে, ও কোথায় পেল ছাপাখানা? কি করে বাড়ীখানা কিনলো? জার্মানদের অধীনে তার কারখানায় কেন তিন সিফ্‌টে কাজ হয়েছে? যারা তাকে ঈর্ষা করে তারাই তখন ওদের কাজে লেগে যাবে। কমিউনিষ্টরা বেরিয়ে আসবে তাদের গর্ত থেকে, অমনি উনিশশো-ছত্রিশ সালেও ওরা বেরিয়ে এসেছিল.......ভবিষ্যৎ তো অন্ধকার।

ডাক্তার মন্তব্য করলেন, মসিঁয়ে পিনাউদ, আপনি যেন ঘাবড়ে গেলেন মনে হচ্ছে।

এই বুড়োটার ঔদ্ধত্য দেখ তো, পাকা সৈনিক। মার্থা বুঝতে পারলো কি বোকার মতো মন্তব্যটা হয়েছে, সে তাই পিনাউদ উত্তর দেবার আগেই বললে,

আমি বুঝিনা, আপনারা কেনই বা খাবার টেবিলে রাজনীতির কথা তুলবেন।

পিনাউদ তার কথায় সায় দিলে, সে একটা পাকা পিয়ার নিয়ে খোসা ছাড়াতে লাগলো।

লাঁমিয়ে হাসলেন। তাহলে ওরা এসে নেমেছে। হয়তো যুদ্ধের আগের বছরগুলির সুখের দিন আবার ফিরে আসবে? কিন্তু মার্সেলিনকে তো আর কবর থেকে জাগিয়ে তোলা যাবে না, কিন্তু তিনি মার্থাকে নিয়ে গেলিনোতে যেতে পারবেন...হ্যাঁ, বার্তি সম্বন্ধে ঐ শোকোচ্ছ্বাস আমি লিখেছিলাম বটে, একটু উত্তেজিত হয়েই উঠেছিলাম তখন। একটু উত্তেজনা এসেছিল—এই কথাই আমি বলব, কথাগুলি মেপে জুপে বলিনি....তাতে কি হয়েছে? যাই-ই হোক, বার্তি তো আমার জামাই। এর সঙ্গে রাজনীতির কি সম্বন্ধ। আমি পিনাউদ নই, জার্মানরা আমার উপর নির্যাতন চালিয়েছে। লুই ইংলণ্ডে চলে গেছে, মাদোও নিশ্চয়ই সেখানে আছে; এমনি শিক্ষাই আমি আমার সন্তানদের দিয়েছি।......কে জানে মিত্রশক্তি শীগ্‌গিরই মার্সাইয়ে আসবে কিনা। আলজিয়ার্স থেকে মার্সাই তো বেশি দূর নয়.........মার্সাইতে মার্শাল তাদের স্বাগত জানাবেন। তিনি যে কতখানি খুসি হয়েছেন আমি কল্পনায় দেখছি।......লাঁসিয়ে মৃদু হাসলেন। তাঁর মনে হোল পিনাউদের সমুখে খোলাখুলি মনের কথা বলা অবিবেচকের কাজই হবে—মার্থা অসন্তুষ্ট হবে। তাই তিনি তার এই হাসির ব্যাখ্যা করতে বসলেন।

এমন চমৎকার পিয়ার বহুদিন খাইনি......

মোরিলো পিয়ারের রস আর লালায় মাখামাখি হয়ে গেছেন—এখনও তিনি হাসছেন, খবরটায় যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে তিনি খুশি। কিছুক্ষণ পরে তিনি বললেন,

তাহলে ওরা এসে নামলো। এতে অবশ্য রোমহর্ষক কিছু নেই। ওরা আমাদের উপনিবেশগুলি কেড়ে নেবে। জার্মানদের সঙ্গে যদি লড়তেই চাইত, তাহলে তারা অন্য জায়গা বেছে নিয়ে নামতো ...

অতিথিরা চলে গেলে লাঁসিয়ে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে বসলেন, তিনি ঠিক করলেন, এই সময় পিনাউদের সঙ্গে কোনো ব্যবসার সম্পর্ক গড়ে তোলা ঠিক হবে না। যুদ্ধ এখন এসে পৌছচ্ছে তার শেষ সীমায়। পিনাউদ জার্মানদের সঙ্গে যুক্ত। আলপের্ত ইহুদী বলে এখনো আমি নানা ঝঞ্ঝাট পোয়াচ্ছি। জার্মানরা চলে গেলে তখন ওরা আমাকে প্রশ্নে প্রশ্নে অতিষ্ঠ করে তুলবে, কেন আমি পিনাউদের অংশীদার ছিলাম। ওতো একজন ইহুদীর একখানা বাড়ী দখল করে বসেছে......তার চেয়ে অংশীদার না নেওয়াই ভাল, নিজের জন্যই শুধু দায়ী থাকব। .....লাঁসিয়ে মার্থাকে বললেন,

তুমি তো জানো মার্সেলিনকে আমি কত ভালবাসতাম। নিয়তি আমাকে বিপত্নীক করে ছাড়লো, তারপর ভাগ্য তোমাকে পাঠিয়ে দিল আমার কাছে। আমার ভাগ্য ভাল, সত্যিই একজনের হৃদয়ের সঙ্গে আর এক-জনের হৃদয়ের বন্ধন, এযে কত সুন্দর..... কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে একেবারে আলাদা—যারা একা ব্যবসা চালায় তারাই এখানে সুখী। পিনাউদ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তিনি বেচারী বাতির মতো ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছেন না। আমার তো মনে হয়, আমাদের জয়লাভের পর তার কোন বিপদ হবে না। তবুও তাঁর সঙ্গে আমার এখন ব্যবসা না করাই ভালো...

দু'দিন পরে লাঁসিয়ে শুনলেন জার্মানরা দুপক্ষের সীমারেখা পেরিয়ে লিওন্স আর মার্শাই দখল করেছে। তাহলে তারা সত্যিই আত্মরক্ষা করতে চায়, দক্ষিণ অঞ্চলকে আতলান্তিক উপকূলের মতোই সুদৃঢ় করবারই তাদের ইচ্ছা। মোরিলো ঠিকই বলেছেন, মিত্রশক্তির কোনো তাড়া নেই। ইঁদুরাই বিড়ালকে মারবার জন্য বড় বেশী ব্যগ্র। একদিন হয়তো মিত্রশক্তিই জিতবে। কিন্তু তার আগে রয় আমার কবরের উপর দাঁড়িয়ে অন্ত্যেষ্টি প্রার্থনা করবার বন্দোবস্ত করবে।

কদিন লাঁসিয়ে মানসিক দুশ্চিন্তায় কাটালেন, তারপর পিনাউদের শর্ত মেনে নেবেন বলে ঠিক করলেন।

মার্থা, তুমি তো জানো সেদিন আমি একটু উত্তেজিত হয়েই পড়েছিলাম। জার্মানরা এক প্রচণ্ড শক্তি। একশো কি তার চেয়ে কিছু বেশি রুশ স্তালিনগ্রাদের সেলারে লুকিয়ে আছে বলে মোরিলো খুসি হতে পারে। কিন্তু এত বাগাটেলি খেলা। আলজিয়ার্স আর মার্সাইয়ের ভিতরে আছে সমুদ্র। যা সত্য, যা বাস্তব, তা তো স্বীকার করতেই হবে। পিনাউদ রোস আইনকে বাঁচাতে পারবে। আর তার জামাই ভের্নেউ তো পাকা দালাল। আমি শুনেছি আবেৎস-এর সঙ্গে তার খুব ঘনিষ্টতা আছে…… …

পিনাউদ আর ল াসিয়ে তাদের বৈষয়িক কথাবার্তা শেষ করে এবার রাজনীতি নিয়ে আলাপ শুরু করলেন। গত দশ দিন ধরে সবকিছু যেন ওলট পালট হয়ে গেছে—মিত্রশক্তি এখন আলজিয়ার্সে আর জার্মানরা মার্শাইতে।

ল াসিয়ে বললেন, আমি কখনো ভাবিনি যে দার্লা মার্শালের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

দার্লাকে আমি দোষ দিই না। সে কি করবে?……বহু জীবন তো সে বাঁচিয়েছে। আপনি কি নিশ্চিত যে এই জন্যই মার্শাল তাকে সেখানে পাঠান নি?

ল াসিয়ে অবাক হলেন! পিনাউদ আমারই মত ভাবে। হাঁ, তা হবেই তো, পিনাউদ যে একজন ফরাসী—সে আমার মতো, মার্শালের মতোই ভাবে………

ম্যাসিয়ে পিনাউদ ঘটনা এত জটিল যে গোলমাল হয়ে যায়। আমি ‥ আমি মার্শালকে বিশ্বাস করি………

মার্শাল তো নামে মাত্র নেতা……কিন্তু তাঁর চার পাশের মানুষরা ফ্রান্সকে অরাজকতা থেকে বাঁচাতে চাইছে। সব চেয়ে মারাত্মক উপদ্রব হচ্ছে—কমিউনিজম। যে কেউ সহযোগিতার বিরোধী হতে পারে, কিন্তু পূর্বরণাঙ্গনে সৈন্য পাঠাবার প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানাতে পারে। প্রতি

ফরাসীর কর্তব্য হচ্ছে বোলশেভিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। এ বিষয়ে লাভালের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত।

লাভাল হিটলারের সঙ্গে দেখা করতে মিউনিকে গেছে। আপনার কি মনে হয় না যে একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে ব্যাপারটা ?……

একটুও না। এ তার কর্তব্য। যেমন দাঁর্লার কর্তব্য হচ্ছে আমেরিকান-দের সঙ্গে চুক্তি করা……আমাদের যে কোনো পরিস্থিতির জন্য তৈরী থাকতে হবে। আমাদের নিজেদের ফরাসী নীতি রয়েছে। …….আমি খুব খুশি যে আমেরিকানরা দাঁর্লা আর ঝিরেকে মেনে নিয়েছে। কমিউনিষ্টরা এবার দেখবে যে মিত্রশক্তি জিতলেও তাদের কোন ভরসা নেই।……

লাঁসিয়ে অবাক হলেন, এমন অবাক তিনি আর হননি। তিনি পিনাউদকে একজন টাকাখোর মহাজন বলে জানতেন, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সে একজন ভাবুক, সেও এক খেলা খেলছে; আর বেশ চড়া বাজি রেখেই খেলছে……

সেইদিন সন্ধ্যেয় লাঁসিয়ে গেলেন মোরিলোর সঙ্গে দেখা করতে, তাঁর আবিষ্কারের কথা বলতে যাওয়াই উদ্দেশ্য ছিল। তিনি গিয়ে দেখলেন একটি অন্ধকার কামরায় গম্ভীর হয়ে বসে আছেন মোরিলো। স্ত্রী বাড়িতে নেই। লাঁসিয়ে নিজের চিন্তায় এমনি বিভোর যে ডাক্তারের মনের অবস্থা কি বুঝতে পারলেন না। তিনি ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠলেন ঃ

এবার বোঝা গেল, পিনাউদ শুধু ব্যবসাদারই নয়, সে একজন রাজ-নীতিজ্ঞ আর দেশভক্তও বটে। সে তো এই কথা বলে, আমাদের যে কোনো পরিস্থিতির জন্য তৈরী থাকতে হবে।……

আমারই তা বলা উচিত ছিল। তার মেয়েরাও দুই সীমান্তেই কাজ করছে। মরিস, তুমি নিশ্চিন্ত হতে পার, ওর সঙ্গে থাকলে তোমার কোনো ভয় থাকবে না। ও-একটা দু-মুখো পাজি। ও যদিও ঠিক দাঁর্লার মতো নয়, তবে রোস আইনেকে বাঁচাবার মতো বুদ্ধি ওর আছে।

তোমার কি মনে হয় দাঁর্লাও পাজি ?

সেটা নির্ভর করছে পাজি কথাটা বলতে কি তুমি বোঝ—তার উপর। সাধারণত দেখতে গেলে যে দাস সে যে প্রভুর প্রতি বিশ্বাসী থাকবেই তার তো কোনো ধরা-বাধা নিয়ম নেই। দাঁর্লা তার মনিব বদল করেছে......লাভাল, দাঁর্লা মার্শাল-ওরা সবাই এক গোষ্ঠি......

এবার লাঁসিয়ে লক্ষ্য করলেন মোরিলো যেন আজ প্রকৃতিস্থ নেই—তিনি আজ একবারও হাসেননি......

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কিহে, শরীরটা খারাপ নাকি ?

আমার ?...আমাদের এই বয়সে তাতে আর কি যায় আসে ? এখনো যে চলছি-ফিরছি এই জন্যেই তো খুশি থাকা উচিত। যুবকরা মরছে... পিনাউদ আর দাঁর্লা ঠিক চেষ্টা করছে কোন পথকে সমর্থন করবে—মার্কিন মুরুব্বী না জার্মান প্রভুকে। আর এর মধ্যে ছেলে-ছোকরারা মরছে...

রেনে কোথায় জান নাকি ?

ও দক্ষিণ অঞ্চলে আছে...হয়তো জার্মানরা এরই মধ্যে ওকে গ্রেফতার করে ফেলেছে......

লাঁসিয়ে জানতেন ডাক্তারের বড় ছেলে রেনে জার্মানদের সঙ্গে বিবাদ বাঁধিয়েছিল। ছাত্রদের বিক্ষোভ প্রদর্শনের পরই সে পালিয়ে মুক্ত এলাকায় চলে যায়।

বন্ধু, তোমার মন আমি বুঝি, আমিও তো সইছি। লুইর কি হোলো আমি জানি-না। হয়তো সে আলজিয়ার্সে আছে, হয়তো বা হত হয়েছে। মাদো কোথায় আছে তাও জানি না।.. হয়তো তোমার পিয়ের ওদের সকলের থেকে ভাল আছে......যুদ্ধবন্দী হওয়ায় দুঃখ আছে, কিন্তু তবু তো সে এই মারাত্মক খেলা থেকে বাইরে রইলো। যুদ্ধ যখন শেষ হবে, তখন সে তো বাড়ি ফিরবে .....

তা জানিনা। পিয়ের-এর একজন বন্ধু কাল দেখা করতে এসেছিল।

তারা 'স্তালাগ-এ' একসঙ্গে ছিল। জার্মানরা তাকে ছেড়ে দিয়েছে—এখন সে যক্ষ্মারোগের শেষ অবস্থায়। সে আমাকে বললে, কি করে তারা কাটাত বন্দী শিবিরের জীবন। আলুর খোসার ঝোল খাদ্য, ব্যারাকগুলো গরম রাখবার বন্দোবস্ত নেই, আর কঠোর পরিশ্রম। আর তাও নাকি তাদের অবস্থা ছিল রুশদের থেকে ভালো। রুশ মেয়েরা তাদের সঙ্গে কাজ করে, তারা তো উপোসে আর আমাশয়ে মরছেই, উপরওয়ালীরা তাদের পিটছে। এ এক খাঁটি বর্বরতা।......ঐ ছেলেটিই বললে, পিয়ের একটি রুশ মেয়ের সঙ্গে মিতালি পাতিয়েছে, তারা পরস্পরকে সাহায্য করে। সে আমুদে মেয়ে, ওকে সান্ত্বনা দেয়, ভুলিয়ে রাখতে চায়। পিয়ের দুর্বল, সে বহু কষ্টে ভারী জিনিস তোলে আমার তো মনে হয়, ওর দুর্বল ফুসফুস নিয়ে ও বেশিদিন টিকবে না।

এই প্রথম লাঁসিয়ে মোরিলোর চোখে জল দেখলেন। ডাক্তার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন,

তুমি দেখছ তো, স্তালিনগ্রাদের ব্যাপারে আমি ঠিকই বলেছিলাম। এটা কূট রাজনীতি নয়। পারী সোয়ার তুমি পড় তো? জার্মানরা লেখে, জার্মান সৈন্যবাহিনী যে কোনো পরিস্থিতির জন্য তৈরী আছে। বিজয়ী যারা তাদের পক্ষে এ রকম ভাষা প্রয়োগ তো অস্বাভাবিক......। জানো মরিস, আমার সন্দেহ হয় শেষ দেখতে বেঁচে থাকব কিনা, আর সত্যি কথা বলি, সে ইচ্ছেও নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার এইটুকুই আনন্দ যে, রুশরা ওদের বাধা দিতে পেরেছে, ওদের অগ্রগতি থেমে গেছে। আমার এই আনন্দ যে, পিনাউদ ভয় পেয়েছে, দার্লা আমেরিকানদের সাহায্য চাইছে, আমেরিকানরা ও তার সাহায্য প্রার্থী।

লাঁসিয়ে ভাবলেন, কি ভয়ানক মানুষ! অন্য লোকের বিপদে ওর আনন্দ! কিন্তু ছেলে-ছোকরাদের জন্যে দুঃখ হয়—সত্যিই দুঃখ হয়। লুই, রেনে, পিয়ের ওরা কোথায়? মাদোর কি হোলো?......

উনিশ

এরই মধ্যে একমাস হয়ে গেল। মাদো কাটাচ্ছে তার যাযাবর জীবন। একটা শহরে গিয়ে সে পৌঁছোয়, একটা পথের খোঁজ করে, একখানা বাড়ি, একটি মানুষ তার লক্ষ্য, তাকে সে আবোল-তাবোল কথা বলে। যেমন বলে, তোমার পিসীর ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে। কখনো বা বলে, আমি একটা ক্যানারী পাখী বিক্রি করব। এমনি করে সে নির্দেশ দেয়, ইশতেহার বার হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করে। ডিনামাইটের কি ব্যবস্থা হয়েছে তারও খোঁজ নেয়, আবার চলে যায়। সে দূতীর কাজ করছে। তার চেহারা দেখে সন্দেহ হয় না। সে এক মুহূর্তে নিজেকে হাবাগোবা গ্রাম্য মেয়েতে পরিবর্তিত করতে পারে, সাজতে পারে চরিত্রহীনা স্ত্রীলোক, অথবা বেশ ভূষায় পটু কোনো অভিজাত তরুণী। সে পোষাক বদলাতে পারে সহজে, হাবভাব এমন কি বলবার ভাষা পর্যন্ত বদলে যায়; সে পাকা শহুরে মেয়ে হতে পারে, আবার সরল গ্রাম্য মেয়ে হতেও তার ঠেকেনা। কেঁদে কেঁদে বলে তার বাবা মারা যাচ্ছে, আবার মাথার চুলের কেয়ারীর হাল ফ্যাশান নিয়ে অনর্গল বকে যায়, যে কোনো পরিবেশে বেশ খাপ খাইয়ে নেয়, ভিড়ে মিলে মিশে যায়। তার সাথীরা কথায় কথায় বলে, ফ্রান্সকে পাঠাও, ও ঠিক কাজ হাঁসিল করে ফিরবে।.......

শহরের পর শহর মিলিয়ে যায় তার পথের দুধারে। কুয়াশাঘেরা লিউন্স, অন্ধকার গলি, পিছনের উঠোন, পথের গোপনতা, হৃদয়ের গোপনতা; মার্শাই—পাঁচ মিশেলি ভিড় গোলমাল; সেখানে বন্দরের বৃদ্ধা বেশ্যারা বীরাঙ্গনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, মানবতাবাদী ভাবুকের দল কাফি, নকল শিল্পদ্রব্য, দেশপ্রেমিকের প্লাসটারের মাথা ফেরি করে বেড়ায়; ধোঁয়া ভরা সাঁত এতিয়ে আর সেই ছেনাল বুড়ীর মতো শহর নিস্। হেমন্তের বৃষ্টি ট্রেনের

জানালায় এসে ঝাপটা দিয়ে যায়, প্রান্তরে অসড় গরুগুলি—তাদের পেরিয়ে ছুটে চলে ট্রেন, আঙুরের ক্ষেতে চাষীরা জড়ো হয়েছে ফসল কাটার কাজে, কোনো নদীর ধারে মেয়েরা কাপড় নিঙড়াচ্ছে—পাহাড় ঢালু হয়ে মিশেছে সমুদ্রে, খাড়া পাহাড় উঠে গেছে কোথাও। এমনি করেই চলে যাদো।

তার চারপাশে জীবন চলেছে নিজস্ব ধারায়, আঙুর ক্ষেতে যারা ফসল ফলায় তারা বলছে উনিশ শো বিয়াল্লিসে হবে সেরা খন্দ। গ্রামের ছেলেরা কিনছে জাল কাগজ, তারা জার্মানীতে যাতে চালান না যেতে হয় তো এড়াবার জন্য ব্যস্ত। নব বিবাহিত দম্পতি একটা পোষাকের আলমারী বা খাটের জন্য কুপন কিনছে, স্কুলে ছেলেমেয়েরা শুনছে কি করে বুড়ো ঠাকুদা পেতাঁ ফ্রান্সকে বাঁচালেন সেই গল্প। লোকে বিক্রি করছে জার্মানদের মদ; বিক্রি করছে মসেজ, কমলালেবু, পুরানো দিনের মিনেচার ছবি, সুগন্ধি, আর অশ্লীল ফোটো, আর তাদের কাছ থেকে কিনছে সিগারেট, ব্লেড আর য়্যাসপিরিন। সবাই ব্যবসা করছে, দর কষাকষি করছে, কিনে আবার বেচছে। বহুলোক বড় মানুষ হয়ে গেছে, বাড়ি সাজিয়েছে ছবিতে, বড় বড় ভোজ দিচ্ছে। ফ্রান্স দেখছে বিবাহের বেশে সজ্জিত বধূদের, মাদের দেখছে সন্তান সঙ্গে রবিবারের সেরা পোষাকে, মাতাল স্বাপ্নিক আর প্রেমিক-প্রেমিকাদের; বুড়োরা খেলছে নানা খেলা। কিন্তু আমরা কি নিঃসঙ্গ! সে একথা ভেবেছে, নাড়াচাড়া করেছে মনে। আমাদের দলে কতজন আছে! দশ হাজার, একলাখ হবে বটে, কিন্তু যুদ্ধ যেন তাদের কাছে সুদূরের ব্যাপার। তারা বলে, মিত্রশক্তি আছে আফ্রিকায়। স্তালিনগ্রাদ এখনো টিকে আছে... কিন্তু কতদূরে যেন—স্তালিনগ্রাদ আর আলজিয়ার্স। কিন্তু জার্মান সদর ঘাঁটি তো ক' পা গেলেই দেখা যায়। টাকা রোজগার করা, ভাল খাওয়া-দাওয়া এখানে সম্ভব, আর তাতেও যদি মন না মানে, তুমি লণ্ডন রেডিও কি বলে তা শুনতে পার। কিন্তু একটা বেফাঁস কথা বেরিয়ে গেলেই হয়েছে, তখনি চালান দেবে জার্মানীতে, অথবা গেষ্টাপোদের ঘাঁটিতে নির্মম নির্যাতনে

মেরে ফেলবে...একজন আইনজীবী এক রাতে ফ্রান্সকে ঠাঁই দিয়েছিলেন, তিনি তাকে বললেন, শুধু পাগলরাই ওদের সঙ্গে লড়তে পারে ; তারপর আরও বললেন, আমিও তো পাগল—নিজেকে তিনি বীর নায়ক ভাবেন। মানুষ ফিসফিস করে কথা কয়, আর সেই ফিসফিসানি হেমন্তের অবিরাম বর্ষার মতোই হানা দেয় মাদোর উপর। মানুষ শুধু জার্মানদের ভয়ই করে না, তারা পরস্পরকে ভয় করে, ভয় করে প্রতিবেশীদের, নিজেদের আফিসের সহকর্মীদের, যারা বেশি কথা বলে, যারা দালাল, যারা ভাড়া করা বা স্বেচ্ছায় গোয়েন্দা, যারা নকল কমিউনিষ্ট আর আছে দুমুখো, কাগজওয়ালা মানুষ—তাদের দুটি বিবেক। কোথায় সেই ফ্রান্স—যে ফ্রান্স পথের মোড়ে মোড়ে চেঁচিয়ে উঠতো, নিজের স্বভাব, তার প্রতিরোধ প্রাকার, আর কবিকে নিয়ে গর্ব করতো ? যখন একজন জার্মান পথ দিয়ে চলে যায়, কেউ না কেউ তো একটু হেসে তাকে সম্ভাষণ জানাবেই......

তুলেঁাও পরিবর্তন আনতে পারেনি। এক মুহূর্তের জন্য সবকিছু থেমে গিয়েছিল, মনে হয়েছিল সুদূরের এক বিস্ফোরণ দেশকে হতচকিত করে দিয়েছে। কিন্তু তারপরে ?......আত্মহত্যা নিয়ে মানুষ পদ্য লিখতে পারে, কেউ আবার তাকে নিয়ে শোক করতে পারে, কিন্তু তার পথ তো কেউ অনুসরণ করতে পারে না।

রাওল পুরাণো দিনের কমিউনিষ্ট। ফ্রান্স ভাবলে, সে হয় তো অন্যের থেকে পরিস্থিতিটা ভাল বুঝতে পারবে। সে তাই তাকে জিজ্ঞেস করলে, আমরা তুলেঁার কথা লিখছি কিন্তু ওরা জাহাজ উড়িয়ে দিলে কেন, ওরা কেন সমুদ্রে জাহাজ ভাসিয়ে লড়াই করলে না ? রাওল হেসে বললে, জাহাজের উপরওয়ালারা ভিচির লোক। ওরা যে জাহাজখানা জার্মানদের হাতে সঁপে দেয়নি তার জন্যেই ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।......

পারীতে কি চলছিল মাদো তার অনেকখানিই দেখতে পায়নি। সে থাকতো অন্তরালে। এখানে কিন্তু সহানুভূতিহীন মানুষের সঙ্গেই তার

যোগাযোগ ঘটছে। লাক্ গ্রীষ্মকালে বলেছিল, আমরা হচ্ছি পর্যবেক্ষণকারী ফৌজ, সেনাবাহিনী রয়েছে অনেক অনেক পিছনে.........সেনাবাহিনী কি সময় মতো এসে হাজির হবে?....বেশিদিনের কথা নয়, ফ্রান্স কাফেতে, রেলের কামরায়, লোকের মুখে স্তালিনগ্রাদের কথা শুনে খুশি হয়েছে। এখনতো ওকথা শুনে আরো সে মুষড়ে পড়ে........ওখানে মানুষ মরছে; আর এখানে একজন যুবক এক পিপে মদ বেচে মদ খেয়ে তারই উৎসব করতে করতে ফিসফিসিয়ে বলছে, রুশরা জাত বটে!......ওরা ভাবে, কেউ না কেউ ওদের স্বাধীনতা এনে দেবে—বোলশেভিকরা, লণ্ডন বেতারের ঘোষণাকারী, আলজিয়ার্সে এসে যে আমেরিকানরা নেমেছে তারা বা ধূর্ত দাঁলা—সে যেই হোক্‌না কেন তাতে কোনো আপত্তি নেই। ওদের মধ্যে সাহসী যারা তারা ওকে রাতে ঠাঁই দিয়েছে, আবার মাথা নেড়ে বলেছে, অতো তাড়াহুড়ো করছ কেন? তুমি একটা জার্মানকে মারলে, ওরা অমনি আমাদের একশো জনকে মেরে তার শোধ তুলবে। রাশিয়ায় জোর লড়াই চলছে। মিত্রশক্তি এসে নেবে পড়বে, এখন না নাবলেও বসন্ত কালে তো নাববেই। আমাদের ততদিন অপেক্ষা করে থাকতে হবে.. .... সবাই বলেছে, হাঁ, অপেক্ষা করতে হবে, অপেক্ষা করতে হবে!

মাদো জোসেৎকে দেখে খুশি হোলো। একটা চুনকাম করা কামরায় দেখা। সে যেন এক সাধুসন্তের গুহা। একটা ক্রুশ রয়েছে, ধূনার গন্ধ—একটা যেমন তেমন টেবিল। জোসেৎ বুঝতে পারলে মাদোর তাড়া আছে, তাই তখনি আসল কথা পাড়লে,

রাওলকে বোলো, আমরা খনির ব্যাপারটার ভার নেব। এখন আমরা রেলপথের অভিযানের তোড়জোড় করছি। আমাদের অস্ত্র চাই। থাকবার মধ্যে আছে ডজন খানেক রিভলবার, এ এক হাসির ব্যাপারই বটে! যে কোনো দিন আমাদের সংঘর্ষ হতে পারে। রাওলের সঙ্গে কখন দেখা হবে।

কাল সন্ধ্যেয়, যদি অবশ্য গাড়ি না ফেল করি......

তার মানে তুমি বৃহস্পতি কি শুক্রবারে এখানে ফিরছ। তখন সব কথা হবে। শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করিঃ আঁরির সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে ?

পারী ছাড়বার ঠিক আগেই দেখা হয়েছিল। তা মাসখানেক কি তারও বেশি হয়ে গেছে...সে ভালই আছে, মনটাও তাজা, সে যেমন করে কথা বললে, তাতে আমিই চাঙা হয়ে উঠলাম।.......

বিদায় নেবার সময় মাদো তাড়াতাড়ি বললে,

সে জানিয়েছে, মিকি ভাল আছে...

রাওলকে যখন মাদো টমি গানের কথা বললে সে হাসলো,

তোমার কি মনে হয় আমরা বন্দুকের ব্যাপারে বড় মানুষ ? আমাদের চারটে আছে—সবগুলিই জার্মানদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া। ইংরেজরা এ, এসদের জন্য শুধু ওগুলো ফেলে গেছে, কিন্তু ওরা তো আমাদের দেবে না ··

সে একটু থেমে আবার হেসে উঠলো ঃ

তুমি ওদের সঙ্গে কথা বল, তুমি হয়তো কিছু ওদের কাছ থেকে বার করতে পারবে। এখানে একজন সাহিত্যের অধ্যাপক আছেন...... আমি কূট রাজনীতির কিছুই বুঝিনে, তাছাড়া ওরা আমাকে একগুঁয়ে বলে জানে। তুমি তো খাঁটি পারীর বিলাসিনী মেয়ে, আর তোমাকে এমন নম্র দেখায়......এদের ভাবসাব কি বোঝা দায়—ওদের মনের অবস্থার উপরই সব নির্ভর করছে···

জর্জ রেমেল স্থানীয় শিক্ষায়তনের সাহিত্যের অধ্যাপক। তার সঙ্গে ফ্রান্সকে দেখা করতে হবে। এই অধ্যাপক যুদ্ধের আগে রাজনীতির বড় একটা ধার ধারতেন না। তার উনত্রিশ বছর বয়েস, যুদ্ধের ঠিক আগেই তিনি বিয়ে করেন, স্ত্রীকে খুব ভালও বাসেন। কিন্তু আত্মসমর্পণের পর তিনি মুষড়ে পড়লেন, শোকে যেন আছন্ন হয়ে গেলেন। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা

করতেন না, এমন কি নিজের স্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলা বন্ধ করলেন। একদিন স্ত্রী তাকে বললেন, তোমার কাছে সব কিছুর চেয়ে রাষ্ট্রের সম্মান কি এত বড় হোলো? তাছাড়াও তো জীবনে বহু জিনিষ আছে... তিনি উত্তর দিলেন, তুমি বুঝবে না....আমার কাছে রণাঙ্গন কোথায় ছড়িয়ে পড়লো, কে জয়ী হল একথার কোনো মানে নেই। এসব সামরিক বিভাগের বা রাজনীতিজ্ঞের ব্যাপার...আমাকে আঘাত করছে আর একটা জিনিস। জার্মানরা পারীতে আছে, ধনী হোক্, গরীব হোক্, সব মানুষেরই বাঁচার অধিকার আছে, কিন্তু এখানে জীবনযাত্রাই দুঃসহ হয়ে উঠেছে... যখন স্কুলের সহকর্মীরা তাঁকে প্রতিরোধ সংঘে যোগ দিতে ডাকলেন, তিনি এক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন না। জাঁন্ত আর্ক দলে সবরকম লোকই ছিল—একজন দর্জি, সে আগে তৈরী করতো রোমেলের পোষাক, দুজন ছাত্র, একজন সাংবাদিক, তিনি আগে কাজ করতেন এক ক্যাথলিক খবরের কাগজে, উনিশশো চল্লিশে হত হয়েছেন এমনি একজন পদস্থ সামরিক কর্মচারীর বিধবা, একজন কাপড়ের কলের মালিক, একজন কারখানার, একজন ডাক্তার আর একজন য়্যাটর্নি। রোমেল দুটি অভিযানে এরই মধ্যে ভূমিকাও নিয়েছেন, ইংরেজরা যে প্যারাস্থটে করে অস্ত্রশস্ত্র পাঠায় তার দখলের ব্যাপারে। তিনি জানেন, তার জীবন একগাছা চুলের উপরে ঝুলছে, কিন্তু তবু এখন বাঁচার সার্থকতা আছে বলেই মনে হয়।

ফ্রান্সের সঙ্গে তার দেখা এক দাঁতের ডাক্তারের আফিসে। এই ডাক্তারটি জাঁন্ত আর্ক দলকে সাহায্য করেন। রোমেল মুখে ফেটি জড়িয়ে এসে হাজির হলেন; সদ্য কতকগুলি গ্রেফতার হবার পর তাকে সতর্ক হতে হুঁসিয়ার করে দেওয়া হয়েছে। ফ্রান্স তাঁকে নিজের আসবার উদ্দেশ্য জানালো। তখনি তাকে বন্ধু বলে তাঁর মনে হোলো। তিনি আপন মনে ভাবলেন, আমাদের কি বস্তু ভাগ করে দিয়েছে? ওরা তো আমাদেরই মতো একই কাজ করছে। এটা তো নির্বাচনের সময় নয়, পার্টি টিকেট

যার যেমন, সে তেমনি মরছে না পার্টি টিকেট অনুসারে আসছে না মৃত্যু......
ক্রান্স যখন থামলো, তিনি বললেন,

আমার সহকর্মিদের সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করব। কাল আবার এস। এখানে ডাক্তারের বহু রোগী, তাই বিপদের ভয় নেই...... আবার আমরা গোপনে দেখা করার সুবিধে পাব.. ....

সেই দিন সন্ধ্যেয় রোমেল নাদাউদকে জানালেন কমিউনিষ্টদের প্রার্থনার কথা।

নাদাউদ উত্তর দিলেন, অসম্ভব, আমাদের স্পষ্ট নির্দেশে ওদের অস্ত্র দিতে বারণ করা হয়েছে। আমরা খবরাখবর আদান-প্রদান করতে পারি, যে দালালি করছে তার খবর দিতে পারি, ওদের লুকোবার সাহায্যও করতে পারি, কিন্তু তার বেশী কিছু নয়.....

কিন্তু আমি তো বুঝি না—এই সব হালকা মেসিনগান দিয়ে কি হবে—আমরা কি করব?

আমাদের আদর্শে গরমিল। ওরা ছোটখাটো ব্যাপার করছে, জার্মানদের খুন করছে, রেলের লাইনের ক্ষতি করছে। এই তো সেদিন একটা জলের কলের সরবরাহ কেন্দ্র উড়িয়ে দিলে.. এতে আরো প্রতিশোধের উন্মত্ততা বাড়ে। কমিউনিষ্টরা সবচেয়ে বেশি চায় প্রচার। আমরা সমস্ত জিনিষ জাতির দিক থেকে খতিয়ে দেখি। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, অন্তরালে এক সত্যিকারের সেনাবাহিনী গড়ে তোলা। যখন মিত্রশক্তি নেমে পড়বে, আমাদের লাড়িয়ে পল্টন তো চাই, তাদের অস্ত্রশক্তি উপযুক্ত থাকবে, তাদের রীতিমতো চালিয়ে নিতে হবে সেনাপতিদের।

যখন ফান্সের সঙ্গে আবার দেখা হল রোমেল বললেন,

আমি দুঃখিত হয়েই জানাচ্ছি, একাজ সম্ভব নয়। আমরা এত তাড়াতাড়ি আক্রমণের বিরোধী। আমাদের নেতাদের এই মত।

তাহলে আপনাদের নেতারা আমাদের কি করতে বলেন?

শক্তি সংগ্রহ আর অপেক্ষা।

কতবার মাদো শুনেছে ঐ এক কথা, অপেক্ষা কর।

এখন পর্যন্ত সে যারা তাদের সেভিংস ব্যাঙ্কের আমানতি টাকার বই, পোশাকের আয়না দেওয়া আলমারী আর কাঁচের টুকিটাকি জিনিস আঁকড়ে ধরে থাকে, তাদের কাছ থেকে শুনেছে একথা। কিন্তু এই মানুষটি...... ইনি তো আজই গ্রেফতার হতে পারেন, গেষ্টাপোদের অন্ধকার জেলে নির্বাসিত হতে পারেন... তাঁর মুখে এক কথা !.......

অপেক্ষা কর—কেন অপেক্ষা করব ?

নামবার অপেক্ষা।

এ এক তামাসা বটে! মিত্রশক্তি অপেক্ষা করছেন, আগে রুশরা জার্মানদের দুর্বল করে ফেলুক, তারপরে তারা নামবেন আসরে, আপনারা অপেক্ষা করছেন মিত্রশক্তির ফ্রান্সে অবতরণের জন্য। আর জনগণ অপেক্ষা করে আছে—আপনাদের কখন আপনারা সাহস করে কাজে নামবেন। এর ফল কি হবে জানেন, ভিচি থেকে কোনো এক ছ্যবাঁ এসে হাজির হয়ে কর্তৃত্ব নেবে, আপনাদের কাছেও ঘেঁসতে দেবে না।.....

কথা বলতে বলতে সে অস্থির ভাবে দস্তানা নিয়ে তালগোল পাকাচ্ছিল। রেমেল তার নির্দেশ ভুলে গেলেন ঃ এই মেয়েটি তাঁকে ভীরু মনে করবে এইটেই তাঁর কাছে অস্বস্তির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো।

তুমি যদি আমার মত শুনতে চাও, আমার মনে হয়, ওরা ভুল করছে। বর্তমান সময়ে অস্ত্র লুকিয়ে রাখার চেয়ে গুলী করা সহজ•••••কিন্তু শৃঙ্খলার মানে কি তা তোমাকে বোধ হয় বুঝিয়ে দিতে হবে না। যখন সোবিয়েৎ-জার্মান চুক্তি হোল, আর সবার মতোই আমারও মত ছিল যে কমিউনিষ্টরা বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু আমার ভুল হয়েছিল, একথা স্বীকার করছি। তোমাদের নিজেদের কৌশল আছে। যারা আমাদের অপেক্ষা করতে বলেছেন তাঁদেরও আছে কৌশল। আমার একজন সহকর্মী

কমিউনিষ্ট—যুদ্ধের আগে তাকে বলা হয়েছিল তিনি তাঁর আদর্শ ত্যাগ করুন। তোমাদের ডেপুটিরা পার্লামেণ্টে যে অবস্থায় তখন ছিলেন, সে সম্বন্ধে তাঁর সায় ছিল না, কিন্তু তিনি আমাকে বললেন, যখন লড়াই চলে তখন ভাবুকতা করলে চলে না, তখন লড়তে হবে তোমাকে....তিনি গ্রেফতার হলেন, জানিনা তাঁর ভাগ্যে কি ঘটলো। তখন আমি তাকে ধর্মোন্মাদ ভাবতাম, কিন্তু আমি ভুলই করেছিলাম। এখন তো আমি লড়ছি, লণ্ডনের মানুষরা ঠিক না ভুল করছে—তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনাও করতে চাই না। তুমি তো আমার থেকে ভালো করেই জানো বিশ্বস্ততার মূল্য কি......

তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় মাদো বললে,

অস্ত্র পেলাম না বলে দুঃখিত, আর দুঃখিত আপনার জন্যে......

তিনি তার হাত জোরে চেপে ধরলেন,

তোমার যাত্রা শুভ হোক।

যখন ফ্রান্স রাওলকে রেমেলের সঙ্গে আলাপের কথা বললে, রাওল হাসলো,

তাহলে ওরাও বিশ্বস্ততার কথা বলে? হাঁ, ওরা নিজেদের কাছে বিশ্বাসী একথা সত্যি......আমাদের ওরা ভয় করে। রেমেল এসব বোঝে না।.... আর ও ওদের মধ্যে সবচেয়ে ভালোমানুষ বলেই তোমাকে ওর কাছে পাঠিয়েছিলাম ওদের। মধ্যে নাদাউ বলে একজন আছে. সে ফ্লাঁদিনের শিষ্য, সে তো স্পষ্ট বলে, বিজয়ের মুহূর্তে আমাদের কমিউনিষ্টদের চেয়ে শক্তিশালী হতে হবে... পলিনকে বোলো, জার্মানদের কাছ থেকে তাকে অস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে—আমাদের অস্ত্র সজ্জার ভার একমাত্র তাদের উপরই আছে। আর টাংগষ্টেনের (এক রকম ইস্পাত) ব্যাপারটা কতদূর এগোল জেনো......

জোসেতের সঙ্গে তার যখন দেখা হলো সে খানিকটা তখন উদ্বিগ্ন।

আজ রাতেই আক্রমণ হবে। হয়তো খানাতল্লাসও হতে পারে। আমি তোমাকে এক বুড়ীর কাছে নিয়ে যাব, সে থাকে সহরের মুখোমুখী ঐ টিলেটার ওপর। সকালে লেভালেতের যেও, কিন্তু পাহারার ঘাঁটিগুলি

এড়িয়ে চলবে। সকাল সাতটায় লেভালেতের বাইরে আমাদের এক দূত একটা মেয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করবে—আমি তোমাকে ফলাফল জানিয়ে দেব, তুমিও রাওলকে বলতে পারবে......

কখন আক্রমণের সময়?

চারটে।

রাওল খনির ব্যাপার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিল......

ফ্রান্স তার পা কোনোরকমে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চললো। এ এক দীর্ঘ চড়াই ভাঙা—দুরাত তার ঘুম নেই। শীতের প্রথম দিকের সন্ধ্যা। ঠাণ্ডা। খুদে কুঁড়ে ঘরে চাষী-বুড়ি জল চড়িয়ে দিল, বিড় বিড় করে কি বললে আপন মনে। পরে সে মাদো আর তার নাতনীকে রাতের খাবার পরিবেশন করলে। আবার বিড় বিড় করে আপন মনে কথা। ফ্রান্স বুঝতে পারলো না সে কি বলছে। হয়তো মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

ফ্রান্স ঘুমুতে চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। মাঝে মাঝে সে দেশলাই জেলে ঘড়ি দেখছিল। চারটে বাজবার পনেরো মিনিট আগে সে বেরিয়ে এসে বাড়ীর কাছে প্রতীক্ষা করতে লাগলো। রাত অন্ধকার; কোথায় দূরে ডেকে উঠলো এক কুকুর। উপত্যকা থেকে ভেসে এল আগত ট্রেনের শব্দ—এ যেন ঠাণ্ডায় কষ্ট পাওয়া মানুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাস। তারপরে এক ভয়ানক গর্জন। বুড়ি বাড়ী থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে বললে, মেরী মার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক! মাদো হাসলো, বুড়ি তাহলে সবই জানে। আমরা একা নই। ঐ যে থুত্থুরে বুড়িও আছে আমাদের সঙ্গে ......মাদো শান্ত হয়ে গেল। সে বসে বসে ঝিমোতে লাগলো, পাছে গভীর ঘুম হয় সেই তার ভয়। বুড়ি আগুন জেলে আবার আপন মনে বিড় বিড় করতে লাগলো।

মাদো টীলা থেকে নেমে এল। এখনো অন্ধকার আছে। লাভোলেতে যাবার পথে পড়বার আগেই সে একটি খুদে মেয়েকে দেখলে, তার চুলে রিবন দিয়ে বেণী বাঁধা। শীতে সে কাঁপছে। মেয়েটি সংকেতে বলে দিলে,

আমি বাজারে গিয়ে একটা বাল্তি কিনবো। মাদো নিজেকে সংযত করতে পারলে না, সে আদর করে মেয়েটির চুলে হাত বুলিয়ে দিলে, কিন্তু মেয়েটি কাজের লোকের মতো বললে,

একশো আশীজন জার্মান খতম হয়েছে—এই ট্রেনে ওরা ছুটিতে বাড়ী যাচ্ছিল। আমাদের কেউ আহত হয় নি। আর ট'ঙ:ষ্টনের ব্যাপার—সে ডিসেম্বরের গোড়ায় হবে।

একখানা পাঠ্য বই আর ক'টা খাতা তার হাতে—সে চলেছে স্কুলে। সূর্য উঠেছে পাহাড়ের উপরে। কুয়াশাময় গোলাপী আলো, এ যেন মঞ্চের একটি দৃশ্যপট। মাদো আবার ট্রেনে চলেছে। নিষ্পত্র গাছ, যাত্রীদের মুখ আর ষ্টেশনের নাম মিলিয়ে যাচ্ছে। সে ভাবছিল অন্য কথা, কিন্তু সে এত ক্লান্ত যে সে জানেনা কি ভাবছে। হয়তো ভাবছে ভাগ্যের কথা.....

রাওল বললে,

একশো ছিয়াশীজন? চমৎকার! জানো, জার্মানরা টের পেয়েছে। হানা চলেছে, রেমেল গ্রেপ্তার হয়েছে। যাও, একটু ঘুমোও গে, তোমাকে কাল লিয়ঁ যেতে হবে....

কুড়ি

এত প্রচণ্ড গুলী চলছে যে ওসীপের মুখ হাঁ হয়ে গেল, চোখ দুটো উঠলো লাল হয়ে। মিনায়েভ তার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠতে গেল, কিন্তু পারলে না। পরে মিনায়েভ বললে, হাঁ গান চলছিল বটে?..... একদিন মানুষ বলবে—কনসার্ট, সিম্ফনি, বেঠফেন সব আছে—কিন্তু আমি এই

গান ভুলবো না……কিন্তু সেই মুহূর্তে মিনায়েভ আর সবার মতোই কিছু ভাবছিল না। এমন কি শীতের দমকা ঠাণ্ডা হাওয়া সম্বন্ধেও তাদের চেতনা ছিল না। তারা কাটাচ্ছিল যন্ত্রণাদায়ক ক্লান্তিতে—আশায় উন্মুখ হয়ে। কিন্তু মিনায়েভ যখন খাড়া পাহাড়ের উপরে উঠে এল, তার ইচ্ছাশক্তি তখন এত দৃঢ় যে মনে হচ্ছিল—সে যেন আজীবন এই মুহূর্তটির জন্যে বসেছিল—যখন থেকে সে খেলাধূলো করত, তার প্রথম বই পড়েছিল—সেই তখন থেকে। এই মুহূর্তের আগে ছিল কত অশ্রুহীন দুঃখ, কত হারাণো বন্ধু আর অশুভ ইশ্তাহার। তারা এই তৃণ-আচ্ছাদিত স্তেপকে ভাল বেসেছে, তাকে আবার ঘৃণাও করেছে। ওসীপ বললেঃ আমার এই স্মৃতি চিরদিন মনে থাকবে। একদিন সে নিজের মনেই বললে, আমি শুধু এই কামনা করি, এ স্মৃতি যেন স্বপ্নেও দেখা না দেয়……তারা আর চুপ করে থাকতে পারছে না, গালাগাল দেওয়াও নেই আর নেই বা কথার ঝিলিকও। একশো দিনের উপর তো হয়ে গেল… তারপরে যা ঘটলো তাতো তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি—অথচ তারা তারই জন্যে প্রতিদিন তৈরী হয়েছিল—এ যেন সাধারণভাবে নতুন বীজ বোনা ব্লাষ্ট ফার্ণেস নতুন করে করা বা নতুন পরীক্ষার ব্যাপার। তুষারে মোড়া সকাল, পাহাড়ের উপরে উঠে মিনায়েভ তার জামার হাতায় মুখ মুছলে। মিনায়েভ কি তখন অনুভব করেছিল ঠাণ্ডা—শুধু ঠাণ্ডা—না! সে অনুভব করে নি। [যদি অনুভব করেই থাকে গরমই করেছিল] ঠাণ্ডা যা সাধারণত মানুষ অনুভব করে—শীতকালে……কি সব মাথামুণ্ডু যে ভাবছে। এর সঙ্গে শীতকালের সম্পর্ক কি? আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে।

এই মুহূর্তের জন্য লাখে মানুষ তৈরী হয়ে আছে। পিছনে, দৈনন্দিন ব্যায়ামের বলে সৈনিকরা বহু উঁচুতে উঠেছে, প্রান্তর পার হয়েছে, খাতে চিতিয়ে শুয়ে পড়েছে। কারখানার মেয়েরা পাগলের মতো দিন রাত কাজ করেছে, অর্ধাহারে, নিঃসঙ্গতায় তারা ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেছে, বিবর্ণ তাদের মুখ, যেন

যুদ্ধ তাদের জীবন নিঙড়ে নিয়েছে। ক্লান্ত ইঞ্জিন চালক বোমা বৃষ্টির ভিতরে চালিয়ে নিয়ে গেছে বোঝাই ট্রেনগুলি; স্যাপার হাজার বার তার কাঁটা আর মাইণ পাতা জমির উপর দিয়ে পথ তৈরী করবার মহড়া দিয়েছে, ভবিষ্যতে নদী পার হবার জন্যে কাঠ জড়ো করা হয়েছে। কোঁকড়া চুল-ওলি মেয়েরা পথে জনতা নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য শিক্ষা পেয়েছে, এখনো সে পথে ধীরে সুস্থে শান্তভাবে চলেছে জার্মানরা। টিনভর্তি খাবার, আহতের খাট, ট্রাঙ্কগুলি গোনা হয়েছে কতবার। বরফ এখনো পড়েনি, কিন্তু ফেল্টের বুট নামানো হয়েছে। আর আছে হাজার হাজার মানচিত্র: রণাঙ্গনের সেনাপতি, জেনারেল, কর্ণেল ইগনালভ, ওসীপ—ওরা সবাই মানচিত্রের উপর ঝুঁকে পড়ে দেখছে শত্রুর ফৌজের অবস্থান। তারা জানে কে কতখানি উঁচুতে উঠলো পাহাড়ের। ইতালিয়ানরা কোথায়, কোথায় বা রুমানিয়ান আর জার্মানরা; জার্মানরা কি রকম তাও শুনেছে—নতুন বা ছিন্নভিন্ন ঝঞ্ঝাবাহিনীর লোক না সংরক্ষিত সেনাদল। তারা এও জানে যে, ইতালির রাভেনা বাহিনীর মানুষরা পরস্পরকে বলছে, কেন আমরা এখানে এলাম? আর জার্মানীর একাত্তর-নং পল্টন এসেছে রেইম থেকে। গোয়েন্দাদপ্তর রাইখের জেনারেলদের নাম লিখে জানিয়েছে, জার্মানদের দ্বিতীয় বাহিনীর সম্বন্ধে টোক নিয়েছে, বাঁকা গোথিক অক্ষরে লেখা চিঠি পড়েছে, তাতে লেপটেন্যাণ্ট সিমডিট তার স্ত্রীকে জানিয়েছে, সমস্ত ছুটি-ছাটা এখন বাতিল। রণাঙ্গনের সেনাবাহিনীর আর পল্টনের খবরের কাগজের সম্পাদকেরা বিশেষ সংখ্যা তৈরী করছেন, তাতে চরম আঘাত হানবার থাকবে আহ্বান। কবিরা লিখেছেন কবিতা, আর ছাপা-খানার কম্পোজিটাররা খাতে বা ট্রাকে বসে বার বার 'অভিযান' কথাটা সাজাচ্ছে। যারা রাজনীতির শিক্ষক তারা লোকের কাছে জার্মান কষাইদের রোজনামচা পড়ে শোনাচ্ছেন, আমাদের দেশকে যে ক্ষত-বিক্ষত করে দেওয়া হচ্ছে তা বলছেন, যন্ত্রপাতি বিশেষজ্ঞ যেমন মোটর পরীক্ষা করে,

তেমনি করে তারা মানুষের মন পরীক্ষা করছেন। পরিকল্পনা করা হচ্ছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাগ করা হচ্ছে, আবার জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। একজন উঁচুদরের জেনারেল লিভারের রোগ থেকে ভুগছিলেন, তিনি সরজমিনে দেখতে বেরুলেন, তার যে অসুখ হয়েছে একথা চেপে গেলেন। কর্ণেল ইগনাভ ওসীপকে বললেন, ছয়-•-• টার সময়। স্তালিনের চোখের পাতা ঘুম না হওয়ায় বার বার বুজে আসছে, তিনি মানচিত্রের উপর ঝুঁকে পড়েছেন, স্তেপ চড়াই আর উৎরাই তার চোখের সম্মুখে ছড়িয়ে আছে—তিনি এই অঞ্চলটিকে ভাল করে জানেন। যা ভাবা অসম্ভব, সেই ভবিষ্যৎ বাণীই তাঁকে করতে হবে—যে আমাদের ট্যাঙ্ক টাট্রসিনস্কায়ায় শত্রুর বিমান বহরের নাগাল পাবে; আর তা শেষে পুড়িয়ে ফেলারও দরকার হবে, যে কোন জার্মান জেনারেল সময় থাকতে পশ্চাদপসারণের পক্ষপাতী হবেন। অন্যেরা বাধা দেবে, মানষ্টাইনের তাঁবে বহু ট্যাঙ্ক থাকবে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে অপদার্থ বলেই প্রমাণিত হবে; তাঁকে শত্রুর কৌশল সম্বন্ধেও ভবিষ্যৎ বাণী করতে হয়, নিজে যে ভুল করতে পারেন তাও ভাবতে হয়—বলতে গেলে অকালে বৃষ্টি থেকে শুরু করে তাড়াতাড়ি তুষারপাত, চাঁদের প্রভাব, ভুল, দুর্ঘটনা সব কিছুর সম্বন্ধেই আগে থেকে তাঁকে ছক করে রাখতে হয়।

যখন এই দীর্ঘ তোড়জোড় অধ্যাবসায়ের সঙ্গেই চলছিল, ওসীপ যে পল্টনের দলপতি তার উপরে ঝঞ্ঝাবেগে গুলী পড়তে লাগলো; তারা জার্মান আক্রমণ প্রতিহত করলো; পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে যাতে তাদের হটিয়ে দিতে না পারে তার চেষ্টাও হলো, আর রক্তপাত তো তার সঙ্গে ছিলই। যারা প্রথম এই জায়গাটায় এসেছিল প্রথম চোখ চেয়ে দেখেছিল তাদের মধ্যে খুব কমই বেঁচে রইলো, আগষ্টের সেই গুমোট দিনে। এখানে সেই লেফটেন্যান্ট জারুবীনকে কবর দেওয়া হলো, মিনায়েভ যাকে ডাকত 'ধারু' বলে সে সত্যিই বড় আস্তে কাজ করতো। জারুবীন একটা পাল্টা আক্রমণে হত হলো। এখানে রইলো ট্যাঙ্কের গোলন্দাজ স্থাপালভ, জাগভজদেভ, মাগারাজ,

বুতেস্কো, ব্রদেস্কী আর বহু মানুষের কবর। 'অভিশপ্ত টীলা—অভিশপ্ত' মিনায়েভ বিড় বিড় করে আওড়াতে লাগলো কথাটা।

সবই তৈরী, যখন শুরু করবার কথা তখনি শুরু হোল। পল্টনের লোকের কাছে ব্যাপারটা শুরু হয় প্রথম কামানটা যেখানে বসানো ছিল, সেইখানে। সেখানে ক্ষেপে গিয়ে গালাগাল দিতে দিতে সোচি স্বাস্থ্যনিবাসের ভূতপূর্ব্ব নাপিত লিউবিমভ দু-দুটো জার্মানকে রাইফেলের বাঁট দিয়ে পিটিয়ে মারলো। পরে যখন মিনায়েভ বললে, সত্যিকারের ঐতিহাসিক মুহূর্ত এসেছিল—তখন সে ঠাট্টা করেনি, সত্যিই বললে। লিউবিমভ বিরক্তিতে হাত নেড়ে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল—যখন ব্যাপারটা ছিল দূরে, তখন ইতিহাসের কথা বলাই ঠিক হোত, কিন্তু এখন তো এখানে সে সময় আর নেই……

কর্ণেল ইগনাতভ ওসীপকে একজন উঁচুদরের সেনাধ্যক্ষ বলেই মনে করেন। সব চেয়ে তাঁর যা ভাল লাগে, সে হচ্ছে মেজর আলপেত কখনো উত্তেজিত হয়ে উঠে না, কখনও নিরাশও হয় না। সব সময়েই সে শান্ত, আর মেজাজটিও নরম। একদিন কর্ণেল নিজের মনে ভাবলেন, ওর মতো লোকের সঙ্গে বাস করতে হলে ভয়ানক বিরক্তি ধরে যাবে, ওর সঙ্গে থাকলে যে-কোনো লোক নিজের গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলতে পারে, কিন্তু লোকটা যোদ্ধা হিসাবে ভাল...ওসীপ যুদ্ধের আগে যেমন কাজ করতো, তেমনি যুদ্ধও করছে—ঠাণ্ডা মেজাজে আবার উদগ্রতাও তার যথেষ্ট—এ যেন কারখানারই কাজ, শুধু ধ্বংস করতে গিয়েই ওর মনে দুঃখ হয়........'যুদ্ধের রোমান্স' যাকে বলে, সেই ভয়ঙ্কর বিপদের ঝুঁকি, বিপদের প্রতি আকর্ষণ, একেবারে অন্যরকম জীবন—মার্চ শিবিরের আগুণের কুণ্ড, বনে শিবির পাতা, স্ত্রীছাড়া থাকা নারীসংসর্গ ছাড়া বাঁচা—সব সময়ে নারীর জন্য কামনা সে যেন এক অসহ্য চুলকুনির মতো—স্নেহ মাখানো চিঠি, অশ্লীল গালাগাল—ওসীপের কাছে এ সবের কোনো দাম নেই। সে স্বপ্ন দেখে সেই দিনের যেদিন যুদ্ধ শেষ হবে—তখন কাজ করা সম্ভব হবে—গড়ার কাজ, নিয়ন্ত্রণের কাজ।

সে গৃহীর জীবন চায়, রায়ার সে তারিফ করে, কিন্তু যখন তার পাঠানো-ফোটো খানার দিকে চেয়ে থাকে, দীর্ঘ নিশ্বাস ঠেলে বেরিয়ে আসে—একবার ভাবতো অমনধারা মেয়ে কিনা লড়ছে; জার্মানরা এও দেখালে! সে কল্পনা করে মা আর অলিয়োসা উদ্বাস্তু হয়েছেন

রায়া লিখেছে, ওরা আছে উজবেকিস্তানে। সে জার্মানদের ঘৃণা করে, তারা একটি শিশুর জীবন চুরমার করে দিয়েছে—তারা এক বছর হোলো আলিয়াকে তার মার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, হয়তো আরো বছরের পর বছর ধরেই এমনি চলবে। তার মনে হয় যুদ্ধ যেন এক বিরক্তি-কর রোগ, এই রোগকে মানুষের দেহ পরাজিত করবে। এতেই বোঝা যায়, ওসীপ তার পল্টনের মানুষদের সঙ্গে কেন বন্ধুত্ব পাতিয়েছে। এরাও তারই মতো তাদের প্রিয়জনের কামনা করে, জার্মানরা তাদের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, অসহায়দের হত্যা করেছে, আর তাদের জীবন ওলট-পালট করে দিয়েছে বলে তাদের করে ঘৃণা। তাদের সেনাপতি সম্বন্ধে তারা বলে, লোকটা বুঝদার......যুদ্ধের প্রথম দিকে ওসীপ নিজেকে জিজ্ঞেস করেছে, ওরা যাতে বুঝতে পারে এমনি সরল ভাবে কি আমি বলি, না খবরের কাগজের কথা বলে যাই তোতাপাখীর মত (রায়া তো আগে হাসত); হয়তো আমি এর মধ্যে অনুভূতির উষ্ণতা নিয়ে আসতে পারি না? কিন্তু তখন সে ছিল কমিসার মাত্র···আজকাল সে তা ভাবে না, আর সবাই যা অনুভব করে সেও তাই করে······

আক্রমণ করা শক্ত; সবাই বলাবলি করছে ডান ধারে যেখানে রুমানিয়া-নদের ঘাঁটি সেখানে আক্রমণ করা অনেক সহজ। এখানে তাদের বিরুদ্ধে রয়েছে জার্মানরা, তারা প্রচণ্ড প্রতিরোধ চালাবে। ওরা তো আস্তে আস্তে এগুচ্ছে, হতাহতের সংখ্যা ওদের বহু। সবাই ক্লান্ত, বিষণ্ণ, কিন্তু তবু কোথায় যেন আশার ক্ষীণ ঝিলিক......মনে হয়, এবার তারা উঠে পড়ে লেগেছে ······কখনো কখনো মিনায়েভ অসন্তুষ্ট হয়ে উঠে বলে, তিনটে বাড়ি দখল

করেই আমরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাচ্ছি, কিন্তু ওদের দখলে এখনো ইউরোপের প্রায় সবখানি জায়গা ; আবার কখনো কখনো আনন্দে মুখর হয়ে উঠছে, এবার ওদের গুটোতে হবে ; প্রথম ধাক্কাটা ; জোর ধাক্কা……

মিনায়েভ ঠিক আগের মতোই আছে। সে হলফ করে বলে যে, জার্মানরা ইচ্ছে করেই রুমানিয়ানদের ফেলে গেছে। এখন আর গোলাগুলীর কালোয়াতি গান শোনার তাদের সময় নেই। আফ্রিকার যুদ্ধের বিবরণ পড়ে সে হাসে আর বলে, আলজিয়াসের কর্তা অমুক বের অনেক দিন আগেই পড়ে গিয়ে মাথাটা ঠুকে গেছে। তারপরে যেমন হয়, সেই ডাক্তার গোয়েবলস্ এসে দেখা দেয়। কুকুর ছানাটা এখনো বেঁচে আছে, আর একদণ্ড মিনায়েভকে ছেড়ে থাকে না, সব সময়েই তার পায়ে পায়ে ঘুরছে, গোলাগুলীর ভিতরেও যাচ্ছে। মিনায়েভ গর্ব করে বলে, ও ঠিক বুকে হেঁটে যায়, যেন পর্যবেক্ষণকারী সেনা …..

ওহে ডাক্তার গোয়েবলস্—তোমার ইচ্ছে তো পূর্ণ হল—আমরা উল্টো দিকে এগোচ্ছি…ডাক্তার গোয়েবলস্ সঙ্গে সঙ্গে ঘেউ ঘেউ করে উঠলো।

ক'দিন পরে ব্যাপারটা সহজ হয়ে এল ; তাদের বিরুদ্ধে শুধু রুমানিয়ানরাই এখন লড়ছে। মনায়েভ কতগুলি কাগজের টুকরো বিলালো, তাতে লেখা—এই সব নম্বরের বাদ্যযন্ত্রীদের বন্দী-শিবিরে পাঠানো হবে…সে ওদের সঙ্গে একদল রক্ষী সৈন্য দেবার ব্যবস্থাও করলো না। রুমানিয়ানরা খুশি হয়ে ক'জন সৈন্যের পিছনে মার্চ করে চললো। মিনায়েভ তাদের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে তারিফ করলে ঃ

দেখ, দেখ ! ওরা যেন বরযাত্রী চলেছে, এমনি হাসিখুশি !

পরে চল্লিশ জন জার্মান একজন লেফটেনাণ্টের নেতৃত্বে হাত তুলে আত্মসমর্পণ করলো। ব্যাপারটা নতুন।….ফ্রিৎসদের আচরণ সম্বন্ধে ভাববার তখন সময় নেই। সাত নং দপ্তরের ওদের নিয়ে কারবার, যারা মনঃসমীক্ষা নিয়ে চর্চা করতে ভালবাসে……

একটা রেল ষ্টেশন। শ'য়ে শয়ে গাড়ি—জার্মান, ফরাসী, বেলজিয়ান, পোলিশ, চেক। কারো বা গায়ে বিবর্ণ সিংহ আঁকা, কারো বা মুকুট, তিনরঙা গোলাপ বা আনকোরা নতুন কালো ঈগল। এই ম্লান বিবর্ণ স্তেপে ঢেউয়ের মতো বয়ে এসেছে সারা ইউরোপ...নানাদেশের মোটরগাড়ি চালকরা পিঁপড়ের মতো সেগুলি ঘিরে কিলবিল করছে, দরকারী অংশগুলি খুলে বার করছে। সেনাবাহিনীর কাগজের মুদ্রাকর ছুটে এসেছে কিছু নিউজ প্রিন্ট্ পাবার আশায়, কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা খুঁজে বার করেছে দুকেস ফরাসী মদ। ওরা সার্ডিন অ্যাসপারাগাস আর চকোলেট খাচ্ছে, সিগারেট লাইটার আর পাইপ নিচ্ছে। আছে বিধ্বস্ত ট্যাঙ্ক—একটা কামান গোলা ভর্তি—ছোড়বার সময় পায়নি। একজন মৃত জার্মান দীর্ঘ পথের দিকে তার এক চোখ মেলে চেয়ে আছে, আর সেই চোখে তার জল।

নরকগুলজার! আমি সদর ঘাঁটিতে গিছলাম, ইগনাতভ এরই মধ্যে চলে গেছেন।....

ওসীপ হাসলো। গ্রীষ্মে কতবার সে ওকথা বলেছে? কিন্তু তখন আমরা ছুটেছি......সব ঠিক হায়! এই বিশৃঙ্খলাও খুশি করে তোলে, সব কিছু চলছে, মার্চ করছে, ঢেউয়ের মতো বয়ে যাচ্ছে......

আর শীগ্‌গির চিঠি পত্র পাওয়া যাবে না.......

মিনায়েভ তার মার একখানা পুরানো চিঠি পড়ছিল, সে ওসীপকে বললে,

আমার খুদে মা সব সময়েই একটা না একটা আবিষ্কার করছেন। এখন তো তাঁর মাথায় এক চমৎকার পরিকল্পনা এসেছে, হিটলারকে খাঁচায় পুরে তিনি সব দেশে দেখাতে চান। আমি কল্পনা করতে পারি, এই খবর যদি বেরোয় তাহলে ইংলণ্ডে কি চাঞ্চল্য সৃষ্টি হবে। তারা অমনি হিটলার-রক্ষা সমিতি তৈরি করে বসবে। আমার মার উৎসাহ আছে বটে!

ওসীপ রায়াকে একখানা চিঠি লিখে ফেললে: এখানে সব ভালো খবর, চমৎকার দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা। তুমি শীগ্‌গিরই খবরের কাগজে পড়বে .

এর চেয়ে ভাল স্বাস্থ্য আমার কখনো ছিলনা। তোমার জন্যেই আমি উদ্বিগ্ন। রায়েচকা, তোমাকে কখনো আসল কথাটা বলতে পারিনি, আমি নিজেই কথাটা সাজাতে-গোছাতে পারি নি, কিন্তু বিশ্বাস কর, তোমাকে আমি এক মুহূর্তের জন্য ভুলিনি—যখন অন্য কথা ভেবেছি তখনো তুমি আমার ভাবনায় এসে দেখা দিয়েছ। মা আর আলিয়েস্কাকে আরেক নিয়েও আমার ভাবনার অন্ত নেই। আমি শুনেছি যাদের অভ্যেস নেই তাদের পক্ষে ওখানকার জল হাওয়া সহ্য হয় না। জানি না, ওরা খাবার-দাবার কি রকম পাচ্ছে। মার চিঠি আমাকে পাঠিয়ে দিও, আমার উষ্ণ আলিঙ্গন দিলাম তোমাকে, আমার প্রিয় সার্জেন্টকে!

ইগনাতভ ওসীপকে ডেকে পাঠালেন।

যতটা দৃঢ়ভাবে সম্ভব আবেষ্টনী গড়তে হবে, ফ্রিৎসগুলো ব্যূহ ভেদ করতে চেষ্টা করবে, তাদের অন্য উপায় নেই।

তিনি আর্দালীকে সাম্পেন আনতে বললেন।

ফ্রান্স বিজয়ের-স্মৃতি...আমি কখনো খাইনি, চেখে দেখা যাক.......
আমাদেরও অবশ্য পানীয় মিলবে......জেনারেল বল ছিলেন শেষ মুহূর্তের সংবাদ হিসাবে খবরটা বেতারে বলা হবে। পরিস্থিতি অনুকূল.......

মানচিত্রের উপরে তিনি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, এই যে ঘোড়ার নাল···দেখছো......

ওসীপ যখন পল্টনে ফিরে এল, মিনায়েভ অবাক হয়ে গেল,

ভদকা কোথায় পেলে?

ভদকা নয়, সাম্পেন। এক গেলাস খেয়েছি। লিমনেডের মতো··· শুনেছ, কি হয়েছে। ওদের আমরা ঘেরাও করে ফেলেছি!... ..

তুমি মাতাল হয়েছ! কি যা-তা বকছ!......ওরা যদি কাল সাত কিলোমিটার পিছু হটে গিয়ে থাকে, কি করে ঘেরাও হবে?.......

তুমি কিছু বোঝ না। বলছি শোনো, ওরা ঘেরাও হয়েছে। আমাদের

উলটো দিকে যারা আছে তারাই নয়, সবাই—স্তালিনগ্রাদের সমস্ত পল্টন। হাঁ, এটা খাঁটি সত্যি......আমিও বিশ্বাস করতে পারছিনা......

এমনি সে ভাবাবেগহীন, ঠাণ্ডা, কিন্তু মিনায়েভকে সে দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলো। মিনায়েভও হেসে উঠলো খুশি হয়ে,

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমার খুদে মা'টি ঠিকই বলেছেন, ওকে আমরা খাঁচায় পুরে রাখবো. ....

একুশ

গত কয়েক সপ্তাহ লুইর কাছে স্পষ্ট হলেও যেন অসংলগ্ন ভাবেই এসেছে। এ যেন স্বপ্নের একটা টুকরো, যা দেখে মানুষ জেগে উঠে মাঝ রাতে; বিমানস্থানে কুচকাওয়াজ, মোটাসোটা জাঁদরেল জেনারেল এসেছেন ইরাণ থেকে, তিনি বলেন, ফলে বার্জের আমার খুব ভাল লাগে; সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখে করবেইয়ের মিনিয়েচার ছবির কথা মনে পড়ে। আর পাহাড় সমুদ্র, বরফের পাহাড়, ফারের টুপি-পরা রুশ সামরিক কর্মচারী........এ বড় অদ্ভুত, এই দুদিন আগেও সে ছিল লণ্ডনে .....

তার বিদায় নেবার ঠিক আগে মেজর ডেভিস তাকে বলেছিলেন.

স্তালিনগ্রাদের অন্তিম মুহূর্ত চলছে; কিন্তু আমি দুঃখবাদী নই, শীতে জার্মানরা আর এগোতে পারবে না। কালকের বিবরণ সবকিছু পালটে দিয়েছে। এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের উত্তর আফ্রিকায় গিয়ে থামলে চলবে না। বসন্তে বলকান অঞ্চলে অভিযান শুরু হবে......... এ বড়ই আফশোষ, তুমি চলে যাচ্ছ। যাহোক, রাশিয়া এখন আকর্ষণের কেন্দ্র, এ কথা আমি বুঝি .....

লুইকে সবাই মিশ্র অনুভূতির চোখে দেখলো—প্রশংসা আর করুণা দুই-ই ছিল সেখানে। সে চলেছে মৃত্যু বরণ করতে। লণ্ডন এখন পুনর্জন্মের আনন্দে মত্ত; বৈকালিক চা এখন বড় মধুর, আর পারিপার্শ্বিক প্রীতি মিলন উৎসবও বড় আরামদায়ক। মার্কিনরা এসে সব জায়গায় হানা দিচ্ছে, ওদের হাতে বিস্তর টাকাকড়ি, সিগারেট আর চকোলেট, তাছাড়া ভারি আমুদে ওরা, বাহুতে বাহু জড়িয়ে রেখাচিত্রের মতো ম্লান ইংরেজ মেয়েদের সঙ্গে চলে, সবাইকে মনে করিয়ে দেয় এখনো যুদ্ধ শেষ হয়নি—এখনো আছে বহু দুঃখ। শীতের বিমান-হানার সময় যে নগরী ছিল প্রিয়, আজ তাকে ছেড়ে যেতে লুইর কোন দুঃখ হোলো না। কিছুদিন হল সে যেন এখানে অপরিচিত হয়েই রয়েছে।

যেই সে রায়াক-এ এসে পৌছল, অমনি খবর পাওয়া গেল, আমেরিকানরা দার্লার সঙ্গে এক চুক্তি করেছে। এর মানে কি? এই অভিশপ্ত রাজনীতির খেল্ আবার শুরু হোল। ওরা লড়ছে যেন পোকার খেলছে আর কি—মাথামুণ্ডু বোঝা যায়। যদি মরতেই হয়, তাহলে যা সহজ সরল তারই জন্যে ত মরা উচিত। আলজিয়ার্সে সে একথা শুনলো যে পেঁতার অধীনে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তারা এখন জেলে। শীগগিরই হয়তো আমরা দেশত্যাগী, দলত্যাগী বলে প্রচারিত হব, আর পুলিশরা পাবে বীর খেতাব!......

নতুন সাথীদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, জোর তোড়জোড় চলছে, বুকে লেওপার্ড আর নরমাণ্ডী তক্মা আঁটা তাদের—তারা জঙ্গী বিমান সোবিয়েতের না, আমেরিকার ভাল তাই নিয়ে তর্ক করছে—দার্লার কথা চাপা পড়ে যাচ্ছে, ভবিষ্যতের চিন্তাও নেই।

ফরাসী বিমান-স্থানের কাছে একটি মাকিন ছাউনি আছে। বিমানীরা আমেরিকানদের একদিন রাতের ভোজে নিমন্ত্রণ করলে। লুই লেফ্টেনান্ট জেফারের পাশে বসলো, সে এক শিশুর মতো নীল চোখওয়ালা দৈত্য-

বিশেষ। প্রথমে সে লুইকে তার হাবভাবে বিব্রত করে তুললো। সে কনুই দিয়ে টেবিলের উপর ভর দিয়ে যেন শুয়েই পড়লো। পাশের যারা তাদের দিকে ছাড়তে লাগলো সিগারেটের ধোঁয়া, আর যে কথাটা ভাল লাগলো অমনি 'ও' বলে চেঁচিয়ে তারিফ করতে শুরু করলে। লুই আপন মনে ভাবলে, ও যা ভাবে, তাই বলে। কিন্তু ইংরেজদের কাছ থেকে তুমি একটা কথা বার করতে পারবে না।......শেষ দিকে সবাই মাতাল হয়ে পড়লো, এবার শুরু হোল হট্টগোল।

জেফার বললে, ফরাসীদের মধ্যে বহু বীর আছে। তোমাদের মধ্য থেকে যে নাপোলিয়ঁ, কি লাকায়েৎ এসেছিলেন তা বোঝা যায়। কিন্তু তবু তোমাদের স্বীকার করতে হবে, তোমরা সেকেলে হয়ে পড়েছ। তোমরা একটা 'মেসার' সেকেলে কামান দিয়ে নামাতে পারবে না। ইংরেজরা তোমাদের থেকে অনেক বেশী তৈরী, কিন্তু তারাও সেকেলে। বড় দুঃখ হয়, তোমরা আমেরিকায় যাওনি—সে এক সত্যিকারের নূতন পৃথিবী।

লুই এতে চটে গেল।

যখন যুদ্ধ শুরু হোল, ইংরেজদের কিছুই ছিল না। আমাদের পরাজয়ের পর তারা কাজ শুরু করেছে। আর তোমরা মার্কিনরা তো' এখনো লড়াই শুরু করনি......আমি তো বুঝি না তোমাদের এত বড়াই কেন? যদি ইংরেজরা আমাদের চেয়ে উপসাগর প্রমাণ চতুর হয়, তোমরা তো সাগর প্রমাণ ধূর্ত ......

জেফার মন্তব্যের শেষটুকু বুঝতে পারলে না, লুই আবার বলতেই সে জোরে হেসে উঠলো!

আরে তোমার ঠাট্টা যে খাঁটি মার্কিনী।

তার হাসিতে লুই আরো চটে গেল।

তোমরা দাঁর্লার সঙ্গে চুক্তি করেছ। সেটাও কি মার্কিনী ঠাট্টা নাকি?

জেফার উত্তর দিলে, ওসব আমি বড় একটা বুঝিনে। ওকে বলে

রাজনীতি। যুদ্ধের আগে আমি আমার কাজ, সিনেমা আর ঘুষির লড়াই নিয়ে মেতে ছিলাম। কিন্তু এই চুক্তিতে খারাপটা কি দেখালে? আমাদের মেজর তো বলেন, এতে বহু আমেরিকানের প্রাণ বাঁচলো। আমরা রুশ নই। মিছি মিছি মরতে আমরা চাই না......

তোমার কি মনে হয়, রুশরা তাই চায়?

ওঃ! রুশরা তো বীর, সবাই জানে। কিন্তু আমরা জীবন সম্বন্ধে অন্যরকম ভাবি...আমি খবরের কাগজে দেখেছি, একজন রুশ বিমানী একটা জার্মান বোমারুকে আঘাত করতে ছুটে যায়। ব্যাপারটা তারিফ করা যায়—ছায়া ছবিতে, কিন্তু এতে আমি কাণ্ড জ্ঞানের পরিচয় পাইনে......

তার মানে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তোমরা দুর্ভাগ্যের সঙ্গে পরিচিত হওনি..আমরা ফরাসীরা এখন রুশদের, তোমাদের চেয়ে ভাল বুঝতে পারি।......

এই তো একজন রুশের সঙ্গে আমার দেখা হল। আমাদের এখানে সে দুদিন আটকে ছিল; তখন আবহাওয়া ওড়বার পক্ষে খারাপ। ভারি চমৎকার লোক, আমি ওকে একটা সিগারেট লাইটার দিতে চাইলাম, কিন্তু ও তামাকই খায় না।

তোমার কি মনে হয়নি যে সে তোমারই মত বাঁচতে চায়? না হয় মেনেই নিলাম, ডলারের দাম এখন রুবল আর ফ্রাঙ্কের চেয়ে অনেক বেশি, কিন্তু রুশ বা ফরাসীর জীবনের দামও কি তাই? লুই দেখলে জেফার তার কথা শুনছে না। মার্কিনটি বললে,

বাঃ! তুমি তো চমৎকার বলতে পার! সব ফরাসীই বলে ভাল... তোমরা দেখবে, আমেরিকানরা শীগগিরই ফ্রান্সকে মুক্ত করবে......আমি তোমাকে একটা হাল ফ্যাসানের সিগারেট লাইটার উপহার দিতে চাই......

লুইর মনে হয় এ সব বহু দিনের কথা। সে পথ চলেছে রাশিয়ার এক সহরে। তুষার পড়ছে, সাদা পালকওয়ালা পাখী পৃথিবীতে উড়ে

উড়ে পড়ছে, এসে বসছে গায়ে, মাথায়, কাঁধে, চোখের পক্ষে...এরা যেন ভাবুক, নীরব পাখী। এখানে মানুষের মুখ আলাদা, বড় বিষণ্ণ। তাদের প্রিয়জন রয়েছে রণাঙ্গনে। নিশ্চয়ই আছে। এক অদ্ভুত শহর......একটা প্রকাণ্ড বাড়ী তার পাশেই কাঠের একটা কুঁড়ে ঘর, কটা দোকান। চা-খানা নেই—পাথুরে রাস্তায় মানুষ হেঁটে চলেছে......

লুই, তুমি ওদের লেখা পড়তে পার ?

না। ওরা যখন কথা বলে তখনো বুঝতে পারি না। কিন্তু অনুভব তো করতে পারি, ওরা লড়ছে—জানি না, আমরা স্তালিনগ্রাদ পর্যন্ত পৌছুতে পারব কিনা। ওদের বিমান চালাতে অভ্যেস করতে কয়েক মাস লাগবে....সবই এখানে আলাদা। সিগারেটের এখানে পাইপ আছে, ওরা ডিনারের আগে মদ খায়, পরে নয়.....আমি এরই মধ্যে বিশটা শব্দ শিখে ফেলেছি—ওদের ভাষা আমি শিখতে চাই......এক হপ্তা হল কোনো খবরের কাগজ পাইনি। রেনে, কি ঘটেছে আমরা কিছুই জানি না.......

সে রাতে তারা লাউড স্পীকারের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। তারা শুধু একটা কথাই বুঝতে পারলো—সে 'স্তালিনগ্রাদ'।

লুই দোভাষীকে জিজ্ঞেস করলে,

এখনো চলছে প্রতিরোধ ?

দোভাষী উত্তর দিলে,

এই শেষ মুহূর্তের খবর ঃ অভিযানের ফলাফল ঃ পঁচানব্বই হাজার জার্মান হত, বাহাত্তর হাজার বন্দী। জার্মান বাহিনী ঘেরাও হয়েছে···

কোথায় ?

স্তালিনগ্রাদে।

লুই রেনেকে খবর দিতে ছুটলো।

শুনেছ ? হূনগুলো ঘেরাও হয়েছে! রেনে, এই তো শুরু!......হাঁ, পারী, তুলোঁ—সব কিছুরই এই তো শুরু······

সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপন মনে হাসলো। আমি যেন এক টুক্‌রো নীল আকাশ? দেখতে পাচ্ছি, সূর্য উঠলো আবার ফ্রান্সের উপর। ওরা ভাবছে, আমি মাতাল...এক ফোঁটা ভদ্‌কা খাইনি, তবু আমি মাতাল.......

আমরাও শীগ্‌গিরই কাজ শুরু করে দেব...ওরা আমাদের 'য়্যাক' দিয়েছে, মেজর বলতেন ওগুলি নাকি ভারি চমৎকার বিমান। শীগ্‌গিরই সব চুকে যাক! কি আফশোস, লণ্ডনে তার পাঠাতে পারব না। মেজর ডেভিস, লণ্ডন......স্তালিনগ্রাদের চেহারা এখন অন্য রকম। তিনি নিশ্চয়ই জানেন, তবু আমার নাম তারে সই করে দিতে চাই.....আমি সেখানে নেই, কিন্তু আমি ফরাসী। ফ্রান্স, মার কবর, লম্বা য্যাস্‌ গাছ দাঁড়িয়ে আছে দীন আকাশের পটভূমিতে, পাতা সে গাছে কম........আর আছে হূনরা, জেফারকে চিঠি লিখতে হবে: লাইটারটার জন্য ধন্যবাদ, টিপওলা সিগারেট আমি পছন্দ করিনে, কিন্তু এখানে ওরা লড়ছে বটে, আমি তোমাকে একথা জানাতে চাই জেফার যে রুশরা শুধু মরতেই জানেনা, কি করে হূনদের ঘা দিতে হয় তাও জানে......আর একখানা চিঠিও লিখব—পারী বা তুরের কোনো অজানা মেয়েকে—হয়তো সে আছে নগণ্য এক গ্রামে—বেকেঁ স্যুরক্রুয়োরে: কি লিখব? প্রিয়া আমার, আমরা শীতের দেশ রুশিয়ার থেকে জয়ী হয়ে ফিরে এসেছি...আমার মনে হয়, আমি মাতাল হয়ে গেছি, কিন্তু মদতো এক ফোঁটাও খাইনি। ঘেরাও হয়েছে হূনরা! ওরা একাই তো আর ঘেরাও করতে পারবে না......আমি যে এখানে আছি, এতে আমি খুশি হয়েছি ...

ক'দিন পরে ফরাসী বিমানীরা গেল সার্কাস দেখতে। যারা খেলা দেখায় তাদের অভিনন্দন জানালে, রোগা, ক্লান্ত লাঙা ঘোড়ার খেলোয়াড়কে আর ভাঁড়কেও। বিরামের সময় সবাই ভিড় করে দাঁড়ালো তাদের চারদিকে, জিজ্ঞেস করলে, তোমরা ইংরেজ? ওরা জবাব দিলে, না ফরাসী।

একজন স্ত্রীলোক, সে আর যুবতীটি নেই, এসে লুইকে একখানা রুমাল

উপহার দিতে চাইলে, লুই বিব্রত হয়ে কি করবে ভেবে পেল না। দোভাষী ছুটে এল তাকে সাহায্য করতে। স্ত্রীলোকটি বললে,

আমি জোলা পড়েছি। আমার ছেলেও তোমার মতোই বিমানী...এই স্মৃতি-চিহ্নটি অনুগ্রহ করে নিয়ে নাও......

লুইর তাকে চুমু খেতে ইচ্ছে হল, কিন্তু সে বড় লাজুক। সে তার চওড়া হাতের তেলোয় সেই খুদে রুমালখানা চেপে ধরলো, এ যেন প্রজাপতি, ভয় হল হয়তো পিষে মেরে ফেলবে, বার বার বলতে লাগলো ঃ ধন্যবাদ, ধন্যবাদ! স্ত্রীলোকটি যেন তার মার মতো দেখতে......

রেনে, এখানে বড় শীত, কিন্তু এমন চাঙা আমি আমার জীবনে হইনি···

ওরা এক অন্ধকার নির্জন পথ বেয়ে চললো, নিঃশব্দে তুষার ঝরছে... আর ঝরছে......

বাইশ

কেলার তার গালে সাবান লাগাচ্ছিল দাড়ি কামাবার বুরুশটা দিয়ে আর ভাবছিল ঃ কেউ আর আমাকে চিনতে পারবে না—না গার্ডা, না মিমি। এই তিন মাসের ভিতরে আমি বিশ বছর বুড়িয়ে গেছি। আমার চৌত্রিশ বছরের জন্মদিনে আমি হিলিকে বলেছিলাম, আমার অর্ধেক জীবন কেটে গেছে। কিন্তু তখন ভাবিনি যে, অন্তিম এমনি করে ঘনিয়ে আসবে...আমার এবার ফিরে তাকান দরকার, অতীতকে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে ···কিন্তু কেলার মনঃসংযোগ করতে পারলো না। বহুদিন দাড়ি কামায়নি, তাই কামাতে গিয়ে থুতনিটা কেটে ফেললে; কেন যেন সে ভাবতে লাগলো; এর চেয়ে পিঠে একটা কামানের গোলার টুকরো এসে বিঁধলে ছিল ভাল······আবার

তখনি এল তার জবাবে আর এক চিন্তা: তাতেই কি রক্ষা পাব, আমরা যেন এক কেৎলির ভিতরে পড়েছি। আগে আহতদের উড়োজাহাজে করে নিয়ে যাওয়া হত, এখনতো শুধু পদস্থ সামরিক কর্মচারীদের জন্যই সে ব্যবস্থা রয়েছে। তাহলে……তাহলে এই শেষ…এই ক'বছর তো মিছিলের মতো কেটে গেল…সাংঘাতিক দিনগুলি: যুদ্ধ: মিমি, লটে, কারকভের লাল চুলওয়ালী…কত মদ্যপান, হ্বিলির মতো ছেলেদের নিয়ে ফূর্তি…ওরা কেন যেন একটা বেড়ালছানাকে ফাঁসি লটকেছিল……তার ভাবনা আবার খেই হারিয়ে ঘুরপাক খেতে লাগলো। কর্পোরাল ষ্টেলব্রাখ্‌ট ক্রামার আর ব্রুণ-এর বরাদ্দ রুটি নিয়ে এল, কিন্তু ওরা তো সকলেই মারা গেছে। ষ্টেলব্রাখ্‌ট সেই রুটি এনে পুরে ফেললো তাঁর থলেয়. এখন সে গেছে ওবার লেফটেনান্টের সঙ্গে দেখা করতে…আমি তো জীবনে কিছু চুরি করিনি, এমন কি যখন ছোট ছিলাম, তখনও তাক থেকে মিঠাই চুরি করিনি। হা ঈশ্বর, এখন তো ক্ষিধেয় মরে যাচ্ছি! এটা তো ঠিক নয়— ষ্টেলব্রাখ্‌ট কেন সাড়ে চারশো গ্রাম রুটি পাবে? ওর তো আমার চেয়ে শরীরে তাগদ বেশী। বেশ তো, ও সন্দেহ করুক না, কিছুতো প্রমাণ করতে পারবে না। কেলার তার থলির ভিতরে খুঁজতে লাগলো, কিন্তু রুটি কোথায়? ইতর! সব খেয়ে ফেলেছে এরই মধ্যে! হঠাৎ কেলার হেসে উঠলো. চমৎকার এক গল্প—যে নৃতত্ত্ববিদকে অধ্যাপক বরহার্ড 'জার্মান বিজ্ঞানের আশা' বলেছেন, সে কিনা এক টুকরো রুটির লোভে চুরির বৃথা চেষ্টা করছে… যখন আমার সম্বন্ধীর কাছ থেকে তিনশো মার্ক ধার চেয়েছিলাম, এক সপ্তাহ লেগেছিল ভেবে দেখতে, কখন আমি ধারটা ঠিক শোধ দিতে পারব। আমাদের সভ্যতা তো শুধু উপরের পালিশ মাত্র—একমুহূর্তেই খসে পড়ে। আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে, এখন একটুকরো রুটির জন্য একটা লোককে গলা টিপে মেরে ফেলতেও পারি।

তারা এই অভিশপ্ত আবেষ্টনীর যন্ত্রণা ভোগ করছে দুমাস ধরে। প্রথমে

একটুও বুঝতে পারেনি যে তারা ঘেরাও হয়েছে; হয়তো জেনারেলরাই একমাত্র তা জানতেন, কিন্তু লেফ্‌টেনান্টদের প্রধান ক্রাউসও তা টের পাননি। তিনি ভোগলারকে ছুটি দিয়েছিলেন, কিন্তু সে চেঁচাতে-চেঁচাতে ফিরে এল!

বড় সুখবর অভিনন্দন জানাই! মনে হয়, এবার আমরা সত্যিকারের বেড়াজালে আটক হয়েছি। তার কথা বহুলোকেই বিশ্বাস করতে চায়নি। তারা ভাবলে, রুশদের আমরা ঘিরে ফেলেছি, আমরা আবার বেড়াজালে পড়ব কি করে?...কিন্তু দেখা গেল, ভোগ্‌লার ঠিকই বলেছে।

কেলারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে লেফটেনান্ট-প্রধান ক্রাউস স্পষ্টই এই ভাবই দেখালেন, তিনি একজন ননকমবাটাণ্টের সঙ্গে কথা বলছেন না, তিনি কথা বলছেন হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের সঙ্গে। কেলার চুপ করে থাকতে জানে, ক্রাউসও তাই তাকে মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলেন, যা অন্য কাউকে বলেন না। সেই ডিসেম্বরের শুরুতে তিনি কেলারকে বলেছিলেন যে, পল্টনের সেনাপতি রোস্তভে পশ্চাৎ-অপসরণের জন্য পেড়াপীড়ি করছেন; বহু জেনারেলেরও এই মত; কিন্তু উপরওলাদের মধ্যে এমন লোকও বহু আছেন যাঁরা জোর দিয়ে বলছেনঃ স্তালিনগ্রাদ যে ভাবেই হোক রক্ষা করা দরকার। (ক্রাউস এই সঙ্গে মন্তব্যও জুড়ে দিয়েছিলেন, এরা হচ্ছে হিটলারী দলের গোঁড়া সভ্য, এরা সামরিক নীতি সম্বন্ধে অজ্ঞ।) কেলার এসব শুনে হতবুদ্ধি হয়ে গিছলো; তার সবচেয়ে অবাক লেগেছিল ক্রাউসের সরলতা দেখে; তিনি এই দলের ক্ষ্যাপা সভ্যদের নিন্দে করতে ভয় পাচ্ছেন না! উনিশশো তেত্রিশ সালে অবিশ্বাসীরা তো এমনি করেই হিটলারী দলের সভ্যদের বিরুদ্ধে বলতো; তারও যে একথা মনে হয়নি তাও নয়। পরে একথা মনে হলেও শুধু নিজের স্ত্রীর কাছেই বলতে পেরেছে, তাও, আবার ফিসফিস করে—জোরে নয়।....স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, অবস্থা মন্দ, ক্রাউসের মতো লোক যখন জিভ নাড়তে শুরু করেছেন, তখন···আমরা তো স্তালিনগ্রাদে আঘাত হানছি আগষ্ট মাস থেকে; এই শেষ হুকুম এল সেদিন, শেষ প্রতিরোধ-ঘাঁটি

চুরমার করে ফেলতে হবে। তারপরেই হঠাৎ দৃশ্য বদলালো: দেখা গেল আমরাই 'স্তালিনগ্রাদ রক্ষক'। এর মাথা মুণ্ডু তো বুঝতে পারি না···

তাদের দৈনন্দিন জীবনে কোনো অদল-বদল হয়নি। সেই অসহ্য গোলার গর্জন, তেমনি একটা বাড়ির জন্য, একটা খাতের জন্য চলছে লড়াই। হ্বিলির ছেলেমানুষী আর অশ্লীলতা, হ্বারগেউয়ের হামবড়া ভাব, সিমিডের কান্না। খাবার কম, তবু এখনো কিছু আছে। ভোগলার খবর দিলে রুমানিয়ান ঘোড়সওয়ার বাহিনী এখন পদাতিক বাহিনী হয়ে গেছে, মানুষকে খাওয়াবার জন্যে ঘোড়াগুলিকে সঁপে দেওয়া হয়েছে রান্নার। পাত্রে ঘোড়ার মাংসের গুলাস খুব প্রিয়খাবার। হ্বারগেউ চেঁচিয়ে উঠলো, আমার যদি ক্ষমতা থাকতো এই রুমানিয়ানগুলোকে খতম করে দিতাম। আমরা যখন একটা শুয়োর কি হাঁস পাই, ঠিক ওরা এসে জোটে, কিন্তু যখন ইভানদের তাড়াতে হয়, তখন ওদের পাত্তাই মেলে না......

ক্রাউস জানালেন: ফ্যুরারের আদেশ এসেছে, সবকিছু বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও টিকে থাকতে হবে। এই অবরুদ্ধ সৈন্যদলের সাহায্যে আসছে এক বিরাট বাহিনী ট্যাঙ্ক নিয়ে, ফন্ মানষ্টাইন সে বাহিনী পরিচালনা করছেন।

আরো দুসপ্তাহ চলে গেল। ভোগলার একজন রুশ স্নাইপারের হাতে মারা পড়লো। শীত শুরু হয়ে গেছে। রুটির বরাদ্দ এখন আরো কম। প্রধান লেফটেনাণ্ট ক্রাউস শুধু বার বার আউড়ে যান; সাহায্য আসছে শীগ্‌গিরই......কিন্তু কেলারের সঙ্গে আলাপ করতে-করতে বলেন, মানষ্টাইনের ট্যাঙ্ক আসতে পারছে না। আমাদের নিজেদের পথ করে ওদের সঙ্গে গিয়ে মেলা উচিত, কিন্তু কোথায় যেন একটা গলদ আছে··· ঐ যে ভূঁইফোড় উপরওলারা, ওরা তো চেঁচানো ছাড়া আর কিছু জানে না....এখন একটি মাত্র উপায় আছে—তা হচ্ছে টিকে থাকা, লড়ে যাওয়া ...জার্মানীর সম্মানে ঘা পড়েছে। এটা না বড়দিনের আগের দিন। কিন্তু আনন্দ তো এক ফোঁটা নেই...···

বড়দিনে সবাই আধসের রুটি, টিনের খাবার আর সামান্য রম্ পেল। কেলার মনমরা হয়ে আছে। সে বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাই রম্ এক চুমুক খেয়েই মাতাল হয়ে পড়লো। সে চায় সান্ত্বনা, চায় স্ফূর্তি—কিন্তু রুশরা তাদের এলাকায় প্রচণ্ড জোরে বর্ষণ করছে গুলী। বেজন্মা ওরা, ওদের বড়দিনের উপরও ভক্তি নেই।...কেলারের চোখের সামনে ভেসে উঠলো এক ছবি—একটা বড়দিনের গাছ, তার উপরে তুষার ছড়ানো, তুষার চকচক করছে, রুডি একটা কাঠের বন্দুক আঁকড়ে ধরে আছে... গার্ডা উৎসবের তোড়জোড় করছে, একটা বেশ মোটাসোটা হাঁস কিনেছে, বাদাম-ছড়ানো পিঠে গড়েছে, আর মেঠাই···তার মনে হোল, সে পেট ভরে খেয়েছে, কিন্তু তবু শান্তভাবে ভাবতে পারলো না খাবারের কথা··· মানুষ কি জন্তু?....এমন রাতেও আমি মনে ফূর্তি পাচ্ছি না!......সে গার্ডার কথা ভাবতে বসলো, ভাবতে বাধ্য করলো নিজেকে। প্রথম যখন তাকে দেখে কেন যেন সেই ছবি মনে পড়লো....সে ছিল দুর্বল, মনের কথা খুলে বলতো। ও যখন তাকে জড়িয়ে ধরতো, সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলতো। ও জিজ্ঞেস করতো: লাগলো নাকি? সে উত্তর দিত: না, এতো আমার সুখের নিশ্বাস...প্রিয়া গার্ডা, প্রিয়া—তাকে সে আর দেখতে পাবে না! সে নাক ঝাড়লো—চোখের জল তার সঙ্গে মিশে গেছে। সে ঘুমুতে পারছে না— নিজের উপর তার কি করুণাই না হচ্ছে।

কেলার নিজেকে সান্ত্বনা দিলে, যাক সবাই তো মুষড়ে পড়েছে। আমাদের যথেষ্ট খাবার নেই বলে না এমন হোলো। একটা পাখীর খাবার খেয়ে কি সমস্ত লোক বাঁচতে পারে? হ্বারগাউ হচ্ছে পল্টনের সবচেয়ে শক্ত-সমর্থ লোক, বহু মাইল ধরে মার্চ করেও সে এলিয়ে পড়ে না, কখনো ঠাণ্ডার জন্যে অভিযোগ করে না। সবাই তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে, অবশ্য কেউ কেউ ওর চোয়াড়ে স্বভাব পছন্দ করে না। এমন শহর পথে পড়েনি, যেখানে ও একজন মানুষ মারেনি—শুধু ইহুদী বা

কমিউনিষ্ট হলে তার মানে বোঝা যেত—কিন্তু সাধারণ বাসিন্দেদের ধরে ধরে সে খুন করেছে। কারকভ-এ এক গাড়িবারন্দায় ফাঁসি লটকিয়ে একটি স্ত্রীলোককে খুন করে চেঁচিয়ে বলেছিল ঃ মেয়েটা ডাকাত! কিন্তু পরে সে-ই স্বীকার করে, মেয়েটা মেঝের তক্তার নীচে একটা সোনার ঘড়ি লুকিয়ে রেখেছিল, সেটা পেতে আমাকে কি নাজেহালই করেছিল মেয়েমানুষটা। কিন্তু সেই হ্বারগেউকে এখন চেনা দায়, সারাদিন সে গজরায় ঃ আমি এত ভাবছি কেন?...আমি কি করলাম? আমার মনে হচ্ছে ভিতরটা যেন তোলপাড় করছে...সিমিড সবাইকে একখানা পুরানো হলদে কাগজ ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে, তাতে লেখা ঃ ষোলোশো আঠাত্তর সালের সাতই জানুয়ারী সাধ্বী ডোরোথিয়া এই পাপীকে এসে দেখা দিয়ে বললেন, যে এই লেখাটি নকল করে রাখবে, ভগবানের কাছে তিনবার প্রার্থনা করবে, আর তীর্থ-যাত্রীকে ভিক্ষা দেবে—তাকে ভগবান অগ্নিদাহ, শীত, ক্ষুধা আর পাকস্থলীর নানা রোগ থেকে অব্যাহতি দেবেন...কেলার সিমিডকে গর্দভ বলে ডাকলে, তবু সেও লেখাটি নকল করে রাখলে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলে, আর আপন মনে বললে ঃ এমন হাল হয়েছে, এখন ভিক্ষে দিলে আমিই হাত-পেতে নেব।......সিমিড বার বার জিজ্ঞেস করছে ঃ আমরা এখানে মরতে এলাম কেন?...সবাই বলছে, ওর মতো আর একটি বোকা সারা ব্যাভেরিয়া খুঁজেও পাওয়া যাবে না (পল্টনে সে-ই একমাত্র ব্যাভেরিয়ার মানুষ); কিন্তু কেলারও সিমিডের মতোই আপন মনে ভাবতে লাগলো, আমি এখানে কেন এলাম?

গুজব শোনা গেল, রুশরা চরম দাবী জানিয়েছে। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যারা আত্মসমর্পণ করবে তাদের জীবন রক্ষা করা হবে। কেলার সাহস করে ক্রাউসকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, কথাটা সত্যি কিনা। ক্রাউস জবাব দিলেন ঃ

আমিও শুনেছি...তবে একথা ভেবোনা যে, দেবতাদের রহস্যের আমাকে অংশীদার করা হয়েছে......

আপনার কি মনে হয়, তার কোনো সম্ভাবনা আছে ?......

না, আমরা ফরাসী বা ইংরেজদের বিরুদ্ধে তো লড়ছি না। আমরা রুশদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারি না। বহু হয়েছে, আর···তিনি একটু থামলেন, বোধহয় ভাষা খুঁজছিলেন। পরে বললেন, তার মানে, যুদ্ধটা বড় বেশী হয়ে গেছে···

সে রাতে হ্বিলি কেলারকে ফিসফিসিয়ে বললে,

আর তো এসব সইতে পারি না। একটু যদি বেশী সাহস থাকত, আমি মাথাটা বার করতাম, আর একটা ইভান আমাকে খুন করতো। জেনারেলের মরা সহজ, তিনি তো সবকিছু ভোগ করে নিয়েছেন, তাছাড়া আমাদের মতো কষ্টও ভোগ করেছেন না। তাঁর আছে যথেষ্ট খাবার, তার খাত এমন ভাবে তৈরী যেখানে গোলাগুলী কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না।....কিন্তু আমি তো আমার জীবন এখনো উপভোগ করিনি। সবে উনিশ বছর আমার বয়েস...কেন আমি মরবো? সবাই বলছে, রুশরা আমাদের আত্মসমর্পণ করতে বলেছে...

তাতে কিছু লাভ হবে না। ওরা আমাদের প্রাণ বাঁচাবে, বলছে, কিন্তু পরে মেরে ফেলবে।

কেন ?

ওরা এশিয়ার মানুষ। খুন আছে ওদের রক্তে। তাছাড়া ওরাও আমাদের কাছে এই ব্যবহারই পেয়েছে। আমার মনে পড়ছে, হ্বারগেউ কি করে মিলরেভোতে তিনটে লোককে ফাঁসি লটকেছিল।

হ্বিলি তাড়াতাড়ি বললে, আমি তো কাউকে ফাঁসি লটকাইনি। আমি শুধু ফাঁসি কাঠের কাছে দুবার দাঁড়িয়ে ফোটো তুলেছি, আর সে তো একটু ফূর্তির জন্যে ..

আমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না, আমি তো আর ইভান নই······

কেলার মনে মনে ভাবলো: আহা দির্জ্যা ছিল কত ভাল! কিন্তু

ফরাসীদের হাতে পড়লে তারা কি করতো কে জানে ?...মিমি আমার কাছে আসতো বলে ওকে ওরা খুব মার্‌ধর করেছিল....আর অধ্যাপক হ্যুমা ?...... ভয়ানক বুড়ো ; ও তো তোমার গলা কেটে ফেলতে পারে . হয়তো আমরাও এ জন্য কিছুটা দায়ী। তা বটেই তো, আমরা ওদের দেশে হানা দিয়েছি, আর সেটা তো খুশির ব্যাপার নয়...আর মাঝে মাঝে আমাদের লোকগুলো একটু বেশি নিষ্ঠুর হয়েই উঠেছে। আমি নিজে খারাপ কাজ কিছু করিনি,... কিন্তু ওরা আমাদের পছন্দ করে না, কেউই করে না...ওরা ঈর্ষা করে, ভয় করে...কিন্তু হ্বারগেউ যে ফ্রান্সে ভাল ব্যবহার করেছে, একথা আমি হলপ করে বলতে পারি না। জানিও না তার কথা, সে তখন আমাদের পল্টনে ছিল না। এখানে, রাশিয়ায় এসে ওর বাড় বেড়ে গেছে...আমি একজনও বে-সামরিক অধিবাসীকে হত্যা করিনি। তবে কঠোর হতে হয়েছে বইকি, 'দয়া করে' বা 'ক্ষমা করুন'—এসব কথা তো আর রুশদের বলা যায় না, ওরা এসব ভদ্র ব্যবহারে অভ্যস্তও নয়...হাঁ, একথা সত্যি যে, মেয়েটা যেতে চাইছিল না, আমি ওকে জোর করে টেনে নিয়ে গিছলাম। কিন্তু সেটা কি অপরাধ ? যখন একজন মানুষ বহুদিন ধরে মেয়েদের সংস্পর্শে না আসে, তখন তো ভদ্র সমাজের নিয়ম-কানুন সে তুচ্ছই করে। কিন্তু আমি মেয়েটার কোনো ক্ষতি করিনি ; সে কেঁদেছিল। সব রুষই একটু বেশি ভাবপ্রবণ ; দস্তিয়েভস্কী পড়লেই তো তা বোঝা যায়...অবশ্য হ্বারগেউ আর ভোগলারের কথা আলাদা, ওরা একটু বেশিই বাড়াবাড়ি করেছে... কিন্তু তাদের দোষ দিতে পার না...আমাদের প্রধান লেফটেনাণ্ট লোকটার নম্র স্বভাব, আর যা-ই হোক, লোকটা ক্ষ্যাপাও নন, কিন্তু তিনিও ক'টা দস্যুকে ফাঁসি লটকেছেন, তাদের মধ্যে একটা মেয়েও ছিল...রুশরা প্রথম থেকেই আমাদের উপর খাপ্পা হয়ে ছিল—ওরা কিছুতেই পরিস্থিতিটা মেনে নিতে পারেনি...কিন্তু যা-ই হোক, ক্রাউস ঠিকই বলেছেন, আমাদের লড়ে যেতে হবে, আর অন্য উপায় নেই।

পরের দিন ভোরে ওরা জানতে পারলে দুপুর রাতে হ্বারগেউ রুশদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। প্রধান লেফটেনাণ্ট বললেন, আমি সবসময়েই ভাবতাম, ও তো সৈনিক নয় কসাই...হ্বিলি গাল্যগাল দিয়ে উঠলো ঃ ঐ শুয়োরটা আমাদের বোকা বানিয়ে দিয়ে চলে গেল...

আমরাই বা গর্তে পড়ে আছি কেন? কেলার ভাবতে লাগলো। দুমাস আগে রুশদের পক্ষে হতাশার পরিস্থিতি ঘনিয়ে এসেছিল, কিন্তু তবু তারা টিকে ছিল। শুধু পাগলরাই বলবে, রুশরা আমাদের চেয়ে সাহসী···ভীরু সব সেনাবাহিনীতেই আছে—এটা ভীরুতার ব্যাপার নয়। রুশরা তাদের নিজেদের এলাকায় লড়ছে, নিজের শহর তারা রক্ষা করছে। আর ফ্যুরার আমাদের বলছেন, 'স্তালিনগ্রাদ রক্ষীদল'। কিন্তু কথাটা তো ঠাট্টার মতই শোনায়। কেন আমি একটা রুশ নগরের ধ্বংসাবশেষ রক্ষা করব? সিমিড্ ঠিকই বলেছে, কতদূর আমরা এসে পড়েছি ভাবতেও মাথা ঘুরে যায়। গ্রীষ্মে ভালই লাগছিল, আমরা তখন প্রায় এশিয়ায় এসে পড়েছি। উট আর কত অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। কিন্তু এখন তো ভয় লাগে। যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তো ভয়ানক, আবার বাড়ি থেকে বহুদূরে যদি মৃত্যু ঘটে, সে তো আরো ভয়ানক।...

উনিশ-শো ত্রিত্রিশ সাল—দশ বছর আগের কথা। কেলার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যুলারের সঙ্গে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল। খুব ঠাণ্ডা বাইরে। ওরা বরহার্ডের বক্তৃতা নিয়ে আলোচনা করছিল। হঠাৎ ম্যুলার থেমে পড়ে ফিসফিসিয়ে বললে, তোমার হিটলারকে পাগল বলে মনে হয় না? আমি ওর বক্তৃতা শুনেছি, ও তো খাঁটি পেরোনইয়াঃরোগী....কেলার উত্তর দিলে,... জানি না...কিন্তু আর কাউকে একথা বোলো না ..হাঁ, আমারও তখন সন্দেহ ছিল বইকি। অবশ্য, ম্যুলারের মতো অমন করে স্থূলভাবে বলিনি, কিন্তু তবু সন্দেহ ছিলই, পরে ফ্যুরারকে প্রতিভাধর বলেই ভেবেছি, আর সবাইও তাই ভাবত। না ভেবে কি উপায় ছিল; তিনি আমাদের একটা বিজয়

থেকে আর একটা বিজয়ের পথে নিয়ে যাচ্ছিলেন। হয়তো ম্যুলারের কথাই সত্যি ?...জার্মানীর সমস্ত যুবককে তিনি তাড়িয়ে নিয়ে গেছেন নরকে, আর সেখানে ফেলে রেখে গেছেন...কি ভয়ানক, বোলশেভিকরা যেমন ইশতাহারে লেখে, আমি যে তেমনি তর্ক শুরু করেছি। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই হয় তো আমি মরে যাব। মরবার আগে বিশ্বাসঘাতকের মতো আমার ব্যবহার! এ যে বিরক্তিকর! কিন্তু কেন আমি মরব—কিসের জন্য? জানি না...আমি কিছুই জানিনা...

কর্পোরাল ষ্টেলব্রাখট রুটি নিয়ে এল। সে কেলারকে এক চিলতে দিয়ে বললে,

প্রধান লেফটেনাণ্ট ক্রাউস মারা গেছেন। তিনি খাত থেকে মাথা বার করেছিলেন...কেলার উত্তর দিলে না! সে ষ্টেলব্রাখ্‌টের হাত থেকে রুটি ছিনিয়ে নিলে, তার চোখে হিংসা, বাঁকা আঙুলে ক্ষিপ্রতা। ষ্টেলব্রাখট্‌ গাল দিলে, বুনো ইঁদুর কোথাকার !...কিন্তু কেলার রুটি গপ্‌গপ করে গিলে চোখ বুজে আবার ভাবতে বসলো—আমাকে ইঁদুর বলো আর যা-ই বলো আমি গ্রাহ্য করি না...কিন্তু কেন আমি মরতে যাচ্ছি—কেন ?....

তেইশ

সার্জি যখন শুনলে, মেজর-জেনারেল পেত্রিয়াকভ সামরিক সম্মান-চিহ্ন বিতরণ করবেন, সে খুশিই হোলো। সে জেনারেলকে কয়েকবার পাড়ঘাটায় দেখেছে, কিন্তু সে-একদিন ছিল বটে! যাঁর সম্বন্ধে এত কথা শুনেছে, তাঁকে ভাল করে একবার দেখারও ফুরসৎ পায়নি; তার শুধু মনে ছিল, তিনি বেঁটে খাটো, একটু খুঁড়িয়ে চলেন।

পেত্রিয়াকভের সাহস, বিচার-বুদ্ধি সম্বন্ধে বহু তাক-লাগানো গল্প সে শুনেছে। তাঁর নাকি মাথা খুব ঠাণ্ডা। একদিন মেজর শিলেইকো জেনারেলের কাছে বিবরণ পেশ করছিলেন। একটা মর্টার গোলা তখন ফাটে, জেনারেল পড়ে তো গেলেনই, মাটিতেও অর্ধেক চাপাও পড়লেন। কিন্তু পরের মুহূর্তেই উঠে দাঁড়িয়ে মাটি ঝেড়ে মেজরকে বললেন, এ এক আপদ।...পরে শিলেইকো বলেছেন, সব কিছু তখন আমার চোখের সামনে ঘুরছে, কিন্তু তিনি বললেন, এই পণ্টনটা কোথায় খোঁজ নাও!...

জেনারেল পেত্রিয়াকভকে দেখলে একজন কৃষিতত্ত্ববিদ্‌ বা গ্রাম্য ডাক্তার বলে মনে হবে। কেমন সদয় আর ফোলা ফোলা তাঁর মুখখানা, তাঁর চশমা জোড়াও নাকে খাপ খায়নি, বারে বারে নাকের ডগা থেকে পিছলে পড়ছে। তিনি আস্তে আস্তে কথা বলেন, স্বরও তাঁর মসৃণ কোমল। একবার কর্ণেল রুমিয়ান্তসেভ তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ ইলিয়া ভাসিলিয়েভিচ, আপনি কি করে রাগ না করে পারেন? আমি তো কখনো আপনাকে উঁচু স্বরে কথা কইতে শুনিনি... পেত্রিয়াকভ হেসে বলেছিলেন, বাড়িতে কখনো কখনো গলার স্বর চড়িয়েছি বটে, কিন্তু এখানে তো তা করা যায় না—বড় গোলমাল, এর ভিতরে কাউকে কিছু বলে শোনাতে পারা যায় না। বরং আস্তে আস্তে বললে তার চেয়ে বেশি কাজ হয়......

পেত্রিয়াকভ এক ছুতোরের ছেলে। ছেলেবেলায় তাঁর স্বপ্ন ছিল তিনি হবেন স্থপতি। কিন্তু যখন গৃহযুদ্ধ বাধলো, তিনি ডেনিকেনের বিরুদ্ধে লড়তে গেলেন, আর তারপরে সেনাবাহিনীতে রয়েও গেলেন। তিনি বহু পড়া-শুনো করেছেন, বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা। তাঁর স্ত্রী এক স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, তিনি স্বামীর এই সামরিক বিদ্যার প্রতি অনুরাগের মানে বোঝেন না। তাঁদের বিবাহিত জীবনের প্রথম বছর, তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি কি বলতে চাও, তুমি যুদ্ধ ভালবাস? তিনি চশমা ঠিক করে নিয়ে একটু বিব্রত হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন—কোনো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভাববার

সময় অমনি করেই তিনি কথা বলেন্—না, তানিউসা, আমি যুদ্ধ ভালবাসি না, আর কে যে ভালবাসে তাও কল্পনা করা আমার পক্ষে শক্ত...কিন্তু আমাদের সেনাবাহিনী যত শক্তিশালী হবে, তত যুদ্ধের ভয় কমে যাবে। আমাদের মানুষরা শক্ত-সমর্থ, কিন্তু সামরিক জ্ঞান আমাদের কম। আমি নিজেই তা অনুভব করি...

জেনারেলের ওখানে পৌছতে সার্জিকে দুবার ভোলগা পার হতে হোলো। তার অবস্থা মনে পড়লো, কি তারা সহ্য করেছে। ওই যে—ওইখানে বরফের নীচে রয়েছে তার স্মৃতি•••অক্টোবরের রাতের পর রাত, ডুবন্ত বজরাগুলি, সাথীরদল, প্রতিরোধ সংগ্রাম...সবই কি অতীতের কথা ?•• সে তো এই পরিবর্তন ধরতে পারেনি। এই তো সেদিন তারা ভেবে কুল পেতনা, আর একদিনও তারা টিকে থাকতে পারবে কিনা। জার্মান ট্যাঙ্কগুলি আসতো গুঁড়ি মেরে এগিয়ে। ছাদের কার্নিস থেকে মাথা তুলে দেখাও তখন অসম্ভব। কি জার্মানরা এখন খাতে নেমেছে, লুকিয়ে আছে। যুদ্ধক্ষেত্র এখন আরো পশ্চিমে সরে গেছে। ফ্রিৎসরা এখনো সর্বত্র রয়েছে, তারা সংখ্যায়ও বহু, কিন্তু তারা যা ছিলো তাতো নেই। সার্জির জীবনের এক-গোটা দিনকে 'দক্ষিণতীর' কথাটা নিয়ন্ত্রিত করছিল, আজ আর সে অর্থ তার নেই। সব কিছু বদলে গেছে।

জেনারেল পেত্রিয়াকভ হেসে বললেন,

ক্যাপটেন ভলাকভ পেয়েছিলেন খেতাব, কিন্তু আমি এ খেতাব দিচ্ছি একজন মেজরকে। এটা অবশ্য ভুল নয়, কিন্তু ঘটনাচক্রে এমনি দাঁড়িয়েছে বটে......

সার্জি লাল পতাকা পেল, লেফটেনান্ট ভাসিলিস্কো পেলেন অর্ডার অফ লেনিন। জেনারেল তাদের অভিনন্দন জানালেন। তারা এবার সদর ঘাঁটিতে গিয়ে পৌছলো। তুষারময় দিন, তবু রোদের ঝলক আছে। তুষার যেন সহানুভূতি ভরে ক্ষত-বিক্ষত মাটি ঢেকে দিয়েছে। পেত্রিয়াকভ বললেন,

তুমি তো শুরু থেকেই আছ, তাই না? কি শহরই না ছিল! আবার নূতন করে গড়তে হবে। কমরেড মেজর, কোন বিষয়ে তুমি পারদর্শী?

সেতুর ব্যাপারে।

বহু কাজ তোমার জন্যে পড়ে থাকবে।......একটা সেতুও আস্ত আছে বলে আমার বিশ্বাস নেই। নিয়েমেন থেকেই আমি লড়াইয়ে নামি। কত সেতুই দেখলাম। আমরা তৈরী করলাম সেতুর পর সেতু—তারপর? ......জার্মানদের কি হোল বুঝতে পারছ? আমি তো পারছি না। কাল একজন বন্দীকে ওরা নিয়ে এল—সে একজন মেজর—পড়াশুনো করেছে। কিন্তু অসভ্যের মতো তার কথাবার্তা...কত বিশ্ববিদ্যালয় আর গ্রন্থাগার ওদের ছিল। কিন্তু এখানে এসে তো সব ভাঙছে, এবার ঢুকেছে গর্তে, ঘোড়ার হাড় চুষছে। ওরা প্রাগঐতিহাসিক ট্রগলোডাইট্স।

ভাসিলিস্কো যুদ্ধের আগে ছিল স্কুলের শিক্ষক। সে বললে,

ব্যাপারটা হচ্ছে, যে যেরকম আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠে কমরেড-জেনারেল ..

ঠিকই বলেছ। আমরা সৈন্যরা লড়তেই জানি। আর আমাদের পরিধিও সংকীর্ণ; ভাল সৈন্য তৈরী করতে হলে খাঁটি মানুষ চাই, কিন্তু আমরা তো খাঁটি মানুষ তৈরী করতে পারি না, ছেলেবেলায়ই মানুষ তৈরী হয়... যুদ্ধের শুরুতে আমরা বাজেভাবে লড়াই করেছিলাম, এর তো আর কোনো রাখা ঢাকা নেই......আমরা যে টিকে আছি, এর কারণ সৈন্যদের....... আমি সবচেয়ে শক্ত কথাই বলছি; কথাটা হচ্ছে মানসিক উৎকর্ষ।

পেত্রিয়াকভ বাড়ীগুলোর দিকে আবার তাকালেন, সার্জি দেখলে জেনারেলের চোখ দুটি সদয় আর বিষণ্ণও যেন।

সার্জি পরে যখন নিজের পল্টনে ফিরে যাচ্ছিল, তার ঐ চোখ দুটির কথা মনে হোলো। অদ্ভুত—একজন সৈনিক, অথচ তিনি যুদ্ধের পরে কি হবে তাই নিয়ে কথা বললেন।

একজন জার্মান জেনারেল এভাবে যুক্তি দিতে পারতেন না। এরে

দুটি পৃথিবী—তার জীবনে এই প্রথম সে লেখার তাগিদ অনুভব করলো। একথা তো চিঠিতে বর্ণনা করা যায় না, লেখা যায় না খবরের কাগজে প্রবন্ধ হিসেবে, তোমাকে এ বিষয় নিয়ে লিখতে হবে একখানা মহাকাব্য, একখানা উপন্যাস। সে হেসে উঠলো—হুঁ লেখক বটে! আরে, আমি যে মার কাছেও কোনো কিছুর ঠিক মতো বর্ণনা দিতে পারি না...... এতো নিঃসন্দেহ যে, সামরিক খবরের কাগজে ওদের লেখক আছেন, সবাই তো বলে সিমনভ এখন এখানে, গ্রসমান লেখেন ভেজদার জন্য; আমি তো তাঁকে পাড়ঘাটায় দেখেছি। হয়তো ওঁরাই লিখবেন......কিন্তু এ বড় শক্ত কাজ—এর জন্যে চাই শান্তি, চাই নির্জনতা। কিন্তু আর কি শান্তি আর নির্জনতা ফিরে পাওয়া যাবে? ভাবতেও ভয়ানক লাগে যে, একথা মানুষ ভুলে যাবে, একটা ঘটনা আর একটা ঘটনাকে গ্রাস করবে। এই তো আমিই কত কথা ভুলে গেছি......এখানে জোনিনের সঙ্গে কি করে এসে পৌছলাম আগষ্ট মাসে....জোনিন বলেছিল, এ এক আচ্ছা ব্যাপারে পড়েছি......হ্যাঁ এক দুঃসাহসিক অভিযানই বটে—এতে যাঁরা নায়ক তাঁদের আছে পেত্রিয়াকভের মতো চোখ। এতো আর বাজে নভেলের উপাদান নয়।......এ তো এক অপূর্ব গল্প। যদি কখনো লেখা হয়তো এখন থেকেও একশো বছর পরেও মানুষ পড়বে। একজন মেষ-পালকের ছেলে কি করে গেল স্কুলে, নক্ষত্র আবিষ্কার করলে, মূল আর সংখ্যা আবিষ্কার করলে, তারপরে জলের উপর গড়লো সেতু। রেড অক্টোবর কারখানায় কাজ করলে, তারপরে এই নূতন ভঙ্গুর কিন্তু চিরন্তন পৃথিবীকে এখানে রক্ষা করলে—এক ফালি জমির উপরে—তারপরে মারা গেল। এখন সে শুয়ে আছে ধ্বংসস্তূপের নীচে।......

পেত্রিয়াকভ সার্জিকে চূড়ান্ত জবাবের কথা জানালো। জার্মানরা আত্মসমর্পণ করতে চায় না, তাই তাদের বাধ্য করতে হবে। এমন সময় রাশোভস্কী এসে হাজির।

তিনি বলিলেন, কি বোকা দেখ দেখি, লেভিন মারা গেল...বালাস্‌কীন ফ্রিৎসদের এবার কোটে পেয়েছে, তাই ওরা মর্টার চালাচ্ছে জোর....একটা বোকার মতো দুর্ঘটনা ঘটে গেল। কি আফশোষ বলতো! লোকটি ছিল ভাল অস্ত্রচিকিৎসক, আমার পা খানা বাঁচিয়ে ছিল।

সার্জি বিষাদে মগ্ন। লেভিনকে সে পছন্দ করতো। আর এতো সত্যিই বোকামি—এতদিন ধরে বেঁচে থেকে ঠিক শেষ হবার মুহূর্তেই মারা গেলেন ......হয়তো বোকামি বলেই মনে হবে? লেভিনের ছেলে মারা গেছে বহুদিন। জার্মানরা তখন এগিয়ে আসছিল। তখনই বা মরাটা বোকামি নয় কেন?......লেভিন ভোলগা নিয়ে তার ছেলের লেখা পদ্য পড়লেন, নদী যেন দুঃখের মতো। নদী আর বইল না, থেমে গেল।... ...লেভিন মারা গেলেন। এই শেষ মুহূর্তেও যে-কেউ মরতে পারে আর মরবেও......লেভিন হয়তো মৃত্যুর আসন্নতা বুঝেছিলেন......শেষবার যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়, তিনি বলেছিলেন, ব্যাপারটা ভালই চলছে, এইবার হয়তো মোড় ঘুরবে। তার পরে একটু থেমে বললেন, আমার ছেলে এখানে মারা গেছে, 'আমার ভাই পশ্চাৎ-অপসরণের সময় হত হয়েছে, জার্মানরা নিঃসন্দেহে আমার স্ত্রীকে হত্যা করেছে—সে ছিল নিপ্রোপ্রেত্রভস্ক-এ, আমি জানি না আমি কি করে বেঁচে আছি......

শেষের কটা দিনের ঘটনা বিরাট হয়েই দেখা দিল। জার্মানদের ধ্বংস স্তূপের ভিতর থেকে বার করা হোলো; সেলারগুলো দেওয়া হোল উড়িয়ে, ট্রেঞ্চগুলি চষে ফেলা হোল। কাটুসা আর মর্টার বিরামহীন ভাবে লাগলো গর্জাতে। বরফ ঢাকা বাড়ির ধ্বংসাবশেষের উপর কালো ধোঁয়া ভাসতে লাগলো। শব্দ এত প্রচণ্ড যে, সুলিয়াপভ বললে, এ যেন নরক গুলজার......

হঠাৎ নীরবতা ঘনিয়ে এল। এ এত অস্বাভাবিক যে সার্জি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেললো। অবশ্য তার আগে চুপচাপ ছিল সব, ছিল নীরব প্রহর, কিন্তু

রাইফেলের গুলির শব্দ তখনো শোনা যেত। কোথায় দূরে যেন একটা মেশিনগান রা-টা-টা করে চলতো গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসতো হাওয়ায়। কিন্তু নীরবতা এখন ঘন নিরবচ্ছিন্ন। এক আঘাত হেনে স্তালিনগ্রাদ যেন সমর অঙ্গনের বহু পেছনে চলে গেছে। নীরবতা এখন হতবুদ্ধি করে দেয়, পীড়া দেয়, তোমাকে ঘুমুতে পর্যন্ত বাধা দেয়।

সার্জি একটা পথ ধরে চলছিল। একটা বাড়ীও আস্ত নেই......... বালাসকিনের ঘাঁটি এখানে ছিল। ছ'মাস ধরে তারা এই পথের জন্য লড়াই করেছে....মৃতদেহ, শিরস্ত্রাণ, জলের বোতল, কাঁকর, কাঁটা তার......

বহু জার্মান সৈন্যের সঙ্গে তার দেখা হোলো, কেউবা প্রহরীর তাঁবে চলেছে, কেউবা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, চাঙা হবার জন্য কোথায় যাবে তারা জানে না। তারা গুড়ি মেরে বেরিয়ে আসছে ভূগর্ভের আশ্রয় থেকে, টলতে-টলতে চলছে—ক্ষুধায়, ভয়ে, তাদের আগেকার ছাউনি গুমোট আবহাওয়া থেকে ভীষণ ঠাণ্ডা হাওয়ার মাদকতায়। সমস্ত শহর যেন সামরিক ধূসর ছায়ায় ভরে গেছে।

সার্জি তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলো। তার মনে ঘৃণা নেই, করুণা নেই! জার্মানরা এখনো রাশিয়ার বুকে, এখনো তারা শাসন করছে ইউরোপ। কিন্তু এখন মৃত অথচ বিজেতা স্তালিনগ্রাদের এই নিস্তব্ধতার ভিতরে, ওদের আর মানুষ বলে মনে হয় না, ওরা যেন অশরীরী আত্মা।

সার্জি মেজর শেইলেকোকে জিজ্ঞেস করলো, কখন কি ভেবেছ, এরা এত চুপ মেরে যাবে?

মেজর তর্ক করতে ভালবাসে। যখন কেউ বলে, এমন গুলী আর বোমার বহর আর কখনোও দেখা যায় না, সে সব সময়েই জবাব দেয়ঃ আমি এর চেয়েও ঢের বেশি দেখেছি...কিন্তু এবার সে জবাব দিলে,

হাঁ, এমন আর শোনা যায়নি বটে ..

সে একটা গুহায় বসে হাসছিল, তার গ্রামোফোনটা এখন চুপচাপ।

আগের মতই খুদে মেয়ে ভারিয়া টেলিফোনের কাছে রয়েছে। শিলাইকো তার দিকে দেখিয়ে দিয়ে হাসলো—ভারিয়া ঘুমিয়ে গেছে। এই প্রথম সে শান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে, টেলিফোন এখন আর ভাগ্য-নিয়ামক যন্ত্র নয়—তার গুনগুনানির তো অর্থ ছিল জার্মান ট্রাঙ্ক এসে হাজির হবে, অথবা জার্মান টমি-বন্দুকধারী দল গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে। ভারিয়া দুর্বলা, পাংশু মুখখানি, বুদ্ধিভরা বিষণ্ণতার চোখ। মেজর সাজিকে একবার ভাল বেসেছিল, ভারিয়া ছিল ছাত্রী তার বাবা মা আর ছোট ভাই লেনিনগ্রাদে উপোস করে মারা যায়। সাজি ঘুমন্ত মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হাসলো!

ও ভাল করে ঘুমোক···

সাজি ভালিয়াকে চিঠি লিখলো: তোমার জানা উচিত আমি তোমাকে কতখানি ভালবাসি। অতীত নিয়ে অথবা তোমার আমার কল্পনায় যে সব কথা লুকিয়ে আছে, তা নিয়ে অযথা ঈর্ষা করো না। আমি আমার স্বপ্নে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, কিন্তু বাস্তব জীবনে তো নয়। বর্তমানে আমরা সরল আর কঠোর জীবন কাটাচ্ছি। ভালবাসাও যদি এমনি সহজ সরল আর কঠোর হোত! আজকের দিনটা বড় জবর দিন, তাই প্রথমেই যুদ্ধ শেষ হলে কি হবে তোমার কাছে সে কথা লিখতে চাইছি। দু'সপ্তাহ আগেই প্রথম এই কথাটি আমার মনে হয়। সত্যিকথা বলতে গেলে আমাদের জেনারেলই এই ভাবনাটা আমার মাথায় ঢুকিয়ে দেন। আমি ভাবতে চেষ্টা করছি, কি নীরবতাই না চারদিকে দেখা দেবে। আমি একবার তোমাকে ভোরোনভের কথা লিখেছিলাম, সে কথা কি তোমার মনে আছে? সে হত হবার আগে বলেছিল, ডনের উপরের সেতু আবার তাকে গড়তে হবে, আমাদের আক্রমণের কথা সে আগেই ভেবে রেখেছিল। আমি এখন ভাবছি এই সব সেতুর কথা, এগুলি আমরা পরে গড়ে তুলব। হয়তো আমার এই স্বপ্ন অকালেই এসেছে, যুদ্ধ তো এখনো শেষ হয়নি, যদিও বাকিও নেই। আমি এখন ভাবছি

সেই মুহূর্তের কথা—যখন আমাদের আবার দেখা হবে। আমার কাছে তোমার প্রেম হচ্ছে নতুন এক জীবনের, আমার দ্বিতীয় জীবনের সেতু। এমন আবোল তাবোল বকলাম বলে ক্ষমা কোরো। তুমি অবাক হতে পার, কিন্তু এই নিস্তব্ধতা যেন কেমন আমাকে হতবুদ্ধি করে ফেলেছে। ভাল থেকো, আমার কথা ভেবো না, এখন সবই সহজ হয়ে আসবে।

তাবুর আগুনের কুণ্ডের ধারে কয়েকজন বসেছিল। স্থলিয়াপভ থেমে থেমে পড়ছিল, 'ওরা জানুয়ারী চিঠি পাঠাচ্ছি। সু-সন্ধ্যা প্রিয় ভানুসা আমার। প্রথম কথাই বলতে চাই, আমি বেঁচে আছি, ভাল আছি। তুমিও তেমনি থাক এই আমার কামনা। মিতিয়া বীরের মত মরেছে। যখন বিজ্ঞপ্তি এল, বাবা কিছু বললেন না; আমি কান্না চেপে রাখতে পারছিলাম না, কিন্তু তিনি চুপচাপ। রাতে তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন গিয়ে, আর বললেন তিনি নড়তে-চড়তে পারছেন না...

গলায় ধোঁয়া গিয়ে কেসে উঠলো, স্থলিয়াপভ আগুনের কুণ্ডের ধার থেকে সে সরে এল।

ওরা শিটিয়ে যাওয়া হাত-পা ছড়িয়ে দিয়েছে আগুনের দিকে। আঁধার হয়ে এল। একজন পদাতিক সৈনিক বলছিল:

আমি জেনারেলদের হামাগুড়ি মেরে বেরিয়ে আসতে দেখলাম। তাদের হাত মাথার উপর তোলা। বড় ভীরু ওরা···পরে একজন দোভাষী বললে, একজন জেনারেল খুব ক্ষেপে গিছলো, সে তার পা ঠুকে চেঁচিয়ে মাত করলে—সে যাতে আত্মহত্যা না করতে পারে তাই তার ক্ষুরখানা অবধি কেড়ে নেওয়া হোল—তখন তার দাড়ি কামাবার খুব ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু আত্মহত্যা করতে ও চাইছিল কেন? ও তো তখন খুশি হয়েছে.......

আগুনের কুণ্ডের ধারের লোকগুলি হেসে উঠলো, স্থলিয়াপভ গাল দিয়ে উঠলো, পাজি বেটা। এখন তো খুশি, কিন্তু পাজিটা কত লোক মেরেছে ভাবতো?

সবাই আবার চুপচাপ, নীরবতা উপভোগ করছে ; তারা যেন গ্রাস করতে চায় নীরবতা, তেমন করে যেন উপভোগ করতে পারছে না।

স্থলিয়াপভ সাজির কাছে গিয়ে বললে,

কমরেড মেজর, একেই তাহলে জয়লাভ বলে ?

এই অস্বাভাবিক কথাটা শুনে শিউরে উঠলো সাজি। হাঁ, হাঁ, এতো একটা আক্রমণে সাফল্য নয়, ভাগ্যের আকস্মিক ঝলক নয়, এ হচ্ছে জয়লাভ।

ল্যুভরের সেই মূর্তির কথা তার মনে পড়লো। যখনই সে সেই চিত্রশালায় যেত, সে মূর্তিটির কাছে গিয়ে দেখতো। তার মনে হোত বিজয়-লক্ষ্মী যেন তার দিকে উড়ে আসছে সোজা...মাথা নেই, মুখ নেই, শুধু পাখা....সে তো অনেক দিনের কথা, তখন ছিল শান্তি। মাদো, বাদামগাছের তলায় বেঞ্চি পাতা...অথবা এসব হয়তো কিছুই ছিল না, হয়তো সবই স্বপ্ন, একখানা পুরাণো হলদে মলাট-দেওয়া নভেল মাত্র ?

কেন মানুষ ভাবে বিজয়-লক্ষ্মী উড়ে উড়ে চলেন। এ তো সত্যি নয়। তাঁর পা যে ক্ষত-বিক্ষত, রক্ত ঝরছে, তিনি কাদায় হামাগুঁড়ি দিয়ে চলছেন তুষারের ভিতরে, গুঁড়ি মেরে গিয়ে লুকোচ্ছেন বোমার গর্তে। তাঁর দেহ ক্ষততে ভরা, তিনি ক্লান্ত, শীতে কাঁপছেন...তাকে দেখে হয়তো খুদে এই সিগন্যালের মেয়েটির মতো মনে হয়—যে মেয়েটি মেজর শিলেইকোর গহ্বরে বসে আছে। ভারিয়াই বোধ হয় ওর নাম।......হাঁ, ও ঐ রকমই, আলুথালু কেশবাস—কিন্তু তবু মূর্তিমতী বিজয়লক্ষ্মী, হাঁ, সেই। সে স্যাপারদের কাছে এসে বসেছে আগুনের ধারে। তার ঠাণ্ডা লাগছে। কিন্তু আগুন নিবে গেছে, শুধু জ্বলন্ত কয়লা দেখা যাচ্ছে—আর আছে একটু মানসিক—উত্তাপ—সহানুভূতি . ...

চব্বিশ

কেলার সারাদিন কাটালো মানসিক যন্ত্রণায়—রুশদের কাছে যে যাবে, সে সাহস তার হলো না। সে জানতো প্রতিরোধ-সংগ্রাম শেষ হয়ে গেছে, সবাই এখন আত্মসমর্পণ করছে। কিন্তু কোনো রুশের কাছে গিয়ে সে যে বলবে—'সব শেষ' সেইখানেই ওর ভয়......তার পলটনের লোকদের সে কাল হারিয়ে ফেলেছে, লালফৌজ যখন তাদের ট্রেঞ্চে এসে হানা দিল তখনই সে দলছাড়া হয়ে পড়ে। ষ্টেলব্রাখ্ট তখন টমি গান চালাচ্ছিল, সিমিড্ মাথায় বুলেট লেগে পড়ে গেল। কেলার কোন রকমে পালিয়ে একটা বাড়ির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে লুকিয়ে রইলো। চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরে সে কিছু খায়নি। সে একমুঠো তুষার তুলে নিলে, পাথরের মতো শক্ত তুষার আর তাই সে চুষতে লাগলো। ভয়ানক দাঁতে যন্ত্রণা হচ্ছে। সে মনে মনে রুশদের কিভাবে সম্বোধন করবে ভাবলে; সে বলবে, আমি কাউকে হত্যা করিনি, বা আমি নাৎসী নই। লড়াই করতে আমি বাধ্য হয়েছি; অথবা আমি একজন বিজ্ঞানী, নৃতত্ত্ববিদ্। কিন্তু এর কোনটাই তার কাছে যুতসই বলে মনে হোলো না। হঠাৎ তার মনে হোলো, মোগিলেভে সে একটি বুড়িকে ধরেছিল, বুড়ি বাড়ির চিলে কোঠায় ছিল লুকিয়ে। সে দেখলে বুড়ি এক ইহুদিনী। সে তাকে হত্যা করেনি, শুধু রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে গিছলো। হ্বারগেউ তাকে খুন করে ..যদি সে বলে, কাউকে আমি খুন করিনি, অমনি রুশরা জিজ্ঞেস করবে: তুমি মোগিলেভে ছিলে না? বাজে কথা! কে জানবে সে-কথা? মোগিলেভ এখনো আমাদের হাতে।...কিন্তু তবুও ভয় সে পেল...তারা তাকে জেরা করবে, তারা খোঁজ নিয়ে জানবে, সে ছিল উপরওয়ালাদের পেয়ারের মানুষ, সে নন্‌কমব্যাটাণ্ট: তারা তো একথা বিশ্বাস করবে না যে, ক্লিশ তার বইয়ের ভুল ধরেছে......ভগবান, কার কি ক্ষতি সে করেছে? সে কেন খোঁয়াড়ে বন্ধ একটা কুকুরের মতো মরবে? যে যুগে আমরা বাস করছি, সেই যুগকে কি

সে দোষ দেবে? উনিশ শতক হলে সে হোত একজন খ্যাতিমান বিজ্ঞানী... কিন্তু তাকে সৈন্যদলে জোর করে ভর্তি করা হোলো। ভার্সাইয়ের আদেশের জন্য তারা যুদ্ধ করতে বাধ্য হলো, তারপরে মার্কস্‌বাদীরা মিতালি পাতালে ধনবাদীদের সংগে। কিন্তু একথা সে যদি রুশদের বলতে যায় তারা তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে....... উঃ কি শীত! ...আমি শীতে এখনি জমে মারা যাব......কিন্তু মরতেও তো আমি চাই না। ....তার চোখ টাটাচ্ছে, পা অবশ, আঙুলগুলো এমন শিটিয়ে গেছে যে প্যাণ্টের বোতাম খুলতে পারছে না..... এ এক অভূতপূর্ব পরিণতি—আমাদের ফৌজ আছে লেলিনগ্রাদে আর আফ্রিকায়, কিন্তু তারা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। হয়তো তারা আবার ফিরে আসবে—কিন্তু তখন দেরী হয়ে যাবে। সে উঠে দাঁড়ালো, এবার একটা দেওয়ালের ফাটলের ভিতর দিয়ে নেমে এল পথে। কামানের গোলার গর্তের ভিতরে সে আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়ে আবার উঠে এল। একটা মৃতদেহ মাড়িয়ে, সে কি করছে না ভেবে খাতের দরজা ঠেলে খুলে ফেললে। বেশ ঠাণ্ডা লাগছে, তাপ খেলে যাচ্ছে সারা দেহে। সে বলতে চাইছে, সে কাউকে খুন করেনি, আর সে জমে যাচ্ছে। কিন্তু আগে যে সব অজুহাত সে ভেবে রেখেছিল তার মগজ থেকে তা উবে গেল। সে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে, কি যেন তার গলা চেপে ধরেছে। একটি খুদে মেয়ে একটা টেবিলের ধারে বসে একটা ছোট কেরোসিনের বাতির আলোয় একখানা বই পড়ছিল ; কেলারকে দেখতে পেয়ে সে চীৎকার করে উঠে তার দিকে ধেয়ে এল। সে তাকে ধাক্কা মারছে, কেলার দিচ্ছে বাধা। মেয়েটার তার চেয়ে শক্তি বেশী, তাই সে তাকে ঠেলে ফেলে দিলে বাইরে তুষারের ভিতরে, তারপর দরজা বন্ধ করে দিলে।

কেলার ওঠবার কোন চেষ্টায়ই করলে না : সে বুঝতে পারলো মৃত্যু তার আসন্ন। ভাবনা তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। ঠোঁট নড়ছে—যে মেয়েটা তাকে তুষারের ভিতরে ফেলে দিল তাকে গালাগাল দিচ্ছে, আর দিচ্ছে রুশদের,

ষ্টেলব্রাথ্‌টকে, আর নাৎসীদের। যদি সে একবার উঠতে পারত, তার সমস্ত শক্তি পারত জড়ো করতে, তাহলে এক ফোঁটা ঐ মেয়েটাকে ফাঁসি ঝোলাতো...... এমনি করে ঝাঁকুনি দিত .....কেন ওরা আমাকে রাশিয়ায় পাঠালো?... একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী মারা যাচ্ছেন......অসংলগ্ন ছবি তার মনে ভিড় করে এল। সে মিমিকে দেখছে, হাইডেলবার্গে এসেছে মিমি, কেন যেন সে কাফি গুঁড়ো করছে, রুডি একটা খেলনা বন্দুক নিয়ে তাগ্‌ করছে তার দিকে। বেচারী রুডি, সে তো অনাথ হবে....এই সবের জন্য দায়ী কে? ফ্যুরার চেঁচাচ্ছেন, ওঠ, ওঠ! না, না, ফ্যুরার তো নয়, এযে প্রধান লেফটেনাণ্ট ক্রাউস। কেলার চেষ্টা করলে তার অবশ পা নাড়তে, বার বার চেষ্টা চললো......কিন্তু ক্রাউস তো মারা গেছেন......কেলার তুষারের ভিতরে হাতড়ে-হাতড়ে চললো, তার মনে হোল গার্ডা তার পাশে শুয়ে আছে—তেমনি হৃষ্টপুষ্ট, উষ্ণ গার্ডা; সে ফিসফিসিয়ে বলছে ঃ দুষ্ট ছেলে, মিমির সঙ্গে কি করেছ? ঐ যে কারকভের লালচুওয়ালী মেয়েটা—ওর সংগে কি ছিল তোমার? ...ঐ মোটা সোটা কুত্তিটা ভারি হিংসুটে। ওকে কি গাল দেব নাকি! কিন্তু ওযে আমাকে ছেড়ে যাবে, ওর সহবাস যে আরামের, ভারি উষ্ণ মনে হবে এখানে... আর শীত তো করছে না। কিন্তু গার্ডা কি চায়? চুমু, জড়িয়ে ধরা? না, না, হবে না! সে বড় ক্লান্ত, সে হাইডেলবার্গ থেকে এতটা পথ হেঁটে এসেছে, এখন শুধু ঘুমুতে চায়, শুধু ঘুমুতে চায়......ওখানে কে চেঁচাচ্ছে......একটা কুকুর? না বাতাস! ঐ অভিশপ্ত রুশগুলো ঘুমুতেও দেবে না! ......কিন্তু আমি ঠিক ঘুমোব......

ভারিয়া জার্মানটাকে দূর করে দিয়ে আবার তার বই নিয়ে বসলো। টুর্গেনিভের একখানা ছোট বই, এই খাতের ভিতরে পাওয়া গেছে। বইয়ের শেষ দিকের ক'খানা পাতা নেই, সে জানবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে নায়ক কি শেষে আসিয়াকে পেল। তার মনে হোল, নায়ক তাকে বিয়ে করলো, আর তারা সুখী হোলো গাগিন তো কিছুই বোঝেনি···রজোভস্কীও একটা

কথা উচ্চারণ করেনি, কিন্তু ভারিয়া না জানলেও বুঝতে পারে..... হঠাৎ কেমন অস্বস্তি করিয়ে এল ; সে তার ভেড়ার চামড়ার জামাটি চাপিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। উজ্জ্বল তুষারময় রাত। খাতের কাছে একটি মৃত জার্মান সৈনিক পড়ে আছে, তাকে দেখেই সে চিনলো : যাকে সে ধাক্কা মেরে বাইরে ফেলে দিয়েছিল.....তুষারে জমে গেছে। গোল্লায় যাক !......কিন্তু আমি কেন ওকে বাইরে ঠেলে ফেলে দিলাম ?......সে আবার ভিতরে এসে তার খাটে শুয়ে কাঁদতে লাগলো। স্তালিনগ্রাদে এসে সে আর আগে কাঁদেনি, তার বাবা মা আর সাত বছরের খুদে পেতিয়ার মৃত্যুর কথা শুনেও না। তার মাসী চিঠিতে লিখেছিল সব কথা। পেতিয়া মারা গেছে পেটের অসুখে—সে উপোস করে ছিল—তারপর হয়তো এমন কিছু কুড়িয়ে পেয়ে খায়, যাতে অবস্থা দাঁড়াল খারাপ। বাবা মারা গেছেন ফেব্রুয়ারী মাসে, মার বাবাকে কবর দেওয়ার শক্তিও ছিল না। প্রতিবেশীরাও তখন চলে গেছে। তাঁর বাবা তাই বাড়িতে চারদিন ধরে মরে পড়েছিলেন। যখন মাসী এলেন, তার মা তখন উঠে দাঁড়াতেই পারেন না।

ভারিয়া প্রিয়জনের মৃত্যুতে কেঁদেছে। লেফটেনাণ্ট রজোভাস্কী হত হলেন নভেম্বরে। তার তখন কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। কাউকে চিঠি লেখারও নেই। রজোভাস্কীর মৃত্যু বা নিজের এই ভীষণ নিঃসঙ্গতার কথা কাউকে লেখা হোলো না।

একটা ফ্রিৎস ঢুকে পড়লে, আমি তাকে ঠেলে দিলাম বাইরে। সে শীতে জমে মরে গেছে, বাইরে পড়ে আছে, তাকে নিশ্চয়ই দেখেছ......

তাতে কি হয়েছে ! ওর জন্যে নিশ্চয়ই তোমার দুঃখ হয় নি।

ওর জন্যে ? না। ওর মুখখানা কি ভয়ানক, ঠিক ওরা প্রাচীরপত্রে যেমন আঁকে......নিজের জন্যই আমার দুঃখ.......এই পাজিগুলো আমার কি ক্ষতিই না করেছে ! ......কিন্তু ওকে ভিতরে আসতে দিলাম না কেন ? ...আমি যে ওদের ঘৃণা করি। ওরা শুধু হত্যাই করেনি, আরো সব জঘন্য কাজ

করেছে•••তুমি ভাবলে কি করে, আমি ওর জন্যে দুঃখ পাব? ওর জন্যে আমার কোনো অনুভূতিই নেই—কিছু নেই—আর সেইটেই তো সব চেয়ে ভয়ানক কথা······

মারুসা তাকে ঠাট্টা করবে, সে তাই ভেবেছিল। মারুসা হাসিখুশি মেয়ে। তার কোনো প্রিয়জনকে সে হারায়নি। একজন গোলন্দাজের সংগে তার প্রেম, তাদের দেখে সুখী বলেই মনে হয়। সে দেখতে সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, কখনো কোন কিছু নিয়ে অভিযোগও করেনা। ও হাসুক না, আমার কাছে সবই সমান···কিন্তু মারুসা হাসলো না, সে ভারিয়ার পাশে বসে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে। কেন যে কাঁদলে সে নিজেই জানে না—হয়তো ভারিয়া কাঁদছে বলে।

ভারিয়া বললে, নাও, যথেষ্ট হয়েছে...এখনি কেউ এসে পড়তে পারে... সবচেয়ে বড়কথা হচ্ছে, এখানে সব শেষ হয়ে গেছে...এখন যত তাড়াতাড়ি হয় বার্লিনের পথে ছুটতে হবে....

পঁচিশ

জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি মারিয়া মিখাইলোভনা মিনায়েভা তাঁর ছেলের শেষ চিঠি পেয়েছিলেন। সে তার মাকে পাঠিয়েছিল নতুন বছরের সম্ভাষণ, বলেছিল—এবছর সত্যই নতুন হয়ে দেখা দেবে। তার জন্যে ভাবতেও সে বারণ করেছিল, কারণ সে আছে পিছনে, আর সব কিছুই এখন ভালোর দিকে যাচ্ছে। তার সাথীরা যদি মিনায়েভের মার কাছে লেখা চিঠি পড়তো, তারা হয়তো অবাক হয়েই যেত—তারা কখনো ভাবতেও পারেনি যে একজন পুরোপুরি ভাঁড় আবার এত কোমল, স্নেহ-

প্রবণও হতে পারে। কিন্তু মারিয়া মিখাইলোভ্না অবাক হননি, তিনি মিতেঙ্কার মন জানেন। কিন্তু তার চিঠির একটা শব্দও তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি—

ও যদি মরমরও হয় তাহলেও আমার কাছে লিখবে—যেন গ্রামাঞ্চলে আছি এমনি শান্তিতে কাটাচ্ছি সত্যই, এই কথা সে লিখেছিল যখন তারা জার্মানদের আক্রমণ থেকে টিলাটা রক্ষা করছিল।

মারিয়া মিখাইলোভ্না তাঁর সমস্ত জীবন ছেলের জন্য উৎসর্গ করেছেন। তিনি বিয়ে করেছিলেন বেশি বয়সে ; তার স্বামী ছিলেন দরজির দোকানের পোষাকের ছাঁটিয়ে, আর ভালো রোজগারও তিনি করতেন। যখন তাদের একটি মেয়ে হোল, তারা খুশিই হলেন, তাকে নিয়ে আদরের আর সীমা রইল না, কিন্তু নাস্তেঙ্কা স্কার্লেট ফিভার হয়ে মারা গেল। শিশুর যাতে কোনো অনিষ্ট না হয়, তিনি সেই ভেবে নড়তেন চড়তেন না...মিতিয়া হোল উনিশ শো আঠারো সালে, তখন সময়টা ছিল খারাপ, বড় গোলমাল চারদিকে। মারিয়া মিখাইলোভ্না সব সময়েই ভয়ে ভয়ে থাকতেন, কি জানি কখন তার ঠাণ্ডা লাগে, আর সংক্রামক রোগ দেখা দেয়। মিতিয়ার যখন আট বছর বয়স তখন মারিয়ার স্বামী মারা গেলেন, তিনি দর্জিদের এক সমবায় প্রতিষ্ঠানে গেলেন চাকরি করতে। ছেলেকে তিনি লালন-পালন করে পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে দিলেন। যখন মিতেঙ্কা তাঁকে বলত অধ্যাপক নিকোভিমভ আমার কাজ সম্বন্ধে বেশ ভাল মন্তব্য করেছেন, তিনি বুঝতে পারতেন জীবন তাঁর নিষ্ফল হয় নি।

এবার যুদ্ধ বাধলো। ছয়ই জুলাই মিতেঙ্কা চলে গেল। তাঁর ছোট্ট কামরাখানায় বসে মারিয়া মিখাইলোভ্না কি চোখের জলই না ফেললেন ...তিনি জানতেন, তাঁর অভিযোগ করবার অধিকার নেই—সবার পক্ষেই তো সময়টা মন্দ ; অন্যের সামনে তিনি শান্ত হয়েই থাকতেন, আর ছেলেকে লিখতেন খুশি-করা চিঠি। তিনি তখন কাজ চাইছেন, সেনাদলকে

সাহায্য করবেন ভাবছেন, কিন্তু তাঁর বয়েসের দরুণ বেশি কিছু করা সম্ভব হোল না। তবুও তিনি তাঁর কাজ খুঁজে পেলেন। তিনি বাড়ীতে বসে কাজ করতেন, সৈনিকদের সার্ট সেলাই করে দিতেন। তিনি তখন মিতেঙ্কার কাছে কৃতজ্ঞ—ঠিক যুদ্ধের আগে সে তাঁকে চোখের হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করেছিল আর নিয়েও গিছলো—সেখানে এক জোড়া ভাল চশমা তার চোখ পরীক্ষা করে দেওয়া হয়। এখন তিনি কেরোসিন বাতির নিস্তেজ আলোয় বসে রাতেও কাজ করতে পারেন। তাঁর মনে হয় তিনি মিতেঙ্কাকে সাহায্য করছেন, এইভাবেই সান্ত্বনা পান। একদিন বাড়ীর তত্ত্বাবধায়ক তাঁকে 'অন্নজীবী' বলেছিল, তিনি তাতে ক্ষুণ্ণই হন। তিনি পালটা উত্তরে বলেন, আমি বাড়ীতে বসে কাজ করি, এখন সেনাবাহিনীর কাজ করছি। তার একটা সেলাইয়ের কল আছে, এতো পুরানো সেটা যে মিতিয়া তাকে বলত, যাত্নঘরের জিনিষ। মারিয়া মিখাইলোভ্না হাসতেন: হাঁ, পুরানো বটে, কিন্তু এখনো কাজ চলছে; ঠিক আমার মতো আর কি.......

মারিয়া মিখাইলোভনা থাকেন বহুলোকের সঙ্গে, সাম্প্রদায়িক আবাসে সেটা এক-একবার বর্ষার পরে মিতিয়ার ভাষায় ঠিক যেন নোয়ার নৌকা হয়ে দাঁড়ায় (ছাদ দিয়ে প্রতি বসন্তে জল ঝরে)। আবাস ভবনে বড় ঠাসাঠাসি, বড় ভিড়—ঠিক যেন গাদাগাদি ট্রেনের কামরা—তবে এ ট্রেনে দিনে দিনে ভ্রমণ চলে, ভ্রমণ চলে বছরে বছরে। মিনায়েভদের কামরার পাশেই থাকে পারসিনরা, এখন ঘর তালাবন্ধ—স্বামী যুদ্ধে চলে গেছেন, স্ত্রী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে গেছেন বারনাউলে বসবাস করতে। উলটো দিকে থাকেন কাজমানরা—বাবা, মা আর তাদের দুষ্ট ছেলে গ্রীসা। উনিশ শো একচল্লিশ সালে গ্রীসা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরোয়; সে-বছর হেমন্তে সেনাবাহিনীতে তার ডাক পড়লো, আর এপ্রিলে সে ব্রাভানস্ক রণাঙ্গনে মারাও গেল। কাজমান এখন একা, তাঁর স্ত্রী

চলে গেছেন একটা স্কুলে কাজ নিয়ে। তিনি এক খবরের কাগজে প্রুফ-রীডারি করেন। তিনি মারিয়া মিখাইলোভ্নার থেকে দশ বছরের ছোট কিন্তু বড়োই তাকে দেখায়। যখন ছেলের মৃত্যু সংবাদ তার কাছে এল, তিনি তার পড়শী বা ছাপাখানার সহকর্মীদের কাউকে কিছু বললেন না। তিগি কাজে চলে গেলেন, আর একটা ছাপার ভুল তার চোখ এড়িয়ে গেল। সরকারী সম্পাদকরা তাকে এই ভুলের জন্য ভৎর্সনা করলেন, কিন্তু কাজমান তাদের কাছেও এই ভুলের কারণ বললেন না। কয়েক সপ্তাহ পরে মারিয়া মিখাইলোভ্না যখন জিজ্ঞেস করলেন, তিনি গ্রীসার খবর কিছু পেয়েছেন কিনা, তিনি ঝুঁকে পড়ে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বললেন, গ্রীসা মারা গেছে...কাজমানদের পাশের কামরায় থাকেন কোবালিয়ভরা....উনিশ শো চল্লিশ সালে যারা শহর ছেড়ে গিয়েছিল, ওরাও তাদের সঙ্গে যান, কিন্তু পরের গ্রীষ্মেই আবার ফিরে আসেন! ইরিনা পেত্রভ্না ষ্টেট ব্যাঙ্কে কাজ করেন, তার মেয়ে নাতাশা এখনো স্কুলে পড়ে, ছেলে ভাসিয়া আছে নৌবাহিনীতে। ইরিনা পেত্রভ্না বলেন, তার ছেলে একটা জার্মান মালবাহী নৌবহর ডুবিয়ে দিয়ে খেতাব পেয়েছে। যখনই কেউ 'নৌবাহিনীর' কথা বলে, তিনি কানখাড়া করে থাকেন। একবারে শেষের ঘরে থাকে একটি যুবতী, সুরোচ্কা ভলকোভা, সে বলবেয়ারিঙ্ কারখানায় কাজ করে। সুরা যুদ্ধের ঠিক আগে বিয়ে করে। তার স্বামী এখন ট্যাঙ্ক-বাহিনীতে। একদিন সে ভয়ে আর বিস্ময়ে বিভোর হয়ে বলছিল, ও এখন চতুর্থ ট্যাঙ্ক-বাহিনীতে আছে। ট্যাঙ্ক-বাহিনী আর প্রতিরোধ করতে পারছেনা কিন্তু ও এখনো বেঁচে আছে। এই যে সেদিন যুদ্ধটা হোলো তাতে সামান্য আঘাত পেয়েছে......

যুদ্ধের অগে এই বাড়ীতে খুব ঝগড়াঝাটি হোত। পারসিন্‌রা জোর অভিযোগ জানাত যে, সুরোচ্কা সারা বাড়ি নোংরা করে রাখে। ইরিনা পেত্রভনা বিরক্ত হয়ে যেতেন, কাজমান ঠিক ভোরের আগে ছাপাখানা

থেকে ফেরেন বলে। তাঁর আবার পাতলা ঘুম কিনা। পারাসনের স্ত্রী বলতেন, কাজমানের জানা উচিত যে তার ছেলেটা একটা আস্ত সয়তান। কিন্তু এখন আর কেউ ঝগড়া করে না, তাদের সকলেরই স্নায়ুতে চোট লেগেছে, জীবনও এখন কঠোর—ঘরগুলিতে তাপের অভাব, বাজারেও কিছু কিনতে পাওয়া যায়না, তবু ঝগড়া তারা করে না। সকলেরই জীবন এখন বারান্দার রেডিওর সঙ্গে একতারে বাঁধা। যখন ঘোষণাকারী বলেন, সোভিয়েৎ সংবাদ বিভাগ থেকে বলছি, এই বাড়ির সব স্বর তখনি থেমে যায়। কারো একখানা চিঠি এলে সবাই খুশি হয়, কাজমানের আশা বলে কিছু নেই, তবুও কাল সুরার স্বামীর চিঠি এসেছে শুনে যেন জীবন ফিরে পেলেন, মিতিয়া ভাল আছে, লেভালিউভার ছেলে আর একটি সামরিক খেতাব পেয়েছে শুনলেও তিনি খুশি হয়ে ওঠেন। নিজেদের ঘরের অবরোধের আড়ালে বসে তারা কাঁদেন, দুঃখ করেন, দুঃসহ বেদনা ভোগ করেন, কিন্তু যখন দেখা হয় তাঁরা একে অপরের কাছে আশার কথা বলেন, সান্ত্বনা দেন।

কাজমান তিন রাত কাজে যান 'ন ; ডাক্তার বলেছেন, তার প্রচণ্ড ব্রঙ্কাইটিস হয়েছে। তিনি কাসছেন জোরে, আর দেওয়ালগুলো ভারি পাতলা। আগে হলে ঘুম ভাঙাচ্ছে বলে মনে মনে গালাগালি দিত সবাই......কিন্তু এখন তার শুকনো কাসির শব্দ শুনে, সবার মনে পড়লো তিনি দুষ্ট গ্রীসাকে অন্য ছেলের সঙ্গে মারামারি আর পাঠ্য বই হারাবার জন্য কি গালটাই না দিতেন••• মারিয়া মিখাইলোভ্না তার খাবারের আলমারী থেকে একটা চিনি-ভর্তি বোয়েম বার করলেন, তাতে ছোট ছোট চিনির টুকরো রয়েছে ..তারপর একটা পেয়ালায় অনেকটা চিনি ঢেলে তাতে চা তৈরী করে কাজমানের কাছে নিয়ে গেলেন,

ডেভিড গ্রিগরিয়োভচ, এটুকু খেয়ে ফেল। মিষ্টি আছে, এখুনি কাসিটা কমবে......

তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন, হঠাৎ মাঝ রাতে রেডিওটার ভাঙা স্বর শোনা গেল। তিনি জামা পরে দৌড়ে এলেন বারান্দায়। সব পড়শীরাই এসেছে, এমন কি অসুস্থ কাজমানও উঠে এসেছেন।

এই শেষ খবর···জার্মান—ফ্যাসিষ্ট বাহিনীর ধ্বংস সম্পূর্ণ...স্তালিনগ্রাদের ঐতিহাসিক যুদ্ধে আমাদের সম্পূর্ণ জয়লাভ হয়েছে......

মারিয়া মিখাইলোভ্‌না কান পেতে ভাল করে শুনলেন, একটা শব্দও পাছে এড়িয়ে যান এই তাঁর ভয়। তিনি টের পেলেন না যে তার চোখ দিয়ে জল ঝরছে···ঈশ্বর, একি সত্য? জয়লাভ!....তারপর তিনি কাজমানের কাছে গিয়ে বললেন, ডেভিড গ্রিগরিয়োভিচ, আমি তোমাকে চুমু খেতে চাই, দেবে কি? এমন মুহূর্তে কি 'আর···সুরোচকা ছোট্ট মেয়ের মতো হাততালি দিয়ে বলতে লাগলো ঃ

চব্বিশজন জেনারেল—তাহলে দু'ডজন হোল!

আনন্দের ধ্বনি উঠলো বাড়ির অন্যান্য ঘর থেকে। কে যেন হর্ষধ্বনি করে উঠলো। নাতাশা কোবালিওভা ছুটে পথে গিয়ে দেখে আবার ফিরে এলেন। মুখখানা তার ঝলমল করছে।

পথে ভিড় জমেছে! সবাই সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছে, চুমু খাচ্ছে...

মারিয়া মিখাইলোভ্‌না মনে মনে ভাবলেন, এ যেন ঈশ্বরের উৎসব...

ভোর হতেই তিনি সেলাইয়ের কল নিয়ে বসলেন। নাতাশা কোভালিয়ভা এলেন।

মারিয়া মিখাইলোভ্‌না, তুমি আজকের দিনেও জিরোবে না?

মারিয়া মাথা নাড়লেন।

ওরা কি ওখানে জিরোচ্ছে। মিভেঙ্কা হয়তো অনেক দূরে আছে....যখন সব চুকে-বুকে যাবে তখন জিরোব।

আর তো শীগ্‌গিরই সব চুকে-বুকে যাবে।

বলতে সোজা, কিন্তু করা তো মুস্কিল। এখনো যে ওদের অনেকটা

যেতে হবে—বার্লিনে যাবে ওরা (বার্লিন বলবার সময় মারিয়া মিখাইলোভ্না সব সময়ে 'বা'র উপর জোর দেন, তার ছেলে একবার ভুলটা শোধরাতে চেয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, আমি কি করবো, কথাটা যে অমনি ভাবেই আমার মুখে আসে।)

তিনি ছেলেকে চিঠি লিখলেন : মিতেঙ্কা, কাল আমি 'শেষ খবর' শুনেছি। ঐ খুনেগুলো যে আত্মসমর্পণ করেছে, এতে আমি খুব খুশি। কিন্তু ওরা যে এত নিরপরাধ মানুষ মেরেছে, তার জন্যে ওদের আমি ক্ষমা করতে পারব না। ডেভিড গ্রিগরিয়োভিচ এই সংবাদ শুনে কেঁদেছে। ওর গ্রীসাকে তো কেউ ফিরিয়ে এনে দেবে না। বল, তুমি আমাকে বল, এই যে আমরা বুড়োরা চোখের জল ফেলছি, কালে ঐ পাজিগুলো তার জবাবদিহি করবে তো?

ছাব্বিশ

গত দু'বছর ধরে পল অনেক কিছু দেখেছে। সে লিমোজেস্, ব্রিভ আর তুলোয় ছিল। প্রথমে সে কাজ করতো ঝোরে-দলে, তাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল না, তাই তারা ইশ্‌তেহার ছাপাত ; তারা একবার একটা ময়দার কলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু দলের একজন সভ্যের স্ত্রী বিশ্বাসঘাতকতা করলো। সে তখন ঈর্ষায় পাগল। পল কোনোরকমে পালাল। তারপরে সে এল গ্যাব্রিয়েল পেরির দলে ; সে একবার রেলের সংযোগগুলি উপড়ে ফেলতে লাগলো, মাইন পাতলো, ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো গলিতে ; সে হেসে তখন বলতো : যখন লড়াই শেষ হবে, আমি হব রেলের মিস্ত্রী। এখন সে একটা নতুন দল গড়বার ভার পেয়েছে। সে কেন্দ্র থেকে একজন লোক আসবার অপেক্ষায় আছে, তার কাছে সব বিবরণ দাখিল করতে হবে, আবার তার কাছ থেকে নির্দেশগুলোও জানবে।

লেজঁা এখন তার ছেলেকে হয়তো চিনতে পারবে না—যুদ্ধের আগে পল ছিল লাজুক ছেলে, কিছুটা বা সেই জন্যেই রূঢ়ভাষী। সে এমন স্বরে কথা কইত—কিছুটা বা তাতে ছিল গাম্ভীর্য আর চীৎকারের মিশেল ; আবার সাইকেল দৌড়েও তার তখন ঝোঁক, ঝোঁক ছিল স্পেন দেশ আর কবিতায়। সে বলতো সাম্রাজ্যবাদীদের অপকৌশলের কথা, সে ছেলেবেলার বইগুলো এখনো দূর করে দিতে পারেনি—এখনো সে ডাক-টিকিট সংগ্রহ করে, কলমকাটা ছুরি কেনে, তাঁবুর জীবনের স্বপ্ন দেখে ; সুন্দরী মেয়ে দেখলে গাল তার লাল হয়ে ওঠে ; কিন্তু সঙ্গীদের হলফ্ করে বলে, শুধু মূর্খেরাই মেয়েদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়। তার বাবা আর জোসেৎ দুজনেই তাকে ছেলেমানুষ ভাবতেন। কিন্তু যখন সর্বনাশ ঘনিয়ে এল, পলের তখন কলেজের শেষ বছর। সে গেল এক খামারে কাজ করতে, গরু সে চরাত। তারপরে এক বন্ধু কাজ জুটিয়ে দিলে লিমোজেন-এ ; দিনের বেলা এক হাতুড়ের স্ত্রীকে ওষুধ তৈরীর ব্যাপারে সাহায্য করতো, আর রাতে বিলাত ইশ্তাহার।

তাড়াতাড়ি সে বেড়ে উঠতে লাগলো, তার রুচি, তার চরিত্র বিশেষ এক ছাঁচে গড়ে উঠলো। বাপের মতো কঠোর সে নয়—তার যৌবনেও লেজঁা তার একগুয়েমিতে লোককে অবাক করে দিত। পল কিন্তু নম্র, বড় ভাব-প্রবণ, অথচ সেটা সে বিদ্রূপ দিয়ে ঢেকে রাখে, তার বন্ধুরা তাকে ডাকে 'কবি' বলে, যদিও সে কখনো কবিতা লেখেনি, শুধু মাঝে মাঝে আবৃত্তি করেছে মাত্র। এই ভয়ংকর সময়েও যখন সে পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে যাচ্ছে, তখনো ম্লান নীল আকাশের পটভূমিতে একটা গাছ দেখে তারিফ করতে পেরেছে, অথবা তারিফ করেছে ঘুমন্ত ছোট্ট একটা নদীকে যার জলে ফুটে আছে হলদে লিলির দল। নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে না পেরে টুকরো টাকরা কবিতা আবৃত্তি করেছে। সে বন্ধু বান্ধবকে বলেনি যে একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছে। সেই মেয়েটি কবি বা প্রতিরোধ-যোদ্ধার চেয়ে একজন নৃত্যশিল্পীকে বেশি পছন্দ করে। যখন মেয়েটির জন্য তার কামনা উগ্র

হয়ে ওঠে, তখন গুনগুন করে সে আবৃত্তি করে :

পথের পাশে পাশে
গোলাপ দল
তুচ্ছ করলে মৃত্যুর দমকা হাওয়া···

গ্রামোঁ জিজ্ঞেস করেছিল, কি বাজে কবিতা বলছ ?

আরাগঁর কবিতা। তিনি কমিউনিষ্ট, আর তিনি কবিতাও লেখেন। অবশ্য এতে অবাক হবার কিছু নেই।

গ্রামোঁ বললে, আমি নভেল ভালবাসি ; কি সময়ে বাস করছি তা দেখতে হবে......

শান্ত সন্ধ্যায় নরম আরাম কেদারায় নভেল ভাল লাগে, কিন্তু কবিতা বোমার সঙ্গে সঙ্গেও চলে।

তুমি নিজে কবিতা লেখ না কেন ?

হয়তো বোমার সঙ্গে কবিতার মিল নেই বলে। আমি তোমার মতোই জার্মানদের রেলগাড়ি ওড়াতে ব্যস্ত।

ক্যালো কেন্দ্রের কমরেড। ধাতুর কাজ করে, পঞ্চাশ বছর প্রায় বয়েস। তিনি পলের পা থেকে মাথা পর্যন্ত বারবার অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে দেখে নিলেন।

তুমি কাজটা করছ তো ? এসব কাজের পক্ষে তুমি তো বড় ছেলেমানুষ। কত বয়েস তোমার ?

হাঁ, আমার উপরেই ভার পড়েছে, যদিও আমি পেঁতার চেয়ে ছোট—পল হাসলো।

তার মনে হোলো, তার যে একমাস আগে বিশ বছর পুরেছে, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

নভেম্বর থেকে তারা যা করেছে তার পুংখানুপুংখ বিবরণ সে পেশ করলো, লা-বাত-এর কাছে তারা একটা ট্রেনকে লাইন থেকে ছিটকে ফেলে, দুটো ইঞ্জিন ধ্বংস করে, সেনাবাহিনীর একটা জুতোর কারখানায় তারা আগুন

ধরিয়ে দেয়, সমস্ত অন্তরালের সংঘটনের জন্য খাদ্য বরাদ্দের কার্ড চুরি করে, দুজন জার্মান অফিসার, আর একজন ফরাসী পুলিশকে হত্যা করে। বিশ্বাসঘাতক দ্যুমাকেও তারা ফাঁসি লটকেছে।

শুরুতে কাজ মন্দ হয়নি। জার্মানরা বলছে, এসব সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থেকে হচ্ছে। তাই ভবিষ্যতে আমাদের কাজ যে জনগণেরই কাজ তা বুঝিয়ে দিতে হবে। তোমার পরিকল্পনা কি?

কাফে রয়াল। জার্মান অফিসাররা সেখানে এসে জড়ো হয়।

মন্দ নয়। কিন্তু যান-বাহনের কথাটা ভুলে যেও না। এখন এইটেই দরকারী।

ক্যালো পরিস্থিতি বুঝিয়ে বললেন। শ্রমিক-সংগ্রাহক আইন এক সপ্তাহ আগে জারি হয়েছে, এতে প্রতিরোধ-যোদ্ধাদের দল ভারি হয়ে উঠবে। একমাস কি দুমাস যেতে না যেতে মাকিদের নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব হবে। এখন ছোট ছোট দু-চারটি মাকির দল পাহাড়ে আছে, বসন্তে এই আন্দোলন জোড়দার হয়ে উঠবে•••...

তোমার দলের নাম কি—মার্সেঈ?

না, মার্সেঈ দলে আছে দ্যাফে। রেশন কার্ড নিয়েই আমাদের কারবার।

তাহলে তোমার দলের নাম কি?

স্তালিনগ্রাদ।

ও নাম যখন নিয়েছ, তার মানে বহু কাজ করতে হবে।

ট্রেনে বসে ক্যালোর মনে পড়লো পলের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা। তিনি মনে মনে ভাবলেন, হাঁ, ভাল ছেলে। ক্যালো তার সারা জীবন কাটিয়েছেন পার্টির কাজে। তিনি জানেন না তার স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে এখন কোথায়, তাঁদের কথা তিনি ভাবতেও চান না। পল তাকে মনে করিয়ে দিল তার ছেলের কথাঃ আমার ছেলের বয়েস আঠারো, হয়তো সেও লড়বে...সবাই বলছে, তোমরা একটু সবুর কর। ...কিন্তু কি করে সবুর করব? এইসব ছেলেদের জার্মান-

দের হাতে সঁপে দেব ?.. যদি সব কিছু তোমরা বাঁচাতে যাও, তাহলে জেনে রাখ সবই হারাতে হবে। রুশরা স্তালিনগ্রাদকে উৎসর্গ করতে দ্বিধা করেনি, তাইত তারা যুদ্ধে জিতলো, এমন কি মহাযুদ্ধেও জিত হোলো তাদের....হাঁ ছেলেটি ভালো......

পল হাসতে হাসতে গ্রামোঁকে বললে,

উনি কাফে রয়ালের ব্যাপারটায় মত দিয়েছেন, তবে যান-বাহনের দিকটা আমাদের অবহেলা করা উচিত হবেনা। আর মাস খানেক—মাস দুয়েকের ভিতরে আমরা মাকিদের সাহায্য পাব......

'মাকি' ওর কাছে তাক-লাগানো কথা ; কথাটার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে আসে ...গাছপালা আর বুনো গোলাপের গন্ধ, দক্ষিণ অঞ্চল এসে দেখা দেয়। যুদ্ধের আগে শেষ দস্যুটি কর্সিকার মাকিতে লুকিয়ে ছিল, সেই ঘন কাঁটা-ভরা জঙ্গলে মিলেছিল তাদের আশ্রয় আর আসল দস্যু যারা—তারা বসেছিল তাদের আফিস ঘরে, কেউ তখন মাকিদের কথা ভাবেনি। এখন আবার কথাটার চল হয়েছে। এখন ফ্রান্সের বুকে দেখা দিয়েছে মাকি.......

দেখো, মাকিরা অমন হাজার হাজার লোককে দলে টেনে নেবে। কেউ জার্মানীতে যেতে চায়না। শহরেও আবার লুকিয়ে থাকা শক্ত। আর এটা তো সত্যিকারের যুদ্ধ। মাকিরা......

গ্রামোঁ হেসে উঠলো।

তুমি কি মনে কর, তোমার মতো সবাই ভাব-বিলাসী ? মাকি কথাটার মানে হচ্ছে কাদা, বৃষ্টি, তুষার......

তুমি ভুলে গেছ—ও কথাটার মানে অসাড় পা, উকুন আর...

তার মানে বনে জঙ্গলে শীতে কষ্ট ভোগ।

আর গ্রীষ্মে জয়লাভ......

কাফে রয়াল বড় বাজারের রাস্তায়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সেখানে ভিড় জমে। বিকেল পাঁচটায় কাফেটা জার্মান সেনাবাহিনীর অফিসারে ভরে

যায়। ফরাসীরা এখানে আসে না। পল, গ্রামোঁ আর বিবি কাজের খসড়া তৈরী করেছে, বিবিকে পল ঠাট্টা করে বলে 'দলের প্রধান'। বিবি উনিশ-শো চল্লিশে ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে। তাদের বহুক্ষণ তর্ক হ'য়ে গেছে, কাফের ভিতরে কে হাত-বোমা ছুঁড়বে। পল পেড়াপীড়ি করেছে, তাকে ছুঁড়তে দেওয়া হোক (আমার তাগ হবে নির্ভুল) পরে অবশ্য তারা বিবির ফন্দিটাই মেনে নিয়েছে। বিবি চমৎকার সাইকেল চালায়। তারা ঠিক করেছে বিবি সাইকেল চালিয়ে কাফের পাশ দিয়ে যাবে, যেতে যেতে সে কাঁচ-ঢাকা বারান্দার উপর ছুঁড়ে মারবে হাত-বোমা। গ্রামোঁ আর জোসেফ সেই হট্টগোলের মধ্যে আর একটা করে হাত-বোমা ছুঁড়ে মারবে। তারপর পল আর দলের সাতজন সভ্য পালাবার সুযোগ করে দেবে তার, যদি জার্মানরা আক্রমণকারীদের পিছু নিতে চায় তাহলে গুলীতে ছুঁড়বে। পল হবে এর কর্তা, কার কি কাজ সে ঠিক করে দেবে। সেই মতো কাজও হোলো। বিবিকে সংকেত বলে দেওয়া হোলো—একখানা খবরের কাগজ সে তুলে দেখাবে। গ্রামোঁ আর জোসেফ থাকবে, কাফে রয়ালের উলটো দিকের ছোট্ট কাফেটাতে। পথের কোণে যেখানে ট্রাম থামে, সেখানে থাকবে পল, লুই যোগাযোগ রাখবে।

বিবি কাফের পাশ দিয়ে জোরে সাইকেল চালিয়ে চলে গেল। পল এক কোণে দাঁড়িয়ে পড়ছিল খবরের কাগজ (জোসেফ আর গ্রামোঁর তখনো দেরী হচ্ছে)। বহুক্ষণ এদিক ওদিক ফিরে বিবি আবার ফিরে চললো। দশ মিনিটে পরে সে এল কাফে রয়ালের সুমুখে। পল খবরের কাগজখানা তুলে দেখালো। বিবি ছুঁড়লো বোমা, তারপর—

ছুটলো বোঁ বোঁ করে। মনে হোলো সে যেন হাতলের উপর শুয়ে পড়ে চলছে। সে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ আর বহু গুলীর শব্দ শুনতে পেল। তখন সে কিছুই ভাবতে পারছে না, তার পা-ই তখন শুধু সক্রিয়। সে একটা সাইকেল সারাবার দোকানে এসে যেন চেতনা ফিরে পেল। এখানেই

সে রাত কাটাবে। সে চোখ বোজা অসম্ভব জেনে ভাবনা জাগছে, গ্রামোঁ আর জোসেফের কি হোলো? গুলী কে চালালো? ওরা কি সবাই পালাতে পেরেছে? সাইকেল-সারিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে, সে কিছু জানে না। লুসি ভোরের আগে আসবে না। যখন সে এলো, বিকি চেঁচিয়ে উঠলো!

ওরা সবাই পালাতে পেরেছে তো?

সে মাথা নাড়লো, চোখে তার ভৎর্সনা।

চমৎকার ষড়যন্ত্রকারী তোমরা! হাঁ, সবাই পালিয়ে গেছে। পলের শুধু চোট লেগেছে, কিন্তু সে আগেই জেফকে রিভলভারটা দিয়ে দিয়েছিল। আটটা বর্বর কাফেতে খুন হয়েছে, তিনটে জখম। শার্লেৎ ছুটো জার্মান আর একটা পুলিশকে গুলী করে মেরেছে। যখন গ্রামোঁর পিছনে ওরা তাড়া করছিল, পল একটা জার্মানকে খুন বা জখম করেছে।

পল কোথায়?

হাসপাতালে! তার সঙ্গে কোনো অস্ত্র ছিল না, পাসপোর্ট তার ঠিকই আছে। আরো দুজনকে ধরে নিয়ে গেছে—তারা পথিক....ক্লেয়ার হাসপাতালে গিছলো। সে পরিচয় দিলে, পলের সে প্রেমিকা। প্রধান চিকিৎসক অতি ভদ্র, হয় তিনি সন্দেহ করেননি, নয়তো আমাদের তিনি দরদী......ওরা বলেছে, পল হঠাৎ আঘাত পায়, সে তখন একটা দোকান থেকে বেরুচ্ছিল। ......চোট খুবই লেগেছে, কিন্তু ডাক্তার বলেছেন, আশা আছে।

পলের উপর অস্ত্রোপচার হল সকালে, দুপুরের দিকে সে চেতনা ফিরে পেল। একটা জার্মান তার গাড়ীতে ষ্টার্ট দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় সে তার দিকে গুলী ছুড়লো—হাঁ একথা তার স্পষ্ট মনে আছে..... তার পরের অবস্থা মনে হয়, জেফস. তার কাছে দৌড়ে এসে তার রিভলভারটা নিয়ে নিলে... সে আর সবার সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন : তারা কি পালাতে পেরেছে?

……ক্লেয়ার এল তার কাছে, সে এসে কত বাজে বোকলো, সে নাকি তাকে খুব ভালবাসে, শীগগির শীগগির বিয়ে করে ফেলার কথা বললে। তারপর ঝুঁকে পড়ে ফিসফিসিয়ে বললে, সবাই চলে গেছে। চৌদ্দজন জার্মান আর একজন পুলিশ ঘায়েল। ডাক্তার বড় ভাল লোক, তিনি তোমাকে ধরিয়ে দেবেন না……..

তাহলে ওরা পালিয়েছে!……পল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। তার ক্ষত ব্যথায় ভয়ানক টন্‌টন্ করছে। একটু আগেও তার ব্যথা ছিল না, নার্স তার কম্বলটা ঠিক করে দিয়ে কোমল স্বরে বললে, তোমার পাশের বিছানায় একজন জার্মান আছে। সেও কাল জখম হয়ে এসেছে।…… পল জার্মানটির মুখ দেখতে পেল না, কিন্তু পাশের বিছানা থেকে আসছে নিয়মিত কাতরানির শব্দ। তারপর সে ভুলে গেল জার্মানটির কথা। জাঁনেতের মুখ ভেসে উঠেছে তার চোখের স্মুখে, তার বুকে পিন দিয়ে আঁটা একগোচা ভায়োলেট ফুল, সে গাইছে ভাবাবেগ-ভরা গান—

ঝড়ের মাঝে চাইগো চাই
একটুকু নীল আকাশখানি
চাইগো আমার
প্রেমের ছোট নিলয়খানি……

মা এবার পিয়ানোয় বাজালেন বাখ্; বনে গাছের মাথায় মাথায় সর্ সর্ শব্দ, ওরা মাকি। গ্রীষ্মে হবে আমাদের জয়লাভ। বাবা মাকি দলের অধ্যক্ষ। অদ্ভুত অদ্ভুত—বিছানাখানা ভাসছে নদীর জলে, নৌকোর মতো দুলছে……কত লিলি…আর ওফেলিয়া………জাঁনেৎ যেও না, চলে যেও না!……

ভোর হোলো। বিছানার সার আর রোগী দেখে সে ভয় পেল। তারপর তার মনে পড়লো সে তো হাসপাতালে আছে। নার্স তার বগলে থার্মোমিটার দিলে। ডাক্তার বললেন, সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে

চুপ করে থাকা......হঠাৎ তার মনে হোল সে বাঁচবে। ব্যথা তার অসহ্য তবু মাথাটা পরিষ্কার আছে। এক মুহূর্তের জন্য আফশোষ হোল, বিস্মৃতি দুরাত একদিন ধরে ছিল, এখন তার থেকে সে জেগে উঠেছে—আর স্বপ্ন সে দেখতে পাবে না; সে আপনা মনে ভাবলো, কতদিন এখানে থাকবো কে জানে! গ্রামোঁ কি একা কাজ করতে পারবে? ....

মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ সে দেখতে পেল জার্মানটিকে। চোখে চোখ মিললো। জার্মানটির চোখ নীল, কোমল দৃষ্টি। হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠলো—নিশ্চয়ই ব্যথা চাগিয়ে উঠেছে। নার্স তাড়াতাড়ি ছুটে এলো তার বিছানার কাছে। পলের তন্দ্রা এসেছে। তন্দ্রার ঘোরে সে শুনলে দুজন কারা জার্মানটাকে দেখতে এল। তারা শীগগিরই চলে গেল। পল চোখ মেললো, তার আশা ছিল ক্লেয়ারকে দেখতে পাবে। সে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিল। এবার ওয়ার্ডে কয়েকজন জার্মান এসে ঢুকলো, তারা টেনে হিঁচড়ে পলকে তুলে নিয়ে গেল নীচের তলায়। নার্স চেঁচিয়ে উঠলো:

হা ঈশ্বর, একি করছ!

হাইনৎস ওকে চিনে ফেলেছে......

ডাক্তার জার্মানদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে লাগলেন, একজন রক্ষী রেখে দিন......আগে ও আরাম হয়ে উঠুক।

একজন জার্মান তাকে একপাশে ঠেলে দিয়ে ঠাট্টা করে বলে উঠলো, এবার আমরা ওকে আরাম করে দেব। হাইনৎস্‌কে তোমরা আরাম করে তোল।

পল আবার ডুবে গেল বিস্মৃতির গর্ভে—তার আবছা মনে পড়লো, তাকে টেনে নিয়ে গেল ওরা, একটা ঘরের ভিতরে ঠেলে দিলে, বার করেও নিয়ে এল। খুব রক্ত ঝরছে। হয়তো জেরা করার চেষ্টাও চললো কিন্তু প্রশ্ন তার মনে গিয়ে পৌছলো না......সে শান্ত, শুধু পোকা যেমন গ্রীষ্মের রাতে প্রদীপের পাশে ঘুরে ঘুরে গুন্ গুন্ করে, তেমনি গুন্ গুন্ করছে তার মগজে কবিতার কটা ছত্র......

পথের পাশে পাশে গোলাপের দল
তারা তুচ্ছ করলে মৃত্যুর দমকা হাওয়া……

ঝোপে ঝাড়ে গোলাপের প্রাচুর্য, কুঞ্জে কুঞ্জে ঘিরে আছে, বছরের সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা হয়ে আছে, গোলাপ আছে জ্যানেতের চুলে, গোলাপের ঢেউ বয়ে এল যেন তাদের কামরায়, যার পিয়ানোর ওপর তারা গোছায় গোছায় রয়েছে। তাদের পাপড়ি ঝরে গেল আবার ফুটলো—গোলাপ বিছানো পথ—লেবু রঙা, চায়ের রঙ, একটু লালচে, রক্ত গোলাপও আছে—সে যেন জমাট বাঁধা রক্ত। সে গোলাপের সমারোহের ভিতরেই মারা গেল চেতনা ফিরে এল না। লালা আর রক্তলিপ্ত পাথরের মেঝেয় পড়ে রইল।

জ্যানেৎ গ্রামেঁাকে বললে, আমি ক্ষেপে যাব! ওর আমার উপর একেবারেই বিশ্বাস ছিল না। ও ভাবতো, আমি খালি ফূর্তিতে মেতে থাকি, কিন্তু ওকে ছাড়া আমি তো বাঁচতে পারব না। আমি ওর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চাই, আমাকে একটা রিভলভার দাও!..গ্রামেঁা জবাব দিলে, বেশ তো, সবুর করো, দেব...তিন সপ্তাহ পরে জ্যানেৎ একজন ব্রজিলিয়ান ছোকরা অফিসারের সঙ্গে নাচছিল, সে তাকে বললে, ওঃ আমি যে জীবন কি উপভোগ করতে চাই! যুদ্ধে আমার ভারি বিরক্তি ধরে গেছে। রাইয়ো ডি জেনেইরোর এক রাতের জন্য আমি আমার সবকিছু দিতে পারি……

গ্রামেঁা লিখলো ইশতেহার আর ছেলেরা তা ছড়িয়ে দিল সারা শহরে :

চৌদ্দজন জার্মান আর একজন পুলিশ নিহত। যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠছে। এখন থেকে ফ্রান্সের মাটিতে একজন জার্মানকেও আর শান্তিতে ঘোরাফেরা করতে দেওয়া হবে না। যে মহানগরের নামে আমাদের দলের নাম করা হয়েছে, তারই নামে শপথ করছি, শপথ করছি আমাদের বীর সাথী পলের নামে, যে কাফে রয়াল আক্রমণ করতে গিয়ে মারা যায়। জার্মানদের মৃত্যু চাই। দীর্ঘজীবী হোক স্বাধীনতা! —স্তালিনগ্রাদ দল

সাতাশ

মারীর মুখখানা খুশিতে ঝলমল করে উঠলো। অধ্যাপক দ্যুমাকে আর চেনা যাচ্ছে না। তিনি দুপ্লেট পেঁয়াজের স্যুপ খেলেন, আবার তারিফ করেও বললেন, চমৎকার হয়েছে। তারপর কোট গায়ে দিয়ে চললেন বেড়াতে। এর আগে মেরী যতই পেড়াপীড়ি করেছে বেড়াতে যেতে, গায়ে হাওয়া লাগাতে, তিনি রাজি হননি। তিনি বলেছেন, আর কি বিশুদ্ধ হাওয়া আছে, এখন তো ওদের গন্ধে দূষিত হাওয়া...কিন্তু আজ নিজেই বললেন ঃ

আমি আজ শহরে বেরিয়ে দেখব ব্যাপার কি। এখন ওদের দেখতে ভাল লাগবে। ওরা যতই হাত পা ছুঁড়ুক, এবার কফিনে শোয়ার আর দেরী নেই।

যদিও দ্যুমা মারপকে অন্তত দশবার স্তালিনগ্রাদে কি হয়েছে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন, তবু মারপ মনে করলো তাঁর এই পরিবর্তনের কারণ তার প্রার্থনা। তার বড় দুঃখ ছিল, অধ্যাপক বাড়ি থেকে বার হন না, কিছু খান না দান না, শুধু হরবড়ি তামাক টানেন...ডাক্তার মোরিলো বলেছিলেন, ওর বুকখানা একটুর জন্য মৃত্যুর আঘাত এড়িয়ে গেছে...প্রতি রবিবার সে তাই কুমারী মেরী-মার কাছে প্রার্থনা করেছে যাতে অধ্যাপক রক্ষা পান। অবশ্য দ্যুমাকে সে বলেনি, সে জানত, দ্যুমা হাসবেন। এর ভিতরে হাসি-তামাসার কি আছে, তিনি অধ্যাপক হোন আর যা-ই-ই হোন, তিনি এসব বোঝেন না......

দ্যুমা সব কিছুতেই খুশি হয়ে উঠেছেন। বিশুদ্ধ, নির্মল হাওয়া, ছেলেমেয়েরা খেলা করছে ফুটপাথে, একটি বুড়ো তার লোম ওঠা কুকুরটা নিয়ে পথে বেরিয়েছেন। গীর্জার পাশ দিয়ে তিনি চললেন এইখানেই মারী প্রতি রোববারে তাঁর জন্যে প্রার্থনা করে। তিনি সেখানে ভিড় দেখতে পেলেন

—জার্মান সামরিক কর্মচারীর দল, পুলিশ, কালো পোষাকপরা লোক 'ধূসর ইঁদুর' আর ফরাসী স্ত্রীলোকের দল। 'নিশ্চয়ই কোন হোমরা-চোমরা জার্মানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। এই মৃত জার্মানটি বড় বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে, হাঁ, একথা অস্বীকার করা যায় না। ঐতিহাসিক নিয়তির জন্য সে বসে থাকেনি—ত্যুমা নীচের সিঁড়িতে দাঁড়ানো নিষ্কর্মা ক'জন দর্শককে জিজ্ঞেস করলেন।

কার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হচ্ছে ?

কে একজন জবাব দিলে,

যে ইউরোপীয়রা স্তালিনগ্রাদের রক্ষী ছিলেন. তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উপাসনা হচ্ছে।

ত্যুমা খবরের কাগজ পড়েন না, লণ্ডন আর মস্কো বেতারে তিনি ঘটনার বিবরণ শোনেন ; তাই স্তালিনগ্রাদের ইয়োরোপীয় রক্ষীদল কথাটায় তিনি খুব মজা পেলেন। হাসি কষ্টে চেপে তিনি ভদ্রভাবে বললেন,

ইয়োরোপীয় নয়, জার্মান রক্ষাকারী বললেই বোধ হয় ঠিক হয়। আমি তো নিজে একজন ইয়োরোপীয়, আর জেনারেল বকোসোভস্কীও এশিয়া বা আমেরিকার লোক নন।

তিনি পথ চলতে লাগলেন, ফূর্তিতে কষে টানছেন পাইপ আর ভাবছেন ঃ আমি এখন দেখতে চাই আমার সেই হতভাগ্য সহযোগীকে। আমি তাকে বলেছিলাম, তাদের পক্ষে ব্যাপারটা খারাপই দাঁড়াবে···তারা আবার আমাদের কাছে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে বলবে, তাদের জন্য প্রাণ ভিক্ষার আবেদন জানাতে···সভ্যতা আর মানবতার দোহাই পাড়বে.. মানুষ কি করে এগিয়ে যাচ্ছে, সেকথা বহুবার বলা হয়েছে, কিন্তু হঠাৎ সে অজ্ঞানতায় ডুবে যাচ্ছে, সেকথাও তো কম কৌতূহল জাগাবে না···

দুমাস ধরে রোগে ভোগা আর এলোমেলো ভাবনার পর এই প্রথম ত্যুমা বেরুলেন বাড়ি থেকে। লিওর সঙ্গে দেখা করবেন ঠিক করলেন। যখন সেই বাড়িতে গিয়ে পৌছলেন, বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললে ঃ

তারা চলে গেছেন। ক'জন লোক এসেছিল মোসিয়েঁ আলপের্তের খোঁজে। আবার পরশুও এসেছিল, তারা জিজ্ঞেস করলে, তিনি কোথায় আছেন জানি কিনা...

কি ভয়ানক ব্যাপার! তারা নিজের স্মৃতির উপাসনা করছে, অথচ তারা একজন মানী লোকের রক্তও চাইছে। রক্তচোষা ভাম্পায়ার।

তত্ত্বাবধায়ক ভয়ে শিউরে উঠলো,

চুপ চুপ, ঈশ্বরের দোহাই চুপ করুন! এখানে এমন সব লোক থাকে, তাদের পৃথিবীতে একেবারেই থাকা উচিত নয়.......

হ্যমার খুসি ভাবটা কিন্তু একেবারে রইল না, তিনি ফুঁসে উঠলেন, তার মনে হোলো প্রথম যে জার্মানকে দেখবেন, তিনি ইতিহাসের বিচারের জন্য বসে না থেকে তাকে ঠেলে সিনের জলে,ফেলে দেবেন।

নদীর পার থেকে তিনি একটা পুরানো সরু গলিতে ঢুকে পড়লেন। তাঁর চোখ পড়লো দেয়ালে খড়ি দিয়ে হাতে লেখা 'স্তালিনগ্রাদ' কথাটার উপর। তিনি হাসলেন। সবাই জানে, ওরা শেষ হয়ে গেছে...লিও ঠিক সময়ে সরে পড়েছে ....ঐ ভদ্রলোকেরা যখন চলে যাবে দরজাটা দেবে সশব্দে ভেজিয়ে......আনা বহুদিন দেখা করতে আসেনি......আশা করি ওর কিছু হয়নি......ওরা এখন তাড়াতাড়ি নেমে পড়লে হয়।

ওরা ত্রিপলী দখল করেছে, ভালই হোয়েছে, পারীর কথাও মনে রাখা উচিত...জার্মানরা আর স্তালিনগ্রাদের ধকল সইতে পারবে না, এ এক মহলা হল বটে! আর আমাদের এই বাড়িটি বড় চমৎকার, তিনশো বছরের পুরানো, তার চেয়ে কম তো নয়।

একজন পরচুলো-পরা নাস্তিক এখানে বসে পড়েছ সদ্য প্রকাশিত ক্যানডিড (ভালতেরের লেখা বই)। জেকোবিনরা প্রতিজ্ঞা করেছে—হয় স্বাধীনতা, নয় তো মৃত্যু; তবুও নাৎসীরা এই বাড়িখানাকে, এই মহানগরীকে তাদের সৈন্যেদের স্ফুর্তির পানশালা বানাতে চাইল।...হ্যমা আর একটা লেখা

দেখলেন, খড়ি দিয়ে বেড়ার উপর লেখা ঃ কে যেন লিখে গেছে সবগুলি বাড়ীর সামনে—বেড়ার উপর। স্তালিনগ্রাদ! সংখ্যার চিহ্ন পড়েছে, মাপা হয়েছে, ভাগ করা হয়েছে....স্তালিনগ্রাদ এনেছে তাদের নিয়তি...

অধ্যাপক বেশ খুশি মন নিয়েই বাড়ী ফিরে মারপকে যা দেখেছেন আর শুনেছেন—সবই বললেন। উপাসনা নিয়ে ঠাট্টা করায় মারীর মনটা কেমন করে উঠলো, তবু হ্যমার এমন হাসি যে সেও না হেসে পারল না।

হ্যমা গা এলিয়ে দিলেন আরাম কেদারায়, কম্বল দিয়ে ঢেকে নিলেন গা (বাড়ীতে কয়লা নেই), তারপর পেঙ্গুইন দ্বীপ (আনাতোল ফ্রাঁসের লেখা বই) পড়বেন ঠিক করলেন। পড়ছেন আর জোরে হাসছেন, আর হাসির দমকে পাশের ঘরে মারী কি সেলাই করতে-করতে চমকে উঠছে। অধ্যাপক তা'হলে সেরে উঠছেন সে ভাবলে। তারপর ঘুমিয়ে পড়লো।

দরজায় বেল বাজলো। হ্যমা ঘড়িটার দিকে একবার তাকালেন ঃ এখন সাড়ে এগারোটা...তিনি দরজা খুলে দিলেন, দুজন জার্মান এসে ঢুকলো—একজন লেফ্‌টেনাণ্ট আর একজন সার্জেণ্ট। আর একজন ছিপছিপে মতো লোক, সাধারণ পোষাক-পরা, গায়ে তার একটা ওভার কোট, শীতের সময়ের পক্ষে একটু পাতলাই হবে, সে তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। পুলিশটা জিজ্ঞেস করলে,

মস্‌িয়েঁ হ্যমা এখানে থাকেন ?

আমিই হ্যমা.........

তারা খানাতল্লাস শুরু করলে, মারীর চোখে জল! হ্যমা শান্তভাবে পাইপ টানছেন, যেন ব্যাপারটা তাঁর নয়। লেফটেনাণ্ট দাঁড়িয়ে দেখছে, আত্তিপাত্তি করে তল্লাস করছে সার্জেণ্ট আর পুলিশটি। ওরা বইয়ের তাকের কাছে এসে ঘাবড়ে গেল—এতো এক সপ্তাহ বসেও দেখা যাবে না।

পুলিশটি রেগে উঠলো ঃ বড্ড বেশী বই রেখেছ।

হ্যমা ঘাড় নাড়লেন।

আমার এই পেশা, তোমাদের হয়তো অদ্ভুতই ঠেকবে, আমি মিস্ত্রী নই, অধ্যাপক।

সার্জেণ্ট হ্যমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকে হের্ অধ্যাপক বলে সম্বোধন করতে লাগলো। এতে লেফটেনাণ্ট চোটে গেল, সে বললে,

আমার দেশে তোমার মতো অধ্যাপকরা পাইখানা সাফ করে। হ্যমা হাই তুললেন, বেঁটে মোটা সার্জেণ্টকে তিনি দেখছেন। সে টুলের উপর উঠে উপরের তাকগুলি থেকে বই ছুড়ে ছুঁড়ে নীচে ফেলছে। ধূলোয় সুড়সুড় করছে তার নাক।

কি জন্যে যেন অধ্যাপক লেফটেনাণ্টকে চটিয়ে দিলেন। বুড়ো ভাঁড় কোথাকার।...হাসির ছবি দেখে ফরাসীদের এই-ই সে মনে করে—নোংরা, ধুলোভরা, সব কিছু নিয়েই ওরা ঠাট্টা করে। নিজেকে সে বিজ্ঞানী বলে গর্ব করে, আর যে দেশ পৃথিবীকে লাইবনিৎস, কাণ্টের মতো মানুষ উপহার দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে যেতে সাহস করে।

একখানা পুরানো বিশ্বকোষের মোটা বইগুলো টেনে নামাতে গিয়ে সার্জেণ্ট ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল। হ্যমা জোরে হেসে উঠলেন।

লেফ টেনাণ্ট বললে, শীগ্‌গিরই অন্যরকম হাসি বেরুবে, তুমি নিজের তুচ্ছতা আর জার্মানীর শক্তির কথা বোঝবার যথেষ্ট সময় পাবে।

হ্যমা জবাব দিলেন, সে সম্পর্কেও আমি যথেষ্ট ভেবেছি, তারপরে নিজেই জিজ্ঞেস করে অবাক হয়ে গেলেন, বল তো ঐ স্মৃতি উপাসনায় তুমি কি যোগ দিয়েছিলে ?

কি বলছ ?

তোমার দেশের মানুষ তথাকথিত ইউরোপীয়দের স্মৃতি উপাসনা করছিল, আমি তাই জিজ্ঞেস করছি......

লেফটেনাণ্ট চেঁচিয়ে উঠলো,

হ্বোর, তুমি ওকে নিয়ে যাও, রিচার্ড তল্লাসী শেষ করবে, মারপ পুলিশকে জড়িয়ে ধরলো (সে জর্মানদের ভয়ে ভীত)।

কি করছো ?· অধ্যাপকের অসুখ ; আজই তিনি প্রথম বেরিয়েছিলেন, ওঁর ফুসফুস দুর্বল, ডাক্তার মোরিলোকে জিজ্ঞেস করে দেখো......

হ্যুমা হাসলেন ঃ

আমার জন্যে কয়েকটা অন্তর্বাস গুছিয়ে দাও মারী, হয়তো দরকার হবেনা, কিন্তু যদি হয়। আর দুঃখ কোরো না! ওরা হেমন্তে আমাকে নিয়ে গেলে আমার দুঃখ হোত, কিন্তু এখন আমি শান্ত......

মারী চেঁচিয়ে উঠলো! তোমরা ওঁকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? ওঁর যে অসুখ!

হ্যুমা তাকে·জড়িয়ে ধরলেন,

সব ঠিক হয়ে যাবে, শুধু দুঃখ কোরোনা······

হ্যুমাকে ওরা নিয়ে গেল, শুধু রইল পুলিশটি—তাকে তল্লাস শেষ করতে হবে, মারপ তাকে জিজ্ঞেস করলে,

কোথাকার লোক তুমি—মার্সাঈয়ের ?

না, আমি তুলোর লোক।

তোমার লজ্জা করে না ? তোমার মা কোথায় তোমাকে বিইয়েছিলেন—তুলোয় না বালিনে ?

চুপ রহ., নইলে তোকেও নিয়ে গারদে পুরবো।

মারপ খুব কাঁদলে। হঠাৎ তার মনে পড়লো অধ্যাপক তাকে স্তালিনগ্রাদ সম্বন্ধে বলেছেন যে কথা ঃ সেখানে এত জার্মান মরেছে যে তা' গোনা যায় না। অধ্যাপক জানেন, তিনি বলেও ছিলেন, কিন্তু সে ভুলে গেছে, যাই-ই হোক, বহু মরেছে, বেশ হয়েছে! ওদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াই ভালো, বিশেষ করে ঐ খুদে অফিসার বেটা! ও কি করে অধ্যাপকের দিকে খিঁচিয়ে উঠতে সাহস করে ? মারপ প্রার্থনা করতে লাগলো। এমন প্রার্থনা সে

আগে কখনো করেনি। সে বুঝলো এ পাপ, তবু সে বলে চললো. প্রভু, ওদের একদম নিকেস করে দাও, কালই যেন ঐ পাজিটা মারা যায়! স্তালিনগ্রাদে যেমনটি হয়েছে, তেমনি যেন পারীতেও হয়।

হ্যমা জানতেন তাকে জেরা করা হবে, তাই তিনি জবাবও তৈরি করে রাখলেন। হয় তো ওরা খবর পেয়েছে, তিনি ইহুদীদের প্রতি অত্যাচারের বিপক্ষে ছিলেন, হয়তো লিওর বাড়ীর সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তিনি যা বলেছিলেন, তাও ওরা শুনতে পারে, হয়তো বা নিভেল তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে? তিনি তাই বলবেন, আমি অস্বীকার করি না। আমি একজন নৃতত্ত্ববিদ্ তোমাদের ঐ ধারণা আমি বিশ্বাস করিনা, বাজে বাজে মতবাদ! এখন আমার দুঃখ হচ্ছে, আমি কেন ইহুদী হলাম না—তোমরা তো হলদে তারাকে আত্মোৎসর্গের প্রতীক করে তুলেছ। হয়তো গীর্জায় সেদিন তিনি যা বলেছিলেন, তারা তাই শুনেছে। তাহলে তিনি বলবেন: 'চতুর্থ হেনরী বলেছিলেন পারীর পতনে শোকের এক মহতী উপাসনা করা যায়, তাই হিট্‌লার বুঝি স্তালিনগ্রাদের স্মরণে উপাসনার কথা ভেবেছে......

একজন নিদ্রাতুর সার্জেণ্ট জিজ্ঞেস করলে, নাম, বয়েস, কোথায় তাঁর থাম, কি পেশা? চুলের কেয়ারী করা একটি মেয়ে টাইপ-রাইটার খটাখট করছিল, সে চেঁচিয়ে উঠল—নাম বানান কর।......হ্যমা তাঁর ফাউণ্টেন পেন, ঘড়ি, মাথা ধরার ওষুধ হারালেন। ওরা পাইপটা নিলে না, কিন্তু জার্মানটা তামাকটুকু নিয়ে নিলে। তারপরে তাঁকে পাঠানো হোলো ফ্রেসনের বন্দীশালায়। ডিগ্‌রী অন্ধকার। হ্যমা তাকে আবিষ্কার করে নিলেন। বহু কষ্টে তিনি দেয়ালের লেখাগুলি পড়লেন, পিন দিয়ে, নখ দিয়ে লেখা: ফ্রান্সের জন্য আমি মরছি, জাঁ ম্যাতিয়ে। উনিশে নভেম্বর, ১৯৪২ সাল, টার্তিয়ে সম্বন্ধে হুশিয়ার—সে বিশ্বাসঘাতক। মাদাম ভ্যোরাককে বোলো, তার ছেলের যেমন ব্যবহার হওয়া উচিত, তেমনি সে করেছে—তাঁকে মৃত্যুর আগে সে জানাচ্ছে আলিঙ্গন। হ্যমা দেখলেন তিনি সঙ্গীহীন

ন্মন, যারা মরেছে, তারা আছে তার সঙ্গে। আর চাতিয়ে? গোল্লায় যাক!... কিন্তু ম্যর্তিয়ে আর গ্যোরাক...ওরা খাঁটি মানুষ। ওরা যখন এমনি মানুষ, তখন তো আমি মরতে ভয় পাই না.........

পরদিন হ্যুমা অস্ফুট স্বর শুনলেন, কান পেতে শুনতে শুনতে তিনি কথাগুলি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন। বন্দীরা একে অপরের সঙ্গে কথা বলছে, বায়ু চলাচলের ফোঁকর দিয়ে ঝরে পড়ছে কথা। কথা বলা নিষিদ্ধ, তবু যারা মৃত্যু-পথযাত্রী, তারা শাস্তির ভয় রাখেনা। হ্যুমা ব্যগ্র হয়ে শুনলেন, তিন্নি রেনের সঙ্গে কথা বলছে। পিয়ের সিসকিনের সঙ্গে, সার্জি কুপারকে ডাকছে, কিন্তু কুপার নিরুত্তর। কি অদ্ভুত ওদের ডাক নাম......ওরা জেরার কথা বলছে,—তিন্নির উপর আবার অত্যাচার হয়েছে, তারা অতীতের কথা বলছে, সিসকিন, মনে পড়ে, আমরা বনে পথে হারিয়ে ছিলাম? একে অপরকে দিচ্ছে জরুরী খবর—ভিক্তরকে গুলী করা হোলো। দ্যুদর সম্পর্কে ওরা যেন সাবধান থাকে...হ্যুমা বুঝতে পারলেন, একই কর্তব্যের সূত্রে এরা আবদ্ধ। তাঁর মনে হোল, তিনি এদের বাইরে। তিনি মুষড়ে পড়লেন। শুনলেন, কে যেন তাঁকে ডাকছে ওহে নতুন মানুষ জেরার সময় কি নাম বললে?

অধ্যাপক হ্যুমা?

কোথায় গ্রেফতার হলে?

বাড়িতে, বসে পড়ছিলাম এমন সময় দুজন জার্মান আর একটা পুলিশ এল, তারা আমার বই-পত্র ছড়িয়ে ফেললে।

নিস্তব্ধতা। হ্যুমা ক্ষুব্ধ হলেন। আমি ওদের দলে নই বলে ওরা আমার সঙ্গে কথা বলবে না নাকি? ওদের বোঝা উচিত, এখানে যখন এসেছি, তখন আমি বাজে লোক নই......

অধ্যাপক! বাইরের খবর কি?

হ্যুমা অমনি খুশি হয়ে উঠে স্তালিনগ্রাদ সম্বন্ধে যা জানেন বললেন.

জার্মানরা স্মৃতি-উপাসনা করেছে, সেকথাও। ওরা হেসে উঠলো।

ওরা ওদের ইয়োরোপের মানুষ বলে—ঐ হীন মানুষগুলো!

অতো জোরে নয়! চেঁচিয়ো না......কিন্তু 'স্মৃতি-উপাসনা ...মজার কথা বটে!

স্পষ্ট ভাবে বার বার স্তালিনগ্রাদ কথাটা উচ্চারিত হোলো। অধ্যাপকের কাহিনী ডিগ্রী থেকে ডিগ্রীতে ছড়িয়ে পড়লো।

আবার নীরবতা। একজন জার্মান হ্যুমার ডিগ্রীতে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠলো, এই খাড়া হো, তারপর তাঁর মুখে আঘাত করলো। যখন জার্মানটা চলে গেল, হ্যুমা হাত দিয়ে নিজের চোখ ঢেকে ভাবতে বসলেন! তা-হলে পরীক্ষার দিন এল......তিনি বৃদ্ধ...তাঁর দেহ হয়তো এ পরীক্ষা সহ্য করতে পারবে না। তবু তাঁর একটা সুবিধে, তিনি নিজেকে পরখ করেছেন। তিনি জানেন, তিনি ওদের কাছে নতজানু হয়ে দয়া ভিক্ষা চাইবেন না। নাৎসীরা তাঁর কাছে কতগুলি ভয়াবহ কীট-পতঙ্গ। ওরা হত্যা করতে পারবে, কিন্তু তাঁকে হীনতা স্বীকার করাতে পারবে না।

অধ্যাপক!...........

তিনি জানালার কাছে গিয়ে উদগ্র হয়ে কান পেতে রইলেন।

অধ্যাপক, জর্জ আপনাকে এই খবরটা পাঠাল—সে ছাত্র ছিল, আপনার বক্তৃতা সে শুনেছে। তার মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। সে পাঠাচ্ছে তার অভিনন্দন......একটু সবুর করুন, সে আরো জানাচ্ছে.. সে বলছে, আপনিও এখানে এসেছেন শুনে সে গর্বিত......

হ্যুমা ভাবলেন আপন মনে, ঐ ইতর জার্মানটা এখানে নেই, ভালোই হয়েছে। ও ভাবত ওর আঘাতেই আমি কাঁদছি ...হয়তো ঐ জর্জকে আর কোনোদিন চিনতে পারবনা। ও অন্য সবার সঙ্গে বসে আমার বক্তৃতা শুনেছে... ..গুলী করে ওকে মারা হবে, তবুও পাঠালে অভিনন্দন। আমার মন খুশি রাখতে চায়...এইখানেই কষাইয়ের দল ক্ষমতাহীন। তারা

আমাদের হীনতা স্বীকার করাতে পারেনি, আমরা আত্মসম্মান বিকিয়ে দিইনি..........

যা-ই হোক মানুষের মন এখনো সাদা আছে। সবাই বলে ফ্রান্সের কিছু নেই, সে পচে গলে গেছে। হাঁ, এটা সত্যি কথা। তার নেই একতা, শক্তি কমে গেছে, হয়তো বা অকেজো হয়ে পড়েছে...আমরা, ফিলিপি... পেতাঁ তার সাক্ষী, নিভেল লেখে পার্সেফোন নিয়ে পদ্য. একজন চাতিয়ে বা ছিদি বিশ্বসঘাতক হয়........কিন্তু এমনি ক'জন? ফরাসীদের একটা গুণ আছে। তারা মানুষ। হাঁ, হাঁ, তারা বীরত্বে আর দুর্বলতায় স্বাভাবিক মানুষ, খাবার টেবিলে, মেয়েদের সঙ্গে, প্রতিরোধ-প্রাকারেও তাই। আমি ইংরেজ, নরওয়েজিয়ানদের সঙ্গে কাজ করেছি, ওরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মজবুত, আরো বেশি ভদ্র হতে পারে, কিন্তু আমরা স্বাভাবিক মানুষ— এ দাবী আমাদের আছে। ফ্যাসিষ্টরা যাই-ই লিখুক না কেন, মনুষ্যত্ব বলে একটা জিনিষ আছে। তাই জর্জ শান্তভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। হাঁ, আর তাই আমি এখানে। আর মারিও এখানে আসতে পারে....যে স্তালিনগ্রাদ কথাটা দেওয়ালে লিখেছে, সে হয়তো প্রতিশোধের কথা ভাবেনি, হয়তো মহিমা বা যুদ্ধের পরে বৈঠকে যে দরকষাকষি আর মিথ্যের তুবড়ি ছুটবে সে কথা ভাবেনি, সে ভেবেছে মনুষ্যত্বের কথা— আর মানুষকে যে লোহার বুট দিয়ে পিষে ফেলা যায় না—সে কথা। দেহ পিষে ফেলতে পার, কিন্তু সার বস্তুটি তো নয়।

হ্যমার মুখখানা সহজ সরল এক আনন্দে ঝলমল করে উঠলো। জার্মান প্রহরীটি ফোকরের ভিতর দিয়ে দেখছিল, সে মুখ গোমরা করে ভাবলে, বুড়োটা ভয়ে পাগল হয়ে গেছে .....

আঠাশ

একমাস আগে যখন মেজর শেফার শার্কেকে বলেছিলেন, আপনি স্তালিন-গ্রাদের যুদ্ধের ব্যাপারটা বেশ বড় করেই দেখেছেন, শার্কে উত্তর দিয়েছিলো আমি কানামাছি খেলা ভালবাসিনে। উনিশ শো বত্রিশ সালে ক্যাথলিক আর সোশাল, ডেমোক্রেটরা বলতো যে, নাৎসীদের এই জয়লাভ নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামানো উচিত নয়। উনিশ শো আটত্রিশ সালে পারীর খবরের কাগজগুলি লিখেছিল, ফ্রান্স আর গ্রেট বৃটেনের যুগ্মশক্তির কাছে সুদেতেনল্যাণ্ড কিছুই নয়। আমাদের সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। ফ্যুরারের প্রতিভার প্রতি আমার বিশ্বাস আছে। সামনের মাসেই হবে তার পরীক্ষা। এতদিন তো শুধু জয় করেছি, এবার যুদ্ধ করতে হবে আমাদের ....ফেব্রুয়ারির বিজ্ঞপ্তি পড়ে বহুলোক হতবুদ্ধি হয়ে গেল। কিন্তু শার্কে তা হয় নি—সে তৈরী ছিল। তার মত হচ্ছে, জার্মান সেনাপতিদের অনেকেরই অভিজ্ঞতা আর সামরিক জ্ঞান আছে, কিন্তু টিঁকে থাকার মতো স্নায়ুর দৃঢ়তার অভাব। কয়েকজন জেনারেল ফ্যুরারকে একটা ভুইফোঁড় বলে মনে করেন। এ এক আকস্মিকতা ছাড়া কিছুই নয়। তারা আছেন অতীতে —তারা সামরিক নিয়ম-কানুনের পূজো করেন, একেবারে ধরাবাঁধা নিয়ম মাফিক অভিযান চালান। এমনি মানুষরা দুই সেনাদলে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হচ্ছে তাই-ই মনে করেন, ঠিক উনিশ শতকের মতো আর কি। তারা ভাবেন একদল বিজয়ী হবে, আর একদল পরাজিত, তারপরে শান্তির কথাবার্তা চলবে, সন্ধি হবে। বাজে, একেবারে বাজে ব্যাপার। জার্মান জাতি সবকিছু বাজি রেখেছে—হয় সে প্রভু হবে, নয়তো দাস। আমরা তরুণদের সাহসী কুসংস্কার-মুক্ত আর অগ্রগামী করে গড়ে তুলেছি, এখনও, এই স্তালিনগ্রাদের সর্বনাশের পরে এই তরুণদল জিততে পারে। কিন্তু সেনাবাহিনী থেকে বৃদ্ধ ষড়যন্ত্রকারী, দুর্বলচেতা আর দুমুখো মানুষদের সরাতে হবে।

ফ্রান্সে কাজ করা শার্কের পক্ষে খুব সোজা ছিল না। সে বুঝতে পেরেছিল এখন একটু ফন্দি-ফিকির দরকার। তাই বার্তির সঙ্গে সে ভদ্র ব্যবহার করত, নিভেলকে চাটুবাক্যে খুশি করত, আর প্রশংসা আর হাসি বিতরণে সে ছিল মুক্তহস্ত। লোকে বলে, তার লেখবার টেবিলে নাকি জাঁ দ্য আর্কের একখানা ব্রোঞ্জের মূর্তি আছে। কিন্তু মনে মনে সে ফরাসীদের ঘৃণা করে। তারা কাঁপা গলায় তাঁকে প্রিয় ম্যঁসিয়ে শার্কে বলে ডাকে বটে, কিন্তু তারা তাকে ল্যাম্পপোষ্টে ঝোলাবার স্বপ্নও দেখে......এই মায়াময় শান্তি তাকে প্রতারিত করতে পারে না। ফ্রান্সের ট্যারা চোখ—তার এক চোখ পূর্বে, আর এক চোখ পশ্চিমে। একে অপরের টুটি টিপে ধরবার জন্য তৈরী—কিন্তু একটা ব্যাপারে এসেছে সংহতি—যে জার্মানীর প্রতি তাদের শত্রুতা। যখন শেফার চলে গিয়ে বলে, এই ফরাসীগুলো হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, কেউ দেয়ালে খড়ি দিয়ে স্তালিনগ্রাদ কথাটা লিখেছে বলেই একথা বলে। শার্কে তখন হেসে বলে, নিশ্চয়ই আপনার ঘুমে ব্যাঘাত হয়নি। শেফার হয়তো তখন ভয়ে কাঁপছে। সে যদি সঙ্কট মুহূর্তে নিজের প্রাণ বাঁচাতে চায়, তাতেও আমি অবাক হব না।

শার্কে জানে সে কখনো ফ্যুরারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। এই আন্দোলনে যোগ দেবার আগে তার জীবন ছিল একঘেয়ে, উত্তেজনাহীন; ফ্যুরারের দলে যোগ দিয়েই সে জয়ের আশ্বাস পেয়েছে, ক্ষমতার মদিরা পান করেছে। মানুষের যে সম্পর্ক ধোঁয়াটে, বা বন্ধুত্বের উপর যার ভিত্তি, পছন্দ অপছন্দের চোরাবালিতে যার মূল—তার প্রতি তার চরম ঘৃণা। একজন মানুষ হয় হুকুম দেবে, নয়তো হুকুম তামিল করবে। কর্ণেল বেয়ার শার্কেকে হুকুম দেন। শার্কে আবার জেণ্টচ্ বা ফাসঁটকে হুকুম দেয়। এমনি করেই চলে।

সে নিজেকে আদর্শবাদী ভাবে। একদিন তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করেছিল, একি সত্যি যে, পোলাণ্ডে সব ইহুদীদের হত্যা করা হয়েছে, ছোট ছেলেমেয়েরাও বাদ যায়নি? শার্কে জবাব দিয়েছিল, আমি খুঁটিনাটি ব্যাপার জানিনা, এসব অন্ত

বিভাগের ব্যাপার। তবে শুনেছি, পূর্ব অঞ্চলের বহু শহর থেকে ইহুদীদের নির্মূল করে ফেলা হয়েছে। ছোটছেলে মেয়েদের ধ্বংস করা যে নিষ্ঠুরতা তা জানি—কিন্তু এর প্রয়োজন ছিল। বীজ বপন করবার আগে মূলগুলি তো জমি থেকে উপড়ে ফেলতে হবে। আজ থেকে বিশ বছর পরে উদারচেতারা আজ যাদের কসাই বলছে, তাদের মানুষ আশীর্বাদ করবে...... ফ্রাউ শার্কে বললে, তুমি ঠিকই বলেছ। যে সব ব্যাপারের তার কোনো ক্ষতি নেই তাতে সে স্বামীর সঙ্গে একমত। কিন্তু টাকার ব্যাপারে একেবারে মেলে না। শার্কে তাকে কোন কিছু করতে বাধা দেয়না, কিন্তু সে শার্কেকে অতিরিক্ত ব্যয় করতে বাধা দেয়, সে নাকি কিছু সঞ্চয় করে রাখতে চায়না দুর্দিনের জন্য। শার্কে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে দুর্দিন যদি আসে, তখন কোনো সঞ্চয়ই কাজে আসবে না। কিন্তু বৃথা বলা। সে ভর্ৎসনা করে ঃ তুমি অতো স্বার্থপর হোয়োনা, তুমি আমার আর হানসের কথা একটু ভাবো। ফ্রাউ শার্কে তার ছেলেকে রাজধানী থেকে বাইরে রাখতে বড় চেষ্টা করেছিল। সে তাকে মেয়ের মতো করে মানুষ করেছে। তারপর সঙ্গতিসম্পন্ন মানুষদের সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করিয়েও দিয়েছে। আশা ছিল, সে যা করতে পারেনি, তারা তাই করবে। কিন্তু যুগ-ফ্রাউ শার্কের থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী, আর হান্স কালের আবহাওয়ায় গিয়ে ভর্তি হোলো ঝঞ্ঝা-বাহিনীতে।

ফেব্রুয়ারীর শুরুতে শার্কে স্ত্রীর চিঠি পেয়েছিল। সে লিখেছে তুমি যেখানে আছ ঐখানেই হান্সের পল্টন্‌কে পাঠানো হচ্ছে। লোকে বলে, তারা নাকি মিত্রশক্তির ফ্রান্সে অবস্থান ঠেকাতেই যাচ্ছে। এতো ভয়ানক কথা। ওরা তো সবাই ছেলেমানুষ, হান্সের মতোই ছেলেমানুষ। আমার তো নিজের মাথা কুটে মরতে ইচ্ছে করছে। শার্কে নিজেও একথা বহুদিন ভেবে শিউরে উঠেছে; হান্সকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হবে! তার স্ত্রীর চিঠি পেয়ে সে খুসিই হোলো। ভালই হয়েছে, ওকে রাশিয়ায় পাঠানো হচ্ছেনা .....যখন মিত্রশক্তি নামবে, তখন কেউ জানবে না, আর যাই হোক যুদ্ধ এখানে ততো ভীষণ হয়ে উঠবে

না।·· ছেলেটার ভাগ্য আছে। শার্কে তার স্ত্রীকে লিখলো তোমার অভিযোগ শুনে অবাক হলাম, সব জার্মান মারইতো এক অবস্থা, আমাদের হান্স যদি স্তালিন-গ্রাদের রক্ষীদের মধ্যে একজন হোত, আমরা এই গর্ব করতে পারতাম যে, আমরা ফ্যুরার আর আমাদের পিতৃভূমিকে একজন বীর শহীদ দান করেছি। সে পথ চেয়ে ছিল শীগ্‌গিরই তার ছেলের সঙ্গে দেখা হবে, কিন্তু তাতো হোলোনা। ফেব্রুয়ারীর এক হাওয়া ভরা দিন, শার্কে দুপুরের ভোজ খাচ্ছিল পিনাউদের সঙ্গে। সে বার্তির মৃত্যু নিয়ে দুঃখ করছিল; বার্তির সঙ্গে তর্ক করে সুখ ছিল। ... পিনাউদ কোনো তর্ক বিতর্ক করলে না। সে নীরস স্বরে বললেন, যারা মাল তৈরী করে তারা তো বেশ খুশী, তারা সন্ত্রাসবাদীদের ঘৃণা করে...এমনি সব কথাই তারা বললে। কিন্তু তার মনে সত্যই কি ছিল কে জানে? শার্কে শুরু করলো স্তালিনগ্রাদের কথা।

এ এক প্রচণ্ড আঘাত—যেমন আমাদের, তেমনি সারা ইয়োরোপের পক্ষে।

পিনাউদ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সায় দিলে, কিন্তু মতামত ব্যক্ত করলে না। যখন, শার্কে তাকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে বসলো যে এবিষয়ে তার মতামত কি, সে জবাব দিলে,

না বললেও এখন নিশ্চয়ই যে বুঝতে পারছেন আমি কমিউনিষ্টদের দরদী হতে পারি না। আসল কথাটা হচ্ছে, আমি যে ঐ দলে ভিড়ব তেমন গরীব তো নই......

কিন্তু যখন কফির পেয়ালায় তারা চুমুক দিচ্ছিল, তখন পিনাউদ বললে,

হাঁ এ এক প্রচণ্ড আঘাতই বটে—রুমানিয়ানদের কথা বাদ দিলেও আপনাদেরই বিশ ডিভিশন সৈন্য গেছে—এতো যথেষ্ট ক্ষতি। জানিনা, কি করে আপনারা এই সংকট থেকে মুক্তি পাবেন ....

'ক্ষতি' কথাটায় শার্কে চটে গেল—সুদখোর মহাজন কোথাকার! ও শুধু আয় আর ক্ষতির খতিয়ান করতে জানে। কিন্তু সে রাগ বাইরে দেখালে না, হেসে বললে, লালফৌজ থেকে ঐ সংখ্যাটি বলা হয়েছে বটে, আপনি লণ্ডন

বেতার কেন্দ্রের প্রচার শোনেন দেখছি, হাঁ, যা বলেছি! আঘাত প্রচণ্ডই বটে, কিন্তু গ্রীষ্মে এর শোধ তুলব...বোলসেভিকদের বাধা দিতেই হবে, ওদের বাধা না দিলে ওরা যে শুধু স্প্রীতে এসেই হানা দেবে তা নয়, ওদের সিনের পারেও দেখা যাবে।......

পিনাউদ তাড়াতাড়ি বললে (সে নিজেকে গাল দিলে, কেন সে অসতর্ক হয়ে পড়লা). আমাদেব সব আশা-ভরসা তো আপনাদের সেনাবাহিনী।

দুপুরের ভোজের পরে শার্কে তার অফিসে চলে গেল। মেজর শেফার তাকে বললে, কর্ণেল আপনাকে দেখা করতে বলেছেন।

শেফার অনুমান করে নিলে, ব্যাপারটা কি, তারপর শার্কের দিকে অনুকম্পা ভরে তাকালো।

কর্ণেলের অফিস থেকে শার্কে শান্ত ভাবেই বেরিয়ে এল, কিন্তু তার মনে তখন আলোড়ন চলছে।

ওরা আমাকে পূর্ব রণাঙ্গনে পাঠাচ্ছে।

শেফার দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে,

বরাত!......তাইত, আপনিতো আর এখন যুবক নন.......তবুও......

তাতে আমার কিছু যায় আসে না! বরং খুশিই হয়েছি। এখানে কিছুই করবার নেই। ফরাসীরা শুধু দেয়ালগুলো খড়ি দিয়ে আঁকি বুঁকি কেটে নোংরা করে দিচ্ছে, আর অবতরণের কথা যদি বলেন, আমার তো মনে হয় সে আর হচ্ছে না......ওরা এখন বলকান্ বা ইতালীর দিকে ঝুঁকে পড়বে......কিন্তু রাশিয়ার পরিস্থিতি একেবারে আলাদা ঃ সেখানে সবকিছুই জটিল।

কর্ণেল কি বলেছেন, কোন্ কাজে আপনি যাচ্ছেন ?

তিনি জানেন না। যাদের পাঠানো সম্ভব হচ্ছে, তাদেরই পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ...আমাকে যেতে হবে মিনস্ক-এ, গিয়ে কমিসার জেনারেল কুব-এর কাছে হাজরে দিতে হবে।

নিজের কামরায় বসে শার্কে আপন মনে ভাবলে, হানস-এর সঙ্গে দেখা হবে

না এই যা দুঃখ। হয়তো আর তাকে দেখব না... ...সেও তো সৈনিক। আর আমি চলেছি রাশিয়ায়......সেখানে যেখানে যাব সেইখানেই তো যুদ্ধক্ষেত্র......

শার্কে গাড়িবারান্দায় এসে দাঁড়াল। ঠাণ্ডা লাগছে, তবু সে বহুক্ষণ পারী শহরের দিকে তাকিয়ে রইলো। হালকা কুয়াশার অন্তরালে ঢাকা পারী, ধূসর, বন্ধ্যা বিষণ্ণ। এই সেই নগরী যেখানে সে বহুবছর কাটালে, মনে হয় যেন হোটেলের একটা কামরায় কাটিয়েছে জীবন। তার ভাবনা এবার হারিয়ে গেল দূরে তুষারাবৃত রাশিয়ায়। লাল ফৌজ কার্স্ক থেকে ঠেলে এগিয়ে আসছে। কিন্তু কর্ণেল না বলেছেন, ফন মানস্টাইন এক শক্তিশালী সেনাদল জড়ো করেছেন। জয়লাভ শক্ত, বড় শক্ত। কিন্তু আমরা জার্মান, আমরা আমাদের সংকল্প সিদ্ধ করব . ...

শেফার ছুটে গাড়ীবারান্দায় এল :

এইমাত্র ফোন এসেছে, একজন লেফটেনান্ট ছুটি পেয়েছিল আজ, তাকে আপনার বাড়ির কাছে ওয়াগ্রাম এভিনিউতে কারা গুলী করে মেরেছে। একেবারে প্রকাশ্য দিবালোকে...আপনি না বলেছিলেন, ওরা শুধু দেওয়ালই নোংরা করতে পারে.......

শার্কে বিকৃত হাসি হাসলো, আমাকে ওরা এমন করে তাহলে বিদায় সম্ভাষণ জানালে।

ওয়াগ্রাম এভিনিউতে গুলীর কথা শুনে শার্কে ভয় পেল, কিন্তু তার কি ? সে তো এখান থেকে বিদায় নিচ্ছে। আর স্তালিনগ্রাদের পরে একজন লেফটেনেণ্টের মূল্যই বা কি ?......সে শেফারকে বললে,

আপনার যদি আপত্তি না থাকে, আমি এবার বাড়ি যাব। আমার জিনিস পত্র গোছাতে হবে।

আবার একবার পারীর দিকে তাকালো শার্কে, আস্তে আস্তে কুয়াশাময়ী নগরী ডুবে যাবে রক্তাভ সন্ধ্যার আঁধারে। ওরা এখানে আমাকে দেখতে পারে না, আমিও ওদের দেখতে পারিনা। বেশ তো ! ভাবপ্রবণতা ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে, তাহলেই জয়লাভ হবে আমাদের......

উনত্রিশ

গার্ডার নতুন বছরের উৎসব মোটেই যেমন তেমন ভাবে সারেনি। তার ভাই ফ্রিডরিশ ছুটিতে নরওয়ে থেকে এল (সে নিয়ে এল ওর জন্যে একটা গরম সোয়েটার, রুডির জন্যে এক জোড়া দস্তানা, য়্যাঙ্কোভি মাছ আর চকোলেট) ফ্রেনৎসেলরাও ছিল সেখানে। আলফ্রেড ফ্রেনৎসেল সৈন্যদলে যোগ দেবার পক্ষে অনুপযুক্ত সাব্যস্ত হয়েছে—তার ডান হাতের তিনটে আঙুল নেই। কিছু দিন আগেও গার্ডার মার্থাকে দেখে করুণা হত, এমন স্বামী কার ভাল লাগে—যে বাঁ হাত দিয়ে করমর্দন করে। কিন্তু মার্থার এখন একটা সুবিধে আছে, তাকে সব সময়ে দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয় না। গার্ডা জোহানের কাছে থেকে এতদিন কোন চিঠি পায়নি। গার্ডা যে নতুন বছরের আগের দিনের উৎসবে শান্ত ছিল, কয়েক পাত্র পান করে খুশি হয়ে উঠেছিল, এর কারণ এই নয় যে, জোহান লিখেছে, চিঠি এখন নিয়মিত আসবে না, বা ফ্রিডরিশ তাকে বুঝিয়েছে, যুদ্ধে দাম্পত্য জীবনের কর্তব্য করবার সময় নয়। এর কারণ, সে জোহানের বরাতে বিশ্বাস করে। গত বছর সে মস্কোর সেই ভয়াবহ যুদ্ধে লড়াই করেছে, কিন্তু তার পা পর্যন্ত কোনদিন শীতে জমে যায়নি...একখানা চিঠিতে সে তাকে শান্ত করে লিখেছে, আমি তো এখন প্রায় এশিয়ায় এসে গেছি। আর এটা দক্ষিণ অঞ্চল.. . গত শীতে যেখানে ছিলাম, সেখানকার থেকে এখানে আবহাওয়া অনেক গরম......

ফ্রেনৎসেল খুব আড়ম্বরের সঙ্গে স্বাস্থ্য পালনের প্রস্তাব করলে, এস আমরা ফ্যুরারের সেনাবাহিনীর সাফল্য গ্যেটের আলোর কামনা আর বিজয়ীর মহানুভবতার জন্যে স্বাস্থ্যপান করি। এবার ফ্রিডরিশ তার গেলাস তুলে অত্যন্ত স্থূলভাবে ফৌজি ঢঙে বললে, যত বেজন্মা আছে, সবগুলিকে গুঁড়িয়ে দেবার কামনা করি আমি। রুডির এই স্বাস্থ্যপান ভালই লাগলো, সে চেঁচিয়ে উঠলো। ওরা তাঁকেও একটুখানি শ্যাম্পেন ঢেলে দিয়েছিল। ফ্রিডরিশ তাদের নরওয়ের

সুন্দরীদের কয়েকখানা ফোটো দেখাল। মার্থা বললে, সে চায় ঘুরে বেড়াতে প্রেম করতে। ফ্রেনৎসল তার পঙ্গু হাত তুলে বার বার বললে, মহানুভবতাই এখন দরকার। ফ্রিডরিশ তাকে 'পাদ্রী' বলে ঠাট্টা করলে। কিন্তু গার্ডার ভাবনা তখন বহুদূরে 'প্রায় এশিয়ায়—জোহান তো তাই' লিখেছিল।

গার্ডা তার চিন্তায় পর্যন্ত সতীত্ব বজায় রেখেছে। অন্য লোক দেখে তার ভাবান্তর হয় না। তার যে সব বন্ধু একটু বেশ উদ্দাম হয়ে ওঠে সে তাদের ভর্ৎসনাই করে। একটা আজে বাজে লোক ছুটিতে বাড়ি এলেই হোলো, অমনি সব মেয়েরা তাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে আসবে, মদ আর খাবার তাকে গেলাবে, যুদ্ধক্ষেত্রের জীবনের কথা জিজ্ঞেস করবে, তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলবে, ওর কথা না ভেবে তো ঘুমুতেও পারি না, তারপর এইসব প্রশ্নের পরিণতি হবে—'বিছানায়—প্রকৃতিকে তো তুমি আর দমিয়ে রাখতে পার না'—হাঁ, এই কথা বলেন অধ্যাপক হ্বার্তের স্ত্রী। এর চেয়েও খারাপ ব্যাপার ঘটে গেছে। ক্রাউস ছিল মালী, তার বৌ যুদ্ধের আগে কেলারদের বাড়ি ঝাঁটপাট দিত, সে কিনা ফরাসী এক যুদ্ধ-বন্দীর সঙ্গে সহবাস করে জেলে গেছে। গার্ডা তো শুনে রেগে জ্বলে উঠেছিল, আমি হলে ওর মাথাটা কেটে ফেলতাম! কি করে একজন জার্মান মেয়ে ফরাসীকে কাছে ঘেঁসতে দেয়? ওদের গায়ে রশুনের গন্ধ, আর তা ছাড়া ওরা সবাই খারাপ অসুখে ভুগছে......

গার্ডা 'শীতকালীন সেবা বিভাগে' কাজ করে, ছেলেমেয়েদের একটা ভোজ-নাগারও সে প্রতিষ্ঠা করেছে। গত শীতে খুব কষ্ট গেছে—সে ক্ষুদে গ্রেচেনকে রেখেছিল এক পড়শীর কাছে। গ্রীষ্মে সে একটা রুশ মেয়েকে ঝি রাখলো। তার বয়েস আঠারো হবে। গার্ডা তার উপর খুশিই আছে। সে নম্র, কাজের লোকও বটে, আর ভারি শান্ত হয়তো বা ভীতু—দিনের বেলা কাজ করে, আর রাতে রান্নাঘরে বসে কাঁদে। ফ্রিডরিশ যখন বাড়ি এল, সে ওলগাকে (ঐ ওর নাম) তাকে দেখালে, দেখ, দেখ...জোহান লিখেছে বোলশেভিকদের ভয়ে ওরা কাঁপছে, কিন্তু তার মানে কি, ওকে না দেখা পর্যন্ত বুঝিনি........ফ্রেনসেল

বললে, সব রুশই দুঃখকে পূজা করে, একথা জানতে হলে তোমার দস্তইয়েভস্কী পড়া দরকার•••গার্ডার ওলগার মনস্তত্ব সম্পর্কে বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই, সে ঝি পেয়েছে এতেই সে খুশী। যুদ্ধের আগে তো সে ঝি রাখার স্বপ্নও কখনও দেখেনি।

নতুন বছরের উৎসবের পরে হঠাৎ একদিন ইরমা খবর না দিয়েই এসে হাজির হোলো। গার্ডা তার বোনকে দেখে খুশি হোল, কিন্তু তখনি বুঝলে একটা কিছু খারাপ খবর আছে। বহুদিন দুজনে দেখা হয় নি। ইরমা একজন ইঞ্জিনিয়ারকে বিয়ে করেছে, তারা থাকে ডর্টমুণ্ডে। কিছুদিন হোলো তার স্বামী সৈন্যদলে নাম লিখিয়েছে।

গার্ডা জিজ্ঞেস করলে, কাঁদছ কেন ? হ্বিলির কিছু হয়েছে নাকি ?

ইরমা নীরব। কালো কালো ফোঁটায় জল ঝরছে তার গাল বেয়ে—চোখের পক্ষ্ম থেকে মাস্‌কারা চুয়ে চুয়ে পড়ছে, পরে সে বললে,

ভয়ানক ব্যাপার !•••...তুমিও এত সহ্য করনি। ডর্টমুণ্ড এখন স্তালিনগ্রাদের চেয়েও খারাপ !... ...তুমি ভাবতে পার ? একটু মন ভাল করতে সিনেমায় গিছলাম, হ্বিলি চলে যাবার পর থেকে তো পাগলের মতো কাটাচ্ছি•••....সে এক বাজে ছবি—শেষ ছায়ামিছিল না কি ছাই। হঠাৎ ছবির মাঝখানে 'সতর্ক ঘণ্টি' বেজে উঠলো। আমরা আশ্রয়ে যাবার আগেই সে কি ভীষণ শব্দ—কি যে সে শব্দ তোমাকে বোঝাতে পারব না, •••আমি তো চেঁচিয়ে উঠলাম 'মা' বলে। আহা মা বেচারী, ষ্টাটগার্টেও এমনি ভয়ানক ব্যাপার।...যা হোক, সত্যিই শিলারষ্ট্রাসের সে ছবিঘরের চিহ্নও নেই। কি করে যে সেদিন বাড়ি ফিরলাম জানি না। আমরা যখন সিনেমা থেকে বেরিয়ে এলাম, তখন আর তার চিহ্নও নেই...আমাকে জল দাও তো, আমি ক'টা ভ্যালেরিয়ানের বড়ি খাব। আমি ক্ষেপে যাব, সত্যি আমাকে পাগল হয়ে যেতে দেখলে, অবাক হোয়ো না। এইটেই তো এখন স্বাভাবিক......

ইরমা এল গার্ডার সঙ্গে বসবাস করতে, আর সঙ্গে সঙ্গে তার ছোট্ট ঘরখানি

সুগন্ধি আর বিশৃঙ্খলায় ভরে গেল। ছেঁড়া মোজা জোহানের বইয়ের উপর এখানে ওখানে ছড়িয়ে রইল। ইরমা চেঁচিয়ে অভিযোগ করলে, ওলগা একটা শুয়োর। রুডিটার কিছুই ভদ্র শিক্ষা হয়নি, ও ভারি অভদ্র হয়ে উঠেছে। নরওয়ে থেকে তার ভাই যে চকোলেট এনেছিল,গার্ডা সেই চকোলেট রেখে দিয়েছিল— যদি জোহান বাড়ি আসে তাকে খাওয়াবে বলে; তাই-ইরমা গ্রেচেনকে ঠেসে ঠেসে গেলালো। প্রতিদিন রাতেই সে ফিট পড়তে লাগলো, চেঁচিয়ে বলতো, ডর্টমুণ্ড পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মা মারা গেছেন, হ্বিলিও আর রাশিয়া থেকে ফিরে আসবে না।

গার্ডা হতাশ হয়ে পড়ছে। আরো একমাস কেটে গেল, এখনো জোহানের খবর নেই। ইরমার চোখের জল অবিরাম ঝরছে আর সে বলছে, জোহান স্তালিনগ্রাদে হ্বিলি স্তালিনগ্রাদে, ওরা সবই এখন স্তালিনগ্রাদে। গার্ডা জানে তার বোন বাজে কথা বলছে। হিবলি নোভগেরাদের কাছে কোথাও আছে। তবে হাঁ, জোহান বোধহয় সত্যিই স্তালিনগ্রাদে……

শোক প্রকাশ করবার জন্য তিনটি দিন ঘোষণা করা হলো: থিয়েটার, সিনেমা বন্ধ, বেতারে শোকসূচক বাজনা। ফ্রেনৎসোল এল, সে গার্ডাকে সান্ত্বনা দিলে, হয়তো জোহান সেখানে নেই, সে এখন বোধহয় ককেশাসে…… গার্ডা রান্নাঘরে কয়েকটা গেলাস আনতে গেল, তাহলে ফ্রেনৎসেলও ভাবে জোহান স্তালিনগ্রাদে আছে……ওলগা জানালায় বসে হাসছিল আপন মনে, গেলাসের কথা ভুলে, গার্ডা ছুটে তার ঘরে গিয়ে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে। ইরমা তখনি শান্ত হয়ে গেল, সে গুণে গুণে ক'টা ভ্যালেরিয়ানের বড়ি গেলাসে ফেলে দিলে; ফ্রেনৎসেল বার বার বলতে লাগলো আমার তো মনে হয় জোহান ককেশাশে আছে……কিন্তু গার্ডা রাগে কেঁদে ফেললে। সে তার বাড়িতে এক সাপ পুষেছে! সে একবারও তাকে মারেনি, বরং একটা পুরাণো গাউন দিয়েছে……আর এখন এই বেশ্যাটা বহু জার্মান মরেছে বলে খুশি হয়ে উঠলো! হয়তো জোহানও এদের মধ্যে একজন।……একথা সত্যি, রুশরা

মানুষ নয়। জোহানও ঠিকই লিখেছিল, 'ওদের ওপর করুণা হয়, কিন্তু তবু করুণা করা তো অসম্ভব••••...

গার্ডা ফ্রেনৎসেলকে বললে, ঐ কুত্তিটা কি খুশি হয়েছে দেখেছ।

ফ্রেনৎসেল এক মুহূর্ত ভেবে নিলে, তারপর বুকের উপর হাত রেখে বললে, এ এক মহা পাশবিকতা বিশ্বগ্রাসী পাশবিকতা, মানুষের জয়-রথের সুমুখে পড়েছে বাধা, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হিটলার হচ্ছেন আলো, তিনি ফিগাস....কিন্তু আমার এই ভয় হচ্ছে, মানুষ একে অপরের টুটি টিপে ধরবে।....

যখন সে চলে গেল, ইরমা বললে,

ওর হাতেই শুধু খুঁত হয়নি; আমার মতে ও পাগলা হয়ে গেছে......তা যেসব ব্যাপার হচ্ছে তাতে তো মানুষ পাগল হবেই। ডর্টমুণ্ড-এর এক ব্যাঙ্কের কেরাণীর হঠাৎ মাথায় গজালো, পৃথিবীর শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে, যখন 'সব পরিষ্কার' ঘন্টি বাজলো, সে একেবারে ন্যাংটো হয় পথে বেরিয়ে পড়লে...শোন গার্ডা, তুমি তোমার ঐ রুশ শুয়োরটিকে রাতে আটকে রেখো। রুশদের সম্বন্ধে হুঁশিয়ার হতে হবে বইকি!

গার্ডা বেতারে একজন মেজরের বক্তৃতা শুনলো; সে বিশে জানুয়ারী পর্যন্ত স্তালিনগ্রাদে ছিল। সে বললে, সেখানে এখন প্রচণ্ড শীত, খাবার নেই। পুরানো যুগের বীরদের মতোই জার্মানরা নগর রক্ষা করেছে, কিন্তু অবরোধকারীদের সংখ্যা অবরুদ্ধের চেয়ে অনেক বেশি—তাই লড়াই চলেছে সমান অসমানে। আর অবরুদ্ধরা হারছে।

গার্ডা ওলগার দিকে তাকিয়ে রইলো, তার হৃদয়ে জ্বলছে ঘৃণার আগুন; ঐ বেশ্যাটার চার ভাই, তিন বোন। রুশরা সংখ্যায় বহু, আর ওরা আমাদের ধ্বংস করতে চায়। আর আমরা, আমাদের আছে সংস্কৃতি, আদর্শ আর বিশ্ববিদ্যালয়; ওদের আছে সব পশুশক্তি, ওলগা যেমন করে একটা কয়লার বস্তা মাথায় তুলে নেয়, তাতেই তো তা বোঝা যায়.....

মার কাছ থেকে চিঠি এল : প্রিয় গার্ডা, তোমার কথাই সব সময়ে ভাবি।

জোহান কেমন আছে? এখানে তো ভয়ানক ভাবে দিন কাটছে। এমন এক রাত গেছে, যখন মনে হয়েছিল এবার শেষ হয়ে গেলাম। রেল ষ্টেশানটা উড়ে গেছে। ফ্রাউ জিগেল তার সেলারে চাপা পড়ে মারা গেছেন। বুঝিনা কেন এই দুঃখ আমাদের সইতে হোল......

গার্ডা নিজেকে প্রশ্ন করলো, তাইত আমিই বা কেন এই দুঃখ সইছি? এ প্রশ্নের কে জবাব দেবে! ফ্রিডরিশ নরওয়েতে ফিরে গেছে বহুদিন। ইরমা আর কাঁদেনা, বিমান প্রতিরোধকারী দলের এক ছোকরার সঙ্গে ছেনালিপনা করছে। ফ্রেনৎসেলরা এসেছিল। মার্থা কেঁদে বললে,

শুনেছি আলফ্রেডের আবার ডাক পড়বে। ওর তো তিনটে আঙ্গুল নেই, ও কি করে গুলী ছুঁড়বে? এমন কথা বাপু আর কখনো শুনিনি!...

ফ্রেনৎসেল বললে,

ঐ কালো পেঁচাদের বাধা দেব আমরা—আমরা গ্যেটের আলোর প্রতীক, ফ্যুরারের শুভ কামনা আমাদের ধর্ম......

অবশেষে এল সরকারী বিজ্ঞপ্তি: কর্পোরাল জোহান কেলার ফ্যুরার এবং জার্মানীর জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন।

সারাদিন অন্ধকার ঘরে ভিজে তোয়ালে মাথায় জড়িয়ে কাটিয়ে দিলে গার্ডা। ইরমা চলে গেল খবরের কাগজে খবরটা দিতে। সে বোনের কালো পোষাকে থেকে লাল লোম ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলে। কিন্তু গার্ডা শুয়ে রইলো চুপ করে, তার চোখের সুমুখে ভাসতে লাগলো তুষারময়ী নগরী......বহু বহু তুষার, জোহান পড়ে আছে সেই তুষারের স্তূপে, বড় বড় রুশ দাঁড়কাক তার দেহটা ঠোকরাচ্ছে......

পরদিন সকালে সে উঠতে চেষ্টা করলো। গ্রেচেনকে পোষাক পরাতে হবে, রুডিকে পাঠাতে হবে স্কুলে। রান্নাঘরে সে গেল। ওলগা ছেলেটাকে কফি দিচ্ছে। আর রুডি তাকে জার্মান ভাষা বলতে শেখাচ্ছে। সে জিজ্ঞেস করলে 'সিয়েফ' কথাটার মানে রুশ ভাষায় কি, ওলগা জবাব দিলে, মাইলো;

রুডি ঠিক উচ্চারণ করতে পারলে না। এবার দুজনেই হেসে উঠলো।

ওলগার মন ক'দিন ভালই আছে। কাছের এক ওষুধের দোকানে একটি রুশ স্ত্রীলোক কাজ করে সে তাকে বলেছে, জার্মানরা খুব ঘা খেয়েছে। আমরা শীগ্‌গিরই বাড়ি ফিরব..........ওলগা বিশ্বাস করেছে, সে শীগ্‌গিরই তার মা বোনদের দেখতে পাবে। জার্মানরা মিশাকে খুন করেছে লড়ায়ের প্রথম দিকে; তার বাবা আর অন্য ভাইদের কি হোলো সে জানেনা।

রুডি হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলে, কি উচ্চারণ করলো? মিলো? গার্ডা রাগে ক্ষেপে গিয়ে একটা ঝাঁটা তুলে নিয়ে ওলগাকে ক'ঘা বসিয়ে দিলে। রুডি ভয় পেয়ে টেবিলের নীচে সেঁধোলো। গার্ডা ঝাঁটা ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার চোখ দিয়ে ঝরছে জল। হায়, এই আঘাত তো আর জোহানকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না!... ..

ত্রিশ

ক্রাইলভ সবজায়গায়ই তেরোর সংখ্যাটি দেখছেন—জার্মানদের মানচিত্রে এইটে ভোরোনেজ-কার্স্ক রোডের নম্বর। কুসংস্কার যাদের আছে, তারা ভাবছে, এই জন্যই এমনি ব্যাপারটা হোল। ...পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে জার্মানরা সবকিছু ফেলে গেছে—কামান, কাগজপত্র সবকিছু। পথ হাজার হাজার পরিত্যক্ত গাড়ি আর ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধকারী কামানে অবরুদ্ধ, ইউরোপের হোটেলের লেবেল-লাগানো স্থটকেসে ভর্তি হয়ে গেছে পথ, খড়ের জুতোর আবরণ, বাঁশী, মাইন, টাইপরাইটার, ফরাসী কনিয়াক মদের বোতল, দূরবীক্ষণযন্ত্র, তালগোল পাকানো লোহা আর পিষ্ট দলিত দেহ। তুষারস্তূপের ভিতর দিয়ে প্যাসনে-পরা একখানা মুখ বেরিয়ে

আছে, আর তার পাশেই রক্তাক্ত পায়ের গোড়ালি, দেখে অদ্ভুত উদ্ভিদ বলেই মনে হয়। কালো ধোঁয়ার দাগে দাগী তুষার। গাড়ী চলেছে মৃতদেহের উপর দিয়ে ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে, পাথরের মতো জমে গেছে মৃতদেহ। আর তেরো এই সংখ্যাটি এই তুষারের ফাটলে, মৃত দেহ আর মৃত অশ্বের উপরে ভেসে ভেসে উঠছে। এ যেন নরকের হরেক রকম জিনিষের ভাণ্ডার—কেন ওরা জেনায় চসমার কাঁচ কাটে, ন্যূফচাটেলের ঘড়িওলা কেন ক্রোনোমিটার নিয়ন্ত্রিত করে, কেন হল্যাণ্ডের পনীর তৈরী করিয়ের দল বাঁধ বাঁধে, সমুদ্রের জল ছেঁচে ফেলে, গরু পালন করে?......লোকে বলে, পলিনেসিয়ায় অসভ্য আছে........কিন্তু এই যে ওরা ওদের চশমা নিয়ে, শব্দধর যন্ত্র আর লাইকা ক্যামেরা নিয়ে এগিয়ে এল—ওদের কি বলবে বল তো? কার্স্ক-এর প্রান্তরে প্রান্তরে এই বর্বরদের অভিযানের ফলে মর্মস্পর্শী দৃশ্য সৃষ্টি হয়েছে, এ এক ছ'নলা মর্টার আর টয়লেট পেপারের অভিযান। ক্রাইলভ মনে মনে ভাবলেন, আমি ক্লান্ত, তাই বাজে চিন্তা এসে ঢুকছে আমার মাথায়। সোজা কথা হচ্ছে, আমরা এবার ওদের দৌড় করাচ্ছি। আমরা তিন সপ্তাহ ধরে মার্চ করে চলেছি। ঠাট্টাটা তো নয় ব্যাপারটা। আমরা শীগ্‌গিরই গিয়ে কার্স্ক-এ পৌঁছব......

সন্ধ্যের দিকে আবার তুষার ঝড় বয়ে গেল। প্রান্তরের মাঝখানে স্তূপগুলি ঘুরপাক খেতে লাগলো। আগে ফেব্রুয়ারী মাসে কখনো এমন তুষার-ঝড় হয় নি। আর তুষারপাতই বা কি ভয়ানক! যে সব জার্মানরা লুকিয়ে ছিল, তারা বন থেকে বেরিয়ে এসে চাষীদের কুঁড়েঘরের দরজায় ধাক্কা মারতে লাগলো, পথের পাশে জমে মরে পড়ে রইল। সব কিছুই পশ্চিমে চলেছে—গাড়ি, ট্রাক, পদাতিক-সেনা, ট্রাক্টর, হাসপাতাল, স্থাপার দল, কুকুর, আসবাবপত্র-ভর্তি ট্রাক—সমর-পরিষদের ভোজনাগার—সাংবাদিক দল, কার্স্ক-এর বাহিনী—সব কিছু, এমন কি বরফের চাঁইগুলো পর্যন্ত কোথায় ছুটে চলেছে। ক্রাইলভ একঘেয়ে সুরে গান ধরলেন, যখন আমি ছিলাম ডাকগাড়ি

চালক......কেন তিনি আর সবাই গাড়োয়ানদের কথা নিয়ে গান গান? এ হচ্ছে পথের ডাক। পথের বিষণ্ণতা তো তুমি দূর করতে পারবে না —সে পথ যত আনন্দময় হোক—যত সে পশ্চিমের দিকে চলুক—তবু তো না।..........

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ক্রাইলভ আবার দুঃখ ভোগ করছেন। নাতাশার চিঠি এসেছিল সেই ভয়ংকর দিনে : আমরা তখন হাঙ্গেরীয়দের ব্যূহ ভেদ করেছি, তারপরে এল আজকের এই স্তব্ধ ভোরেনেজ, আর রাত। তিনি মাত্র কয়েক হাত গিয়েছেন, আর একটার পর একটা বাড়ি উড়ে যেত লাগলো! মাটি যেন পায়ের নীচে নড়ছে, আহতদের সরানো হচ্ছে—ওরা আমাদের মানুষ, মাগিয়ার্স আর জার্মান। তখনো কেউ জয়লাভ সম্বন্ধে সচেতন নয়। যুদ্ধের জবর ধকল সবাইকে হতবুদ্ধি করে ফেলেছে। এই মৃত্যু তাণ্ডবে, এই রক্ত-সিক্ত পটি আর গোঙানি, হেঁচকি আর মুমূর্ষুর ঘড়-ঘড়ানি ; এই বিস্ফোরণের ভিতরে যখন জয়েষ্ট আর যন্ত্রপাতি ডিসেম্বরের লড়াইয়ে কেঁপে কেঁপে উঠেছিল, এরই মধ্যে ক্রাইলভের দুঃখ খানিকটা সয়ে গেল। তাঁর প্রিয়জনের বিয়োগ-ব্যথা সম্পর্কে তখন তিনি ততটা ভাবতে পারেন নি। তারপর যখন পশ্চিম দিকে চললেন, যখন এসে পৌঁছলেন কাস্তোরোনায়ায়, জার্মানদের ধ্বংসের প্রমাণ দেখলেন চোখে,—দেখলেন ট্যাঙ্কে চষা, ঝঞ্ঝাবাহিনীর পদভরে ছিন্নভিন্ন প্রান্তর, তখন তিনি বুঝতে পারলেন, ভারিয়া আর নেই। জয়-লাভের কথা লেখবার মতো মানুষ আজ আর মিলবে না, মিলবে না এমন কেউ যার সঙ্গে বসবাস করা যাবে।

অবশ্য নাতাশা আছে বটে, কিন্তু ছেলেমানুষকে কি আর সব কথা বলা যায়..........

ভারিয়া আর তিনি কত সয়েছেন। তাঁরা ঝগড়া করেছেন, তর্ক-বিতর্ক করেছেন, যখন তাঁদের ছাড়াছাড়ি হয়েছে ভোগ করেছেন বিরহ-ব্যথা। এ যেন এক পার্বত্য নদী, প্রথমে তর্জন-গর্জন আর ঘূর্ণি, কিন্তু তার পরে

শ্লথ হয়ে এল গতি, গভীরে বয়ে গেল। প্রথম কয়েক বছরের কামনার উদ্দামতার পর সে থিতিয়ে গেল স্বাভাবিক অন্তরঙ্গতায়। সেই ভারিয়া আজ গেলেন চলে! দিমিত্রি আলেকসিয়েভিচ একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন।

তিনি যে কি সইছেন, সে কথার বিন্দু বিসর্গ জানেন না তাঁর সাথীরা। তারা শুধু শুনলেন, ক্রাইলভের স্ত্রী মারা গেছেন, কিন্তু এখানে যা ঘটছে তার কাছে এক বৃদ্ধার শান্তিতে মৃত্যু তো মনকে নাড়া দিয়ে যায় না। আর ক্রাইলভ, আনন্দ বা ক্রোধ কোনোটাই যিনি দমন করতে পারেন না, তিনি কিনা তার ব্যক্তিগত দুঃখ চেপে রাখলেন—এমন চেপে রাখা বুঝি আর কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। শুধু একটু পরিবর্তন তার হোলো, তিনি যেন একটু নিবে গেলেন, তেমন আর হাসেন না। সবাই তাকে বললে, দিমিত্রি আলেকসিয়েভিচ, আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, আপনাকে দেখলেই তা বোঝা যায়........তিনি নিজেও তা বুঝলেন, যখন তার বুকখানা ভারি হয়ে উঠতো, তিনি নিজেই বলতেন, আজকাল যা দিনকাল, সবাই এখন ক্লান্ত.........

এগোনো ক্রমেই শক্ত হয়ে পড়েছে, দু'ঘণ্টার জন্যে থেমে থাকতে হোলো, পথ তুষারে অবরুদ্ধ। পথ পরিষ্কার করে আবার চলা শুরু হোল। ঝড়ে তুষার যেন সমুদ্রের মতো ফুলে ফুলে উঠছে, গাড়ি, শ্লেজ, মানুষ ঢেউয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু একঘণ্টার জন্যও বিরাম নেই। ক্লান্তি আর দুর্দান্ত শীত সত্ত্বেও পশ্চিম অভিযান থেমে থাকছে না। এখানে ওখানে জার্মানরা রুখে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে; কিন্তু মর্টার এখন নিষ্ফল—গুলীবৃষ্টির মধ্যে ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের মানুষেরা। খুব কি বেশি দিনের কথা, যখন সেনাবাহিনী পিছু হটছিল তাড়াতাড়ি, যখন মানুষ গুজবে বিশ্বাস করতো, জার্মান ট্যাঙ্ক হানা দিলে পড়তো ছত্রভঙ্গ হয়ে—সবাই ভাবতো শত্রুর শক্তি আর বারবার পশ্চাৎ অপসরণের কথা? কিন্তু এই কদিনে বিজয়লক্ষ্মী তাদের বদলে দিয়েছেন; আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে, তারা জানে

তারা এগিয়ে যাবে কতদূরে—কোনো বাধা আর তাদের থামাতে পারবে না।

এক রাতে ক্রাইলভরা এসে পৌছলেন এক ছোট শহরে। গত শতকের কাঠের বাড়ির সার শহরে, মনে হয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এই পাণ্ডব-বর্জিত জায়গা এড়িয়ে গেছে। ক্রাইলভ একটা বাড়ির দরজায় গিয়ে ঘা দিলেন, যে ঘরে তাকে নিয়ে যাওয়া হোলো সেখানে থাকে একটি মেয়ে আর তার ছোট ছেলে। দিমিত্রি আলেকসিয়েভিচ একখানা ছোট্ট কাউচে গা এলিয়ে দিয়ে গুটিসুটি হয়ে বসলেন।

বিছানায় এসে শুয়ে পড়েন, আপনি ওখানে ঘুমোতেই পারবেন না, মেয়েটি বললে।

থাক...এইখানেই বেশ আছি।

বাচ্চা জেগে গেছে, সে বায়না ধরেছে. মা, আমাকে মোরব্বা দাও.. ক্রাইলভের তন্দ্রা এল, তিনি তখনো ভাবছেন, মোরব্বা ওরা কোথায় পেল ?....

তখনো অন্ধকার আছে, ছেলেটি তাকে জাগিয়ে দিলে। মেয়েটি প্রাতরাশ তৈরী করেছে। মোরব্বা তাহলে গল্প নয়। চলে যাওয়ার সময় জার্মানরা দোকান ঘরগুলিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল, তখন শহরের বাসিন্দেরা আগুন থেকে কৌটো ভর্তি খাবার যা পেরেছে বাঁচিয়েছে।

ক্রাইলভ মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

তুমি খুশি তো ?

আমি তো সত্যি বলে বিশ্বাসই করতে পারছিনা....আমার স্বামী আছেন বিমান-বাহিনীতে—যদি তাকে খুঁজে পাই ! জানি না, তিনি বেঁচে আছেন কিনা...

মেয়েটির বিষণ্ণ সুন্দর দুটি চোখ।

ক্রাইলভ জিজ্ঞেস করলেন, জার্মানরা কি খারাপ ব্যবহার করতো ?

ওরা এসেই তো লুঠপাট শুরু করলে। আমার সামোভার আর য়্যালার্ম ঘড়িটা নিয়ে গেল, তারপরে আর এখানে ঢোকেই নি।

হঠাৎ ছেলেটি কথাবার্তায় যোগ দিলে,

মা, অটো যে রোজ রাতে আসতো।

মিছে বোলো না!

ছেলেটি চটে গেল,

আমি মিছে বলছিনা···অটো তোমার আর আমার সঙ্গে খেলা করত......

মেয়েটি চলে গেল। ক্রাইলভের মুখে ঘন লাল ছোপ, তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।

এক বুড়ী থাকে পাশের বাড়িতে, সে তাঁকে তার নিজের কামরায় নিয়ে এল। এসে বোসো বাছা; তোমাকে একবার দেখি....হাজার হোক, তুমি তো আমার আপন লোক........

সে কাঁদলো, তারপর তাঁকে শক্ত পনীর আর জার্মান মধু খেতে পেড়াপিড়ি করলে। ক্রাইলভ নাক কোঁচকালেন। বুড়ি এবার একখানা ফোটো দেখালে।

আমার ছেলে পল্টনে আছে, মিলোচকাকে নিয়ে গেছে জার্মানরা......

আগের দিনও ছিল জার্মান কোতোয়ালী, আজ সেখানে উড়ছে লাল ঝাণ্ডা। বাড়িময় ছড়িয়ে আছে সরকারী ফাইল খবরের কাগজ আর হিটলারের একখানা বহুবর্ণ রঞ্জিত ছবি—তার নীচে লেখা—মুক্তিদাতা। দিমিত্রি আলেক-সিয়েভিচ সংযম হারিয়ে ফেললেন, তিনি ছোট ছেলের মতোই ছবিখানা দলে-পিষে দিলেন পা দিয়ে—অভিশপ্ত ঘোড়ার বাচ্চা!

একটি স্ত্রীলোক বললে,

ওরা এখন যাবার তোড়জোড় করছে। লোসিনভ ছিল ওদের আমলে শহরের কর্তা। সে চেঁচাতে—চেঁচাতে ছুটে এল, আমাকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে চল! একজন জার্মান তো বললে, গোল্লায় যাও! তোমার কথা নিয়ে এখন আমাদের ভাববার সময় নেই। আমরা যার জিনিসপত্রই ফেলে যাচ্ছি, তোমার মতোই পাজিকে নিয়ে যাব ভাবছ নাকি!...লোকটা আবার রুশ

গালাগালি ভাল করে রপ্ত করেছিল। এবার লোসিনভ আমাকে এসে বললে, আমাকে তুমি লিখে দাও যে, আমি তোমার ইগনাৎকাকে ফাঁসি কাঠ থেকে বাঁচিয়েছি, তুমি লিখে দিলে আমি তোমাকে একটা গরু দেব... সেই রাতেই লাল ফৌজ এসে পড়লো।

ক্রাইলভ জিজ্ঞেস করলেন,

লালঝাণ্ডা কাকে বলতে চাও ?

বুড়ি বিব্রত হয়ে হাসলো,

'ওদের সঙ্গে থেকে থেকে এক অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে.....আরো কত যে খারাপ অভ্যাস হয়েছে ....

দিমিত্রি আলেকসিয়েভিচ গর্জে উঠলেন, হঁ, সবরকম কু-অভ্যাস—বাজে ধারণা, যৌন রোগ, সব কিছু। ওরা গোল্লায় যাক, ওদের...

পরে তিনি গেলেন ডাঃ গালকিনার ওখানে। ভদ্রমহিলার হাত ভেঙে গেছে। একজন জার্মান পিটিয়ে ভেঙেছে। লাল ফৌজের দুজন সৈন্যকে গ্যালকিনা লুকিয়ে রেখেছিলেন মিউনিসিপ্যাল হাসপাতালে, তারপরে তাদের প্রতিরোধ যোদ্ধাদের দলে পাঠিয়ে দেন। তাঁকে দেখে ক্রাইলভের মনে হোল তার স্বর্গগতা স্ত্রীর সঙ্গে কোথায় যেন মিল আছে—কালো চুলে মাঝে মাঝে সাদা চিহ্ন, কপালে ফ্যাকাসে নীল শিরা, উত্তেজিত হলে তাঁর দম আটকে যায়। দিমিত্রি আলেকসিয়েভিচ তার অভিজ্ঞতার কথা শুনলেন, ডাক্তার সংক্ষেপে সব কথা বলে গেলেন। ক্রাইলভ হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন,

আপনি বীরাঙ্গনা! আমাকে চুমু খেতে দিন। এখানে এতসব বাজে লোক দেখলাম, মনে হয়েছিল হাওয়া এখানকার বিষাক্ত হয়ে গেছে। আমাদের নিজেদের একজনকে পেয়ে কত যে আনন্দ হোল—হাঁ আবার একজন সোবি-য়েতের মানুষ দেখলাম...

ডাক্তার মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন,

আমি তো তেমন বিশেষ কিছু করিনি। ওরা তো সবার উপরই অত্যাচার করেছে...

তিনি আরো কি বলতে চাইলেন, কিন্তু কথা খুঁজে পেলেন না

কার্স্ক। কেন যেন ক্রাইলভ বার বার নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগলেন, কার্স্ক-এ তো এলাম—এখানকার সেই বিখ্যাত নাইটিঙ্গেল কোথায়?.......যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে মানুষ তখনই আজে বাজে ভাবনা আসে মগজে•••দেখ, দেখ, কত বাড়ী উড়িয়ে দিয়েছে বর্বরের দল! সুন্দর শহর, পথগুলি খাঁড়া উঠে গেছে উপরে...এখানে ওখানে বিজ্ঞপ্তি কেবলমাত্র জার্মানদের জন্য!...পৃথিবীই যেন ওদের, ওরা নিপাত যাক না! জিজ্ঞেস করি, কাকে কবর দেওয়া হোল?••• সবকিছু ওরা ওলট পালট করে দিয়েছে। ওরা পঙ্গু করে দিয়েছে, দুষিত করেছে মানুষকে। আমাদের ভবিষ্যতের কাজ শক্তই হবে। আমাদের শুধু বাড়ী ঘরই নতুন করে তৈরী করতে হবেনা, আবার মানুষদের সেবা শুশ্রূষা করে ভদ্র করে তুলতে হবে। এই প্রথম ক্রাইলভ ভবিষ্যতের কথা ভাবলেন। এর শেষ হবে কোথায় তা ভাবতে পারলেন না। হঠাৎ মনে এসেছে এ ভাবনা। সেই রোববারের সকালের কথা তাঁর বেশ মনে আছে......হয়তো তখনও এ ভাবনা জাগে নি—তার আগে পোল্যাণ্ডে, মাদ্রিদে, তারও আগে যখন ঘোড়ার ছানা প্রথম নাচুনি শুরু করেছিল, তখন থেকে এভাবনা শুরু হয়েছিল....হঠাৎ এর শেষ হবে না? কিন্তু এমন ভাবে •শেষ হবে, যাতে মানুষ আর একশো বছর পরে এ ভাবনা না ভাবে! যখন তুমি মটনরের গান শুনবে, একটা শুধু দুঃখ হবে—কেন যুদ্ধের আগে শুনলে না নাইটিঙ্গেলের গান। কোথায়, কার্স্ক-এর নাইটিঙ্গেল কোথায়? হায়: এখন যে শীত, সে তো শীতে গান গায় না...

ক্রাইলভ সারাদিন কাজ করলেন, এগারোটা অস্ত্রোপচার করতে হোল। সন্ধ্যার দিকে সার্জেণ্ট কুকুসকিনকে নিয়ে আসা হোলো। আর্দালী বললে, সেই নাকি প্রথম শহরে ঢোকে, জার্মানরা তখন ছাদ থেকে গুলী চালাচ্ছিল। সে বললে, এমন শিকারী আর হয় না......ক্রাইলভ ক্ষত পরীক্ষা করে দেখলেন

সাংঘাতিক ব্যাপার। নার্সরা তাপ পরীক্ষা করলে—উনচল্লিশ আর আট ডিগ্রী, পচে গেছে।

নার্স জিজ্ঞেস করলে, কেটে বাদ দেবেন ?

ক্রাইলভ খেঁকিয়ে উঠলেন,

শুধু কেটে বাদ দেবার কথাই জানো…

তিনি ফুলোর মুখ ছাড়িয়ে দিলেন, তারপর হাড়ের কুচি বার করে প্লাস্টার ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন। যা হোক সেরে উঠবে। শিকারী……পা কেটে বাদ দিলে আর তো কিছু করতে পারবে না। ছেলেমানুষ, হয়তো বৌ কি প্রেমিকা আছে—যা হোক আমার মতো তো নয়। তেইশ বছর মাত্র বয়েস, একেবারে ছোকরা…

রাতে তিনি সমর-পরিষদের সভ্য কর্ণেল টিসিস্কোকে বললেন গ্যালোকিনার কথা।

জানেন ওর মতো মানুষ খুব বেশি নেই। ভাঙা হাত, তবু বললেন, এমন আর কি হয়েছে……এখানে সব কিছুই এমন অগোছালো হয়ে আছে যে বীরত্ব আর চরম অবনতি—কোনটাই আপনি সহজে খুঁজে বার করতে পারবেন না… ব্যাপারটা দুই আর দুইয়ের মতোই অভ্রান্ত, তবু কেউ কি বিশ্বাস করবে!…… পনেরো মাস জার্মানদের অধীনে থাকা তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। আমি ভাবতেও পারি না, ওরা পারী আর ভারসৌতে কি করেছে……

কর্ণেল মানচিত্রের উপর ঝুঁকে পড়ে তার বেঁটে আঙুল দিয়ে নিপার অঞ্চলের একটা জায়গা দেখিয়ে দিলেন ;

এবার সব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে।

কমরেড কর্ণেল, আপনি আমার চেয়ে তা ভালোই জানেন। কিন্তু আমার কি মনে হয় জানেন, বহুদিন চলবে এর জের। জার্মানদের বুদ্ধিবৃত্তির উপর আমার কোন বিশ্বাস নেই—

এদের এই ঘোড়ার বাচ্চাগুলোর চৈতন্য হবার আগেই আমরা বার্লিনে পৌছে যাব। আর কিছু না হোক, একবছর আমাদের লড়াই চালাতে হবে...

হাসপাতালে তিনি গেলেন তারপর।

সার্জেণ্ট কেমন আছে? কার কথা বলছি বুঝো! নামটা ভুলে গেছি—কুরোৎকিন না?

আপনি কুকুশকিনের কথা বলছেন সে তো ঘুমিয়ে আছে.......

সে সেরে উঠবে, কিন্তু ভাসিয়া? সে নিশ্চয়ই মারা গেছে···নাতাশাকে চিঠি লিখতে হবে...

দিমিত্রি আলেকসিয়েভিচ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে চারদিকে তাকালেন—জোর হাওয়া দিচ্ছে, তুষার যেন ঘূর্ণি বৃষ্টির মত আকাশ থেকে ঝরছে, ঝরছে মাটি থেকে। পথ তুষারে ঢাকা। তিনি গান গাইতে লাগলেন।

আমার গাড়োয়ানটি নীরব,

পথ দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে···

এখনো বহু দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। আর আমাদের বাঁচতে হবে। কিন্তু ভাসিয়া মৃত···আমি ক্লান্ত...এ কিছু নয়, আমি সব ব্যবস্থা করে নেব। আমার নাতির মুখ দেখতে ইচ্ছে হয়। নাতাশা লিখেছে—সে ভারি দুষ্ট হয়েচে, এমন দুষ্ট আর দেখা যায় না, তাহলে ঠিক আমার মতোই হয়েচে ..